পবিত্র কুর'আনে জেরুজালেম

(নতুন সংস্করণের অনুবাদ)

আনসারী স্মরণিকা সিরিজ নং ৮

লেখক প্রণীত আনসারী সিরিজে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য গ্রন্থ:

The Importance of the Prohibition of *Riba* in Islam
The Prohibition of *Riba* in the Qur'an and Sunnah
The Strategic Significance of the Fast of Ramadan & *Isra'* and *Miraj*
The Religion of Abraham and the State of Israel – A View from the Qur'an
One Jama'at One Ameer – The Organization of a Muslim Community in the Age of *Fitan*
The Caliphate – The Hejaz and the Saudi-Wahhabi Nation State
Dreams in Islam – A Window to the Truth and to the Heart
Surah al-Kahf – Text, Translation and Commentary
Surah al-Kahf and the Modern Age
Signs of the Last Day in the Modern Age

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ:

Islam and Buddhism in the Modern World

অনুবাদকের অন্যান্য গ্রন্থ:

অন্য পথের কন্যারা (অনুবাদ)
ইসলাম ২০০০ (অনুবাদ)
নিশ্চিহ্ন হওয়ার হুমকির মুখে ইসলামি মূল্যবোধ
সভ্যতার সংঘাত: আমরা এবং ওরা

আনসারী স্মরণিকা সিরিজ

পবিত্র কুর'আনে জেরুজালেম

ইসলামের দৃষ্টিতে জেরুজালেমের শেষ অধ্যায়

ও আমেরিকার উপর সেপ্টেম্বর ১১-র আক্রমণের প্রেক্ষিতে মুসলিম প্রতিক্রিয়া

মূলঃ ইমরান নযর হোসেন

অনুবাদঃ মোঃ এনামুল হক

ইংরেজি প্রকাশনা:
দারুল কুর'আন মসজিদ
লং আইল্যান্ড, নিউ ইর্য়ক
২০০২

ইংরেজি প্রথম প্রকাশ ২০০২
পুনর্মুদ্রণ ২০০২
দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০২

বাংলা প্রথম প্রকাশ ২০০৪

স্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক
মুহাম্মদ আলমগীর
12 Melaleuca Grove, Greenacre
NSW-2190, Australia
Phone: 61 2 97426025
Email: malamgir@bigpond.com

মুদ্রাকর ও পরিবেশক
মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম সরদার
আর আই এস পাবলিকেশন্স
কাঁটাবন মসজিদ মেইন গেট,
এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৯৬৬০৪৫২
ইমেল: ris_cd@yahoo.com

মূল্য: ১৬০ টাকা; ৫ অষ্ট্রেলীয় ডলার

সংশোধন ও পুনঃপ্রকাশ ২০১১

স্বত্ব
মূল লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক
জাবেদ আহমদ
ঢাকা
বাংলাদেশ
০১৯১১০০৮৮৫৩
ইমেল: javedahmad@yahoo.com

মুদ্রাকর ও পরিবেশক
আনোয়ার হোসেন অনু
২৭ বাবুপাড়া, নীলক্ষেত
ঢাকা-১২০৫
ফোন: ৮৬২৯৩৭৬, ০১৯১১৩৫৩৭৮৭
ইমেল: anwaroshi@yahoo.com

মূল্য: ৩০০ টাকা; ১০ অষ্ট্রেলীয় ডলার

JERUSALEM IN THE QUR'AN by Imran N. Hosein
POBITRO KORANE JERUSALEM Bangla Translation
by Muhammad Enamul Huq

Published by Muhammad Alamgir
12 Melaleuca Grove,
Greenacre, NSW-2190
Australia

First Edition: 2004
Price: Tk. 160; Australian $5

Republished by Javed Ahmad
Dhaka
Bangladesh

Reprint: 2011
Price: Tk. 300; Australian $10

উৎসর্গ

সুয়াত লেভান্ত দেমির্গিল

আমার প্রিয় তুর্কি ছাত্র

যার ভালবাসা, একাগ্রতা, দয়া ও সহানুভূতি
আমার প্রতি তার অনুরাগকে সৌরভান্বিত করে

সূচিপত্র

প্রকাশ কথা ৭
আনসারী স্মরণিকা সিরিজ ৮
বাংলা প্রকাশকের দু'টি কথা ১৫
বাংলা অনুবাদকের ভূমিকা ১৮
বাংলা পুনঃপ্রকাশ - ২০১১ ..... ২৩
ইংরেজি পূর্বকথা ২৬
ইংরেজি দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা ৩০
ইংরেজি প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ৩৩
ইসরাঈল রাষ্ট্র সম্বন্ধে ইসমা'ঈল রাজী আল্-ফারূকীর বক্তব্য ৩৬
শব্দকোষ ৩৭
প্রথম খন্ড ৩৯
সূচনা ৪০
জেরুজালেমের রহস্য, কুর'আনের 'সেই শহরটি' ৬০
কুর'আনে জেরুজালেমের কাহিনীর সূচনা: জেরুজালেম ও নবীগণ ৬৯
জেরুজালেম সহ [গোটা] পবিত্রভূমি বনী ইসরাঈলকে দান করা হয়েছিল বলে কুর'আনের ঘোষণা ৭৯
পবিত্রভূমির উত্তরাধিকার লাভের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত শর্ত ৮৪
উত্তরাধিকারের শর্ত লঙ্ঘন করায় 'পবিত্রভূমি' থেকে আল্লাহ্ কর্তৃক ইহুদীদের বহিষ্করণ ৮৯
জেরুজালেম থেকে মক্কার দিকে মুখ ফেরানো ৯৭
সত্য-মসীহ্ ঈসা, এবং ভণ্ড-মসীহ্ দাজ্জাল ১০৬
মির্জা গোলাম আহমদ : এক 'ভণ্ড-মসীহ্' ১৩৫
কুর'আন ও হাদীসে ইয়াজুজ-মাজুজ ১৪৪
ইহুদী জাতি ও আরব জাতি ১৬১
'পবিত্রভূমিতে' ইহুদীদের প্রত্যাবর্তনের কুর'আনিক ব্যাখ্যা ১৭৩
পবিত্র কুর'আন এবং জেরুজালেমের শেষ অধ্যায় ১৯৩
দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৯
পবিত্রভূমি এবং ইসরাঈল রাষ্ট্রের রাজনৈতিক শির্ক ২০০
'পবিত্রভূমি' এবং ইসরাঈলের সুদ-ভিত্তিক অর্থনীতি ২২৮
উপসংহার ২৫১
উপসংহার ২৫২
সংযোজন ২৫৯
গ্যালিলি হ্রদ ২৬০
আমেরিকার উপর সেপ্টেম্বর ১১-র আক্রমণের প্রেক্ষিতে মুসলিম প্রতিক্রিয়া ২৬২
ইব্নে খালদুন, ইকবাল, এবং পবিত্র কুর'আনে জেরুজালেম ২৮২

প্রকাশ কথা

আনসারী স্মরণিকা সিরিজ

'আনসারী স্মরণিকা সিরিজ' প্রকাশিত হয় বিশিষ্ট ইসলামি আলেম, দার্শনিক এবং সুফী শিক্ষক, মওলানা ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান আনসারীর (১৯১৪-১৯৭৪) সম্মানে। এই সিরিজের প্রকাশনা, তাঁর মৃত্যুর ২৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৯৭ সালে শুরু হয়।

মওলানা আনসারী ছিলেন এমন একজন ইসলামি পণ্ডিত, শিক্ষক এবং আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক, যিনি আজকের এই ধর্ম-বিমুখ জগতে ইসলামের জন্য সংগ্রামে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। এই মহান উদ্দেশ্য, ১৯৫০ থেকে ১৯৭০-এর দুই দশকে, তাঁকে ইসলাম প্রচারের সফরে বহুবার গোটা মানচিত্রব্যাপী বহু প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়ে যায়। এসব সফরে তিনি করাচী (১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মের পর তিনি সেখানে অভিবাসী হয়ে আসেন) থেকে পশ্চিম দিকে যাত্রা শুরু করতেন এবং কয়েকমাস সফরের পর পূর্ব দিক থেকে বাড়ি ফিরতেন।

জীবনে তাঁর মিশন ছিল স্বচ্ছ ও মহৎ। তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে, ব্যক্তিজীবনে ধর্ম-বিশ্বাসকে পুনরুদ্ধার করার আগে, রাষ্ট্রযন্ত্র, তথা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। অথচ, সেই সময় মুমিন-মুসলমানদের এই ব্যক্তিগত বিশ্বাসই ইতিহাসের সবচেয়ে কৌশলী, প্রতারণামূলক, বিপজ্জনক ও অক্লান্ত আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছিল। এই আক্রমণ আধুনিক ধর্ম-বিমুখ বিশ্ব দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, যার নেতৃত্বে প্রথমে ছিল ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, তারপরে চলে এলো যুক্তরাষ্ট্র, এবং সবশেষে ইসরাঈল। তবে, ইউরোপীয় পরিচয় বহনকারী, সদা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, ইহুদী সম্প্রদায়ই সবসময় এই কর্মকাণ্ডে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিল।

মহান আল্লাহ্ তা'আলার উপর মানুষের বিশ্বাসকে পুনরুজ্জীবিত করার একক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই মওলানা সাহেব গোটা জীবন বিশ্বব্যাপী অসাধারণ প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। ইসলামের পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রাম করতে গিয়ে, তিনি তাঁর অতুলনীয় মেধা এবং উচ্চমানের জ্ঞানসম্পদকে কাজে লাগিয়েছেন। যারাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁর আধ্যাত্মিক জ্যোতি এবং অসাধারণ আকর্ষণ তাদের হৃদয় স্পর্শ করেছে। সত্যের পথে তাঁর সাধনা ও শ্রমের ফলস্বরূপ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, উভয় অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক মুসলমান তাদের আত্মবিশ্বাস ও ইসলামের প্রতি বিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন, এবং নিজ নিজ বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করতে পেরেছেন। হাজার হাজার মানুষ আধ্যাত্মিক জগতে তাঁর ছাত্র এবং শিষ্য হয়েছিলেন, এবং বহু অমুসলিম তাঁর বাণী শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

মওলানা সাহেব তাঁর স্নাতক ডিগ্রি নিয়েছিলেন ভারতের আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, যেখানে তিনি দর্শন ও ধর্মীয় বিষয়ে পড়াশোনা করেন। ইসলামি দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা ভাবনার উৎস ছিলেন বিখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল। ইকবাল ছিলেন The Reconstruction of Religious Thought in Islam-এর রচয়িতা, যা ইসলামি জ্ঞানে সমৃদ্ধ অত্যন্ত উঁচুদরের একটি গ্রন্থ। "ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠনের" যে ডাক ইকবাল দিয়েছিলেন, মওলানা আনসারীর ইসলামি জ্ঞানগর্ভ রচনা The Qur'anic Foundations and Structure of Muslim Society অনেকটা সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েই লেখা।

মওলানা আনসারী আধ্যাত্মিক দীক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করে ছিলেন প্রখ্যাত ইসলামি শিক্ষাবিদ, সুফী শায়েখ এবং ভ্রমণরত ধর্মপ্রচারক মওলানা আব্দুল আলীম সিদ্দিকীর কাছ থেকে। এই উভয় মনীষীর কাছ থেকে তিনি সুফী জ্ঞানতত্ত্বের (Epistemology) প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন, এবং পরবর্তীতে নিজের ছাত্রদের কাছে তা হস্তান্তর করেছিলেন। সুফী জ্ঞানতত্ত্বের মাধ্যমে যখন সত্যের উপলব্ধি হয় (অর্থাৎ ইসলামকে গ্রহণ করা হয়), এবং মহান আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি বিশ্বস্ততা ও পরম আনুগত্য সহকারে জীবন যাপন করা হয়, তখন সেই সত্য হৃদয়ে আসন লাভ করে (এবং ইসলাম ক্রমে ঈমানে পরিণত হয়)। হাদীসে কুদ্‌সীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ্ বলেন: "*আমার আকাশ মণ্ডলী ও আমার পৃথিবী অত্যন্ত ক্ষুদ্র বিধায় আমাকে ধারণ করতে পারে না, কিন্তু আমার অনুগত বান্দার হৃদয় আমাকে ধারণ করতে সক্ষম।*" হৃদয়ে "সত্যের" প্রবেশ করা বলতে কি বুঝায় তা এই হাদীসে নিখুঁত ভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

যখন "সত্য" হৃদয়ে প্রবেশ করে, তখন এক ঐশ্বরিক আলো (নূরুল্লাহ্) হৃদয়ে প্রবেশ করে। তখন সেই আলো একজন মুমিনকে যে কোনো বিষয়ের "আপাত" বা "বাহ্যিক" চেহারার সীমানা পেরিয়ে, তার অন্তর্নিহিত "আসল স্বরূপ" অনুধাবন করার ক্ষমতা ও আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি দান করে। হৃদয়ে সত্য লালন করার এই পর্যায়ে, মুমিন দু'টো চোখ দিয়ে দেখতে শুরু করে — বাহ্যিক চোখ ও অন্তরের চোখ — (উল্লেখ্য যে, ভন্ড মসীহ্ দাজ্জাল কেবল এক চোখ দিয়ে দেখে — অর্থাৎ শুধুমাত্র বাহ্যিক চোখ দিয়ে)। একজন মুমিন যখন 'জিহাদে', অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রামে লিপ্ত হন, তখন তার 'ঈমান' পূর্ণতা লাভ করে এবং তিনি 'ইহ্‌সানের' পর্যায় উন্নিত হবার গৌরব অর্জন করেন। এই প্রক্রিয়াকেই 'তাসাউফ' বলে আখ্যায়িত করা হয়। একজন সত্যিকার মুমিনের হৃদয় সত্যের প্রকৃত রূপকে নিরূপণ করতে পারে, এবং আল্লাহ্‌র নিদর্শন (আয়াতুল্লাহ্)-সমূহকে চিনতে এবং বুঝতে পারে। শুধুমাত্র এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই আজকের পৃথিবী বাস্তবতাকে সঠিকভাবে জানা এবং বুঝা সম্ভব। যারা সেটা অনুধাবন

করতে পেরেছেন, তারা জানেন যে আমরা ক্বিয়ামতের পূর্ববর্তী *ফিতনা'র* যুগে বসবাস করছি।

মওলানা আনসারী তাঁর জীবনের শেষ দশ বছর (১৯৬৪-১৯৭৪) করাচীতে Aleemiyah Institute of Islamic Studies প্রতিষ্ঠার কাজে উৎসর্গ করেছিলেন। সেখানে তিনি ইসলামি জ্ঞানে বিজ্ঞ এক নতুন প্রজন্মের পণ্ডিত তৈরী করার সংগ্রাম করে যাচ্ছিলেন, যে প্রজন্ম প্রথমে কুর'আন ও হাদীসের আলোকে আধুনিক যুগকে আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক মাপকাঠিতে বুঝতে পারবে — আর তারপরে, বর্তমান পৃথিবী ইসলামের প্রতি যে বিশাল চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে, তারও যথাযথ মোকাবেলা করতে পারবে। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপই ডঃ ওয়াফি মুহাম্মদ, ডঃ আবুল ফজল মুহ্সীন ইব্রাহীম, সিদ্দিক আহ্মদ নাসির, আলী মুস্তফা, মুহাম্মদ আলী খান, বশীর আহ্মদ কিনো, রউফ জামান, মুহাম্মদ সাফী, ইমরান নযর হোসেন এবং এমন আরো অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব Aleemiyah Institute of Islamic Studies, Karachi, Pakistan থেকে ডিগ্রি লাভ করে বেরিয়ে আসেন। আনসারী স্মরণিকা সিরিজ হচ্ছে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সমন্বয়, যার সবটিই তাঁর এক ছাত্রের লেখা:

- Jerusalem in the Qur'an;
- The Religion of Abraham and the State of Israel – A View from the Qur'an;
- The Importance of the Prohibition of *Riba* in Islam;
- The Prohibition of *Riba* in the Qur'an and Sunnah;
- Dreams in Islam – A Window to the Truth and to the Heart;
- The Caliphate, The Hejaz and the Saudi-Wahhabi Nation State;
- The Strategic Significance of the Fast of Ramadan & *Isra'* and *Miraj*;
- One Jama'at ─ One Ameer: The Organization of a Muslim Community in the Age of Fitan.
- Surah al-Kahf – Text, Translation and Commentary
- Surah al-Kahf and the Modern Age
- Signs of the Last Day in the Modern Age

মওলানা যে বৃক্ষ রোপণ করে গিয়েছিলেন, এই সিরিজের গ্রন্থগুলি সেই বৃক্ষেরই আংশিক ফল। এই গ্রন্থগুলিতে, আজকের পৃথিবীর বাস্তবতাকে বুঝার এবং সেটাকে সঠিকভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে — আর সেই সঙ্গে বর্তমান জগতের অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জকে সঠিকভাবে মোকাবেলা করারও চেষ্টা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই প্রয়াস সব-সময় সমালোচনা ও মূল্যায়নের জন্য উন্মুক্ত।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মুমিনদের জন্য এমন একটি মাধ্যমের ব্যবস্থা রেখেছেন, যার বদৌলতে তারা নিশ্চিত হতে পারে যে, তারা অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে জ্ঞান লাভ করার যোগ্যতা অর্জন করেছে (অর্থাৎ যে জ্ঞান অন্তরে প্রস্ফুটিত হয়)। সেই মাধ্যমটি হচ্ছে "সত্য ও ভালো স্বপ্ন ও দিব্যদৃষ্টি" — এটাই হল নবুয়তের শেষ অংশ (অর্থাৎ ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ) যা রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের পরেও দুনিয়াতে বাকি রয়ে গেছে। আনসারী স্মরণিকা সিরিজে তাই জ্ঞানের এই ভুলে যাওয়া শাখা, অর্থাৎ "ইসলামে স্বপ্নের ভূমিকা"-র উপর লেখা একটি ছোট্ট প্রাথমিক গ্রন্থ সংযোজিত হয়েছে।

"কুর'আন ও সুন্নাহ্য় সুদের উপর নিষেধাজ্ঞা" [The Prohibition of Riba in the Qur'an and Sunnah] এবং "কুর'আনের দৃষ্টিতে ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্ম এবং ইসরাঈল রাষ্ট্র" [The Religion of Abraham and the State of Israel] — বর্তমান সময়ে নীতি নির্ধারণীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়গুলিও বুঝতে চাইলে অন্তর্দৃষ্টিলব্ধ জ্ঞান অপরিহার্য। আর তাই এই বিষয়গুলি উক্ত সিরিজের আলোচ্য বিষয়ের তালিকায় স্থান পেয়েছে। অবশ্যই এই আখেরী জামানায় আধ্যাত্মিকতাকে চিনতে পারার "লিটমাস পরীক্ষা" নিহিত রয়েছে দু'টি বিষয়ের সাথে: (১) আধুনিক সুদভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ অর্থনীতি, এবং আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক 'শির্ক', এই দু'টি বিষয় যে ভয়ঙ্কর চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করেছে, তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা, তা অনুধাবন করা এবং সেই কাজের জন্য উপযুক্ত সামর্থ অর্জন করা; এবং (২) পবিত্রভূমি জেরুজালেমে ইহুদীদের প্রত্যাবর্তন এবং ইসরাঈল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার মত সমকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতির দুর্ভাগ্যজনক ও আশ্চর্যজনক ঘটনাকে অনুধাবন করা এবং সে অনুযায়ী সঠিক কর্মপন্থা স্থির করা।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কর্তৃক বহিষ্কৃত হবার ২০০০ বছর পরে, পবিত্রভূমিতে ইহুদীদের প্রত্যাবর্তন ছিল মানবকুলের ধর্মীয় ইতিহাসে এযাবতকালের ঘটে যাওয়া সবচেয়ে অদ্ভুত, রহস্যময় এবং ব্যাখ্যাতীত ঘটনা। জেরুজালেমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে এবং কুর'আনের বর্ণনা অনুযায়ী ঐ পবিত্র নগরীর ইতিহাসকে পুনর্বিবেচনা করতে গিয়ে, কুর'আনকে ব্যবহার করার প্রচেষ্টায় The Religion of Abraham and the State of Israel গ্রন্থখানি যেখানে সমাপ্তি টেনেছে, বর্তমান Jerusalem in the Qur'an গ্রন্থখানি সেখান থেকে একই উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছে। আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে Jerusalem in the Qur'an গ্রন্থখানি, জেরুজালেম তথা পবিত্রভূমির শেষ অধ্যায় কি হতে পারে, তা নিরূপণ করা ও ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছে। এই গবেষণা থেকে যা বেরিয়ে এসেছে তা হলো, এক শতাব্দীরও বেশী সময় ধরে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতি পবিত্রভূমির ক্রমবিকাশমান নাটকে কিভাবে ভূমিকা পালন করে চলেছে, তারই একটা সারবান ব্যাখ্যা। আমরা আরো বুঝতে পারছি যে, আমরা কালের এমন একটা

অধ্যায়ে বাস করছি যখন একটি "নিয়ন্তা রাষ্ট্র" অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তে আরেকটি "নিয়ন্তা রাষ্ট্র" অর্থাৎ ইসরাঈল প্রতিস্থাপিত হতে চলেছে — অনেকটা যেভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে "নিয়ন্তা রাষ্ট্র" হিসেবে ব্রিটেনের স্থলে যুক্তরাষ্ট্রের উত্থান ঘটেছিল। ১৯১৪ সালের গ্রীষ্মকালে সংঘটিত এক সন্ত্রাসী ঘটনার ফলস্বরূপ ঐ ক্ষমতার হস্তান্তর সম্ভব হয়েছিল। এবারকার ক্ষমতার হাত বদলও, অনেকটা একইভাবে ঘটতে চলেছে। তখন যারা সেই সন্ত্রাসী ঘটনার জন্য দায়ী ছিল, তারা ঘটনার দায়-দায়িত্ব এবং দোষ রাশিয়ানদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল। এবার যুক্তরাষ্ট্রের উপর ১১ই সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী আক্রমণের দোষ তারা আরবদের এবং মুসলিমদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে।

আমরা যে বর্তমানে ইতিহাসের শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছি, অর্থাৎ ফিৎনার যুগে বসবাস করছি, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া কেবলমাত্র অন্তর্দৃষ্টিলব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমেই সম্ভব। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, যুক্তির ব্যাবহার ও গভীর চিন্তা ভাবনা দ্বারা কেবল ধারণাই করা যেতে পারে — কিন্তু এসবই বর্তমান যুগের আসল স্বরূপকে বুঝার জন্য যথেষ্ঠ নয়। বর্তমান সময়টা যে চূড়ান্তভাবে ফিৎনার যুগ, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার পর খাঁটি ইমাম অথবা আমীরদের নেতৃত্বে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মুসলিম এলাকা গঠন করতে হবে, এবং সেই এলাকাগুলিকে যত্ন সহকারে লালন করতে হবে। সেখানে সকল মুমিনের উচিত হবে, আমীরের নির্দেশ মনোযোগ দিয়ে শোনা ও মান্য করার (*আস-সাম্'ও ওয়া তা'আতো*) মনোবৃত্তি নিয়ে, জামাতকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা, ঠিক যেমনটি রাসূল (সাঃ) আদেশ দিয়েছিলেন। ধর্ম-বিমুখ পৃথিবীর নগরীগুলি থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে, মুসলিমরা যদি *মুসলিম-গ্রাম* প্রতিষ্ঠা করতে শূন্য গ্রামাঞ্চলে চলে যান, তবেই হয়তো *ক্ষুদ্রাকার-হাটবাজার* সম্বলিত *ক্ষুদ্রাকার-মুসলিম-সমাজ* প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। One Jama'at — One Ameer: The Organization of a Muslim Community in the Age of Fitan গ্রন্থখানি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যারা মুসলিম সম্প্রদায় [সে সম্প্রদায় একটা দেশ হোক, বা গ্রাম হোক] প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় এখন আত্মনিয়োগ করবেন এবং যাদের "মুসলিম সম্প্রদায়ের কুর'আনিক ভিত্তি ও কাঠামো" সম্বন্ধে নির্দেশের প্রয়োজন — দুই খণ্ডে সমাপ্ত ডঃ মওলানা আনসারীর চমৎকার রচনা The Qur'anic Foundations and Structure of Muslim Society তাদেরকে বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ এবং কুর'আন-সম্মত দিক-নির্দেশনা দিতে সক্ষম হবে।

বস্তুত ধর্ম-বিমুখ ও প্রবল পরাক্রমশালী এক সভ্যতা যখন ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত, তখন *বৃহদাকার-মুসলিম-সমাজ* (দারুল ইসলাম) প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় বলেই, *ক্ষুদ্রাকার-হাটবাজার* সম্বলিত *মুসলিম-গ্রামগুলির ক্ষুদ্রাকার-মুসলিম-সমাজ* তৈরী করার কথা আসছে। [ধর্মহীন পৃথিবীর] ঐ যুদ্ধ ইসলামি খেলাফতকে ধ্বংস করতে সফল হয়েছে। সুতরাং ইহুদী ও তাদের দোসররা ১১ই সেপ্টেম্বরে আমেরিকার উপর আক্রমণ

চালিয়ে, এবং তার দোষ মুসলিমদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে, এই যুদ্ধ শুরু করেছে তা নয়, বরং তার বহু আগে থেকেই এ যুদ্ধ চলে আসছে। যতদিন এ যুদ্ধ চলতে থাকবে, ততদিন "বিশুদ্ধ ইসলামের" পক্ষে, আজকের পৃথিবীর কোথাও কোন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা অসম্ভব। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যে অঞ্চলকে খোরাসান বলে বর্ণনা করেছেন, আফগানিস্তান সেই খোরাসানের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এবং সেই অঞ্চলই হচ্ছে এ ব্যাপারে একমাত্র ব্যতিক্রম। মুসলিমদেরকে এই নির্মম সত্যদর্শন করার পর, অর্থাৎ ধর্ম-বিমুখ শক্তি কোথাও দারুল-ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে দেবে না এটা জানার পর, জেগে উঠতে হবে, এবং এ অঞ্চলে দারুল-ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য দৃঢ়তার সাথে সংকল্পবদ্ধ হয়ে সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করতে হবে। ঐ প্রক্রিয়ায় কতজন মারা যাবে বা কত সময় লাগবে সে নিয়ে উদ্বিগ্ন না হয়ে সঠিক পদক্ষেপটি নেবার সময় এসে গেছে। সেরকম "মুসলিম গ্রামের" সার্থকতা নিহিত রয়েছে এমন মুসলিম তৈরী করার ভিতরে যে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য বেঁচে থাকবে এবং ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্রই জন্য মৃত্যুবরণ করবে।

কোন চ্যালেঞ্জের প্রকৃতি অনুধাবন করতে এবং জানতে না পারলে, কারো পক্ষেই সেই চ্যালেঞ্জ সঠিকভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। সেই লক্ষ্যে The Caliphate, the Hejaz and the Saudi-Wahhabi Nation State গ্রন্থটি আমাদের সামনে *বৃহদাকার মুসলিম সমাজের* ইতিহাস তুলে ধরেছে এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার প্রয়াশ করেছে:

- খেলাফত কে বা কারা ধ্বংস করেছিল?
- কেন তা ধ্বংস হয়েছিল?
- কিভাবে তা ধ্বংস হয়েছিল?
- খেলাফতকে সরিয়ে তার জায়গায় কি এসেছিল?
- মুসলিম বিশ্ব খেলাফত ধ্বংস হওয়ার পর কি ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল?
- খেলাফতের নিয়তি (destiny) কি?

নির্ভূল সূত্র ব্যবহার করার পর বিস্তারিত ঐতিহাসিক গবেষণা এই সত্যকেই প্রকাশ করে যে, খেলাফত ধ্বংস করতে গিয়ে সৌদী-ওয়াহাবিরা ইসলামের প্রতি বড় ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং আজ পর্যন্ত খেলাফতের পুনরুদ্ধারকে উপেক্ষা করে সেই বিশ্বাসঘাতকতার ধারা অব্যাহত রেখেছে। পবিত্রভূমিতে [অর্থাৎ ফিলিস্তিনে, বা জেরুজালেমে] প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-নিরপেক্ষ ইসরাঈল রাষ্ট্র এবং ইসলামের আরব প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-নিরপেক্ষ সৌদী-আরব রাষ্ট্রের মাঝে একটা নির্ভূল সাদৃশ্য রয়েছে — উভয় রাষ্ট্রের জন্মের সাথে ব্রিটিশরা জড়িত ছিল। দু'টি দেশই প্রথমে ব্রিটেনের এবং পরে আমেরিকার দেয়া নিরাপত্তায় টিকে আছে। আধুনিক যুগের ইসরাঈল রাষ্ট্র হচ্ছে এক

"ভন্ড-সত্তা" যা ইহুদীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং তাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আর মুসলিমদের বেলায় সৌদী-আরবও আসলে একটা ভন্ড কর্তৃপক্ষ যা মুসলিমদের বেলায় একই ধরনের ধ্বংসাত্মক ভূমিকা পালন করে চলেছে। যখন ইমাম মাহ্দী আবির্ভূত হবেন এবং যখন ইসলামি খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, তখন ইসরাঈল রাষ্ট্র ও সৌদী-আরবকে একই পরিণতি বরণ করতে হবে — অর্থাৎ উভয় রাষ্ট্রই ধ্বংস হবে এবং ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে। খেলাফত ধ্বংসের ইতিহাসের এই বর্ণনার সাথে এবং সৌদী ওয়াহাবিদের জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার ভূমিকার ব্যাপারে, আধুনিক যুগের অনেক *সালাফী* মুসলিমই একমত।

পাকিস্তানে Aleemiyah Institute of Islamic Studies প্রতিষ্ঠা করে এবং Aleemiyah Memorial Series-এর গ্রন্থ প্রকাশ করে, মওলানা আনসারী তার নিজের দীক্ষাগুরু মওলানা সিদ্দিকীকে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। আনসারী স্মরণিকা সিরিজ সেই মহান ঐতিহ্যের পদাঙ্ক অনুসরণের এক বিনীত প্রচেষ্টা মাত্র।

ইমরান নযর হোসেন

বাংলা প্রকাশকের দু'টি কথা

শায়খ ইমরান হোসেনের সাথে আমার পরিচয় ছাত্রজীবন থেকে। চল্লিশ বছরেরও আগে আমরা আমাদের গুরু মওলানা ফজলুর রহমান আনসারী (রাঃ)-র তত্ত্বাবধানে করাচীতে মিলিত হই। আমি অবশ্য লেখাপড়া শেষ করে কর্মজীবনে ফিরে যাই, এবং ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে প্রথম সুযোগেই বাংলাদেশে চলে আসি। রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে আমি পাকিস্তানের কারো সাথে প্রায় পচিশ বছর কোনো যোগাযোগ রাখি নি।

১৯৯৪ সাল। আমি তখন অস্ট্রেলীয়ার সিডনী শহরে কর্মরত। একদিন আমার এক বন্ধু, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আগত চিকিৎসক ড. মাহমুদ খান জানালেন, তাঁর হাতে একজন বিস্ময়কর (তাঁর ভাষায় phenomenal) বক্তার ভিডিও ক্যাসেট এসেছে। বলা বাহুল্য, ক্যাসেট দেখে বক্তাকে চিন্তে অসুবিধা হলো না। সিঙ্গাপুরে শায়খ ইমরান হোসেন তখন প্রতি বছর বক্তৃতা দিতে যেতেন। ড. মাহমুদ খান সেখানকার আয়োজকদের সাথে যোগাযোগ করে শুধু এইটুকু উদ্ধার করলেন যে শায়খ ইমরান হোসেন তখন যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে থাকেন। আমি মার্কিন কন্সুলেটে গিয়ে মায়ামির টেলিফোন বই থেকে তাঁর এবং তাঁর ভাইয়ের ফোন নম্বর বাহির করার চেষ্টা করলাম, কয়েকজনকে ফোনও করলাম, কিন্তু কাজ হলো না। পরে করাচীতে অবস্থিত আলীমিয়া ইন্‌স্টিটিউট অফ ইসলামিক ষ্টাডিজে চিঠি লিখলাম। তারা আমাকে চিনত, তাই শায়খ ইমরান হোসেনের নিউ ইয়র্কের ঠিকানা আমার কাছে পাঠিয়ে দিল।

শুরু হলো পত্রালাপ, ফোনে আলাপ। ১৯৯৭ সালে আমি যখন ঢাকায় ছিলাম, তখন শায়খ ইমরান হোসেন ঢাকায় আসার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর পরবর্তি গুরু ড. সৈয়দ আলী আশরাফ (রাঃ) ঢাকায় দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলেছিলেন। তাঁকে আর আমাকে ছাড়া শায়খ ইমরান হোসেন বাংলাদেশের আর কাউকে চিনতেন না। কিন্তু হঠাৎ করে আমাকে সিডনী ফিরে যেতে হলো, তাই ওনার ঢাকায় আসা হলো না।

এরপর ড. মাহমুদ খানের একান্ত প্রচেষ্টার ফলে শায়খ ইমরান হোসেন ২০০১ সালের ডিসেম্বরে সিডনী পৌঁছালেন। শবেকদরে আরবীভাষীদের বিশাল সমাবেশে তাঁকে মাত্র ২০ মিনিট বলার অনুমতি দেয়া হলো। তাঁর পাবলিক বক্তৃতা শুনবার সৌভাগ্য আমারও এই প্রথম। জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে বিশ্ব ইতিহাস যেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে তা যে ইতঃপূর্বেই কুর'আন ও হাদিসে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ রয়েছে, একজন অনারবের কাছে সেসব কথা শুনে আরবরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লো।

আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত হতে লাগলো। যুব সমাজ আর বুদ্ধিজীবি সমাজের ভিড় থেকে শায়খ ইমরান হোসেনকে বাহির করে আনা কঠিন হয়ে পড়লো। যারা দুই বছর টালবাহানা করে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে সিডনীতে আসার অনুমতি দেয় নি, তারাই তাঁকে নিয়ে সবচেয়ে বেশী কাড়াকাড়ি করতে লাগলো।

শুরু হলো বক্তৃতার পালা। প্রতিদিন এক নতুন স্থান। প্রতিদিন এক নতুন বিষয়। রেডিও, টেলিভিশনে ডাক পড়তে লাগলো। সেপ্টেম্বর এগারো তখন সবে ঘটেছে। সারা বিশ্ব এই ঘটনার অর্থ আর পরিণতি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে শায়খ ইমরান হোসেনের নির্ভীক বাণী মুষড়ে পড়া মুসলিম সমাজকে উজ্জীবিত করতে লাগলো। বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন তাঁকে নিয়ে গেল অস্ট্রেলীয়া মহাদেশের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে — পার্থ, ব্রিসবেন, ক্যানবেরা আর মেলবোর্নে।

এত ব্যস্থতার মধ্যেও তিনি ঘটমান পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে সমস্ত বক্তৃতা ও গবেষণার সারকথা একত্র করে *পবিত্র কুর'আনে জেরুজালেম* গ্রন্থটি লেখা শেষ করলেন। সিডনী থেকে ফিরে মালয়শিয়া যাবার কিছু দিনের মধ্যেই গ্রন্থটি ছাপানো হয়। কোন ইসলামি গ্রন্থের এত জনপ্রিয়তা এর আগে কখনো হয়নি। আলহাম্‌দুলিল্লাহ্, ২০০২ সালের জুন থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে গ্রন্থটি তিনবার ছাপানো হয়।

এরপর শুরু হয় গ্রন্থটির অনুবাদের হিড়িক। আরবী, বসনীয়, উর্দু, বাহাসা, ফরাসী, হাওসা ইত্যাদি ভাষায় অনুবাদের কাজ শুরু হয় আজ থেকে দু'বছর আগে। আমার বিশ্বাস এই অনুবাদগুলি এতদিনে নিশ্চয় পাঠকদের হাতে পৌঁছে গেছে।

২০০২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শায়খ ইমরান হোসেন আবার অস্ট্রেলীয়ায় যান। সেখানকার বিভিন্ন শহর বাদেও তিনি প্রথমবারের মত নিউ জিল্যান্ড ও ফিজিতেও যান। এভাবেই তিনি গত কুড়ি বছর ধরে সদা ভ্রমণরত রয়েছেন। একদিকে সিঙ্গাপুর, মালয়শিয়া, ইন্দোনেশিয়া, অপরদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিশাল মুসলিম জনপদে তিনি নিয়মিতভাবে ইসলামের কাজ করে যাচ্ছেন। নিউ ইয়র্কের জাতিসঙ্ঘ মসজিদে তিনি ১০ বছর খাতিব ছিলেন। সেই সময় অন্যান্য দেশসহ যুক্তরাষ্ট্রের সকল রাজ্যে তিনি অবিরাম সফর করেছেন।

পরিশেষে সেই শুভ মুহূর্ত এলো যখন শায়খ ইমরান হোসেন সস্ত্রীক ঢাকায় এসে উপস্থিত হলেন। ২০০৩ সালের ২৪শে এপ্রিল থেকে ৭ই মে পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি নয়টি স্থানে বক্তৃতা দেন। এরই ফাঁকে তিনি সোনারগাঁও, কক্সবাজার, টেকনাফ ইত্যাদি প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুরে দেখেন এবং সাভারে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তাঁর গুরু ড. সৈয়দ আলী আশরাফ (রাঃ)-র কবর যিয়ারত করেন।

বাংলাদেশের এই ছোট্ট সফরেও শায়খ ইমরান হোসেন মুসলিম মহলে এক নতুন ভাবনার বীজ বপন করতে সক্ষম হয়েছেন। শিক্ষিত সমাজ তাঁর লেখা গ্রন্থগুলির জন্য উদগ্রিব হয়ে আছে। সেই চাহিদা কিছু অংশে মিটানোর উদ্দেশ্যে *পবিত্র কুর'আনে জেরুজালেম* গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে। ম্যারিন ইঞ্জিনিয়ার এবং বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ, ভাই মোঃ এনামুল হক তাঁর নাবিক দায়িত্বের ফাঁকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রন্থটির অনুবাদ করে এক বিশাল পুণ্যের কাজ করেছেন। তাঁর পুত্র মোঃ নাসীল শাহরুখ কুর'আনের আরবী আয়াতগুলি সংযোজন করে এই কঠিন কাজে সাহায্য করেছেন। শল্যচিকিৎসক এবং বিদগ্ধ ইসলামি সংগঠক, ভাই ড. আমিনুর রহমান তাঁর মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে একাজে সব সময় আমাদের সাথে থেকেছেন। স্বনামধন্য ইসলামি বুদ্ধিজীবি অধ্যাপক আবু জাফর গ্রন্থটির মুদ্রণের জন্য কাঁটাবনে অবস্থিত আর আই এস পাবলিকেশন্সের ভাই রফিকুল ইসলাম সরদারের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। ভাই রফিকুল ইসলাম সরদার এবং তাঁর স্টাফ এই গ্রন্থটির মুদ্রণে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। আমি আমার পক্ষ থেকে এবং বন্ধু শায়খ ইমরান হোসেনের পক্ষ থেকে এনাদের সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই এবং সকলের জন্য দোজাহানের মঙ্গল কামনা করি।

মুহাম্মদ আলমগীর
শান্তিনগর, ঢাকা
শা'বান, ১৪২৫
সেপ্টেম্বর, ২০০৪

বাংলা অনুবাদকের ভূমিকা

জাহাজের চুক্তিভিত্তিক চাকুরীর ছুটিতে যখন ২০০৩ সালের মে মাসে আমি ঢাকায় ছিলাম, তখন আমার দ্বীনী ভাই ডাঃ আমিনুর রহমানের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাত ঘটে, আমরা পরিচিত হই প্রথম বারের মত — যদিও তাঁর নাম আমি আগেই শুনেছিলাম। পরিচয়ের প্রথম দিনেই তিনি, মূলত তার প্রচেষ্টায় আয়োজিত এক ধর্মীয় আলোচনায় দাওয়াত দিলেন, যার প্রধান বক্তা হবেন ভাই ইমরান নযর হোসেন। সিঙ্গাপুরের মুসলিম কনভার্ট এসোসিয়েশন তথা দারুল আরক্বামের সাথে আমার যোগাযোগ অনেকদিনের। ওখানকার সাময়িকীতে মওলানা ইমরানের কথা অনেক পড়েছি, তার নানা অনুষ্ঠানের খবরাখবর জেনেছি। তবে ব্যাটে-বলে সংযোগ না হবার মত করে, তার কোন অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া আমার হয়ে ওঠেনি। বৌদ্ধ-ধর্মের ওপর তাঁর লেখা একটি গ্রন্থ, একবার আমি দারুল আরক্বাম থেকে কিনেছিলাম মনে আছে।

আলোচনা সভার কেন্দ্র বিন্দুতে ছিল Jerusalem in the Qur'an (পবিত্র কুর'আনে জেরুজালেম) নামক মওলানার সর্ব সাম্প্রতিক গ্রন্থ। ভাই ইমরান মূলত এই গ্রন্থের বক্তব্য নিয়েই আলোচনা করলেন সেদিন। কিছুটা অসুস্থ থাকাতে, খুব বেশী সময় তিনি দিতে পারেন নি — তবু বাংলাদেশের মাটিতে দ্বীনের উপর এধরনের একটা আলোচনা সভায় উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমার আগে আর হয়ে ওঠেনি। এক বাক্যে বলতে গেলে, "আমি অভিভূত হয়েছিলাম"।

ঐ সভার কিছুদিনের ভিতরই আমিন ভাই আমাকে এই গ্রন্থখানা অনুবাদ করার প্রস্তাব দেন। আমার মত একজন পেশাজীবী ও কর্মজীবী মানুষকে, তিনি বা তার সুহৃদরা (যারা ইমরান নযর হোসেন-এর খুব কাছের মানুষ) কেন বেছে নিলেন তা আমার কাছে সম্পূর্ণ বোধগম্য নয়। তবু দ্বীনের জন্য একটা কাজ আমাকে দিয়ে করানো যায়, তাদের মনে এই বোধ সৃষ্টি হওয়ার জন্য আমি আল্লাহ্‌র কাছে বাস্তবিকই কৃতজ্ঞ। কাজটা হাতে নিতে নিতে কিছু সংশয়ও ছিল আমার মনে। আমার কখনো এমন মনে হয়েছে যে, আমি এমন একটা গ্রন্থের অনুবাদে হাত দিতে যাচ্ছি, যার বক্তব্যের সবটুকুর সাথে আমি একমত নাও হতে পারি। তখনই আমার এক অতীত প্রচেষ্টা থেকে আমি অনুপ্রেরণা সংগ্রহের চেষ্টা করি। ডঃ মুরাদ হফম্যানের "ইসলাম ২০০০" গ্রন্থখানি অনুবাদ করার সময় আমি লিখেছিলাম যে, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) ছাড়া, অন্য কারো সাথেই, সবকিছুতে আমাদের একমত হতে হবে, এমন কোন কথা নেই। মতভেদ থাকতেই পারে — ইসলামের মূল বিষয়গুলোর পরিপন্থী নয়, এমন কোন বক্তব্য পড়া বা

শোনা যেতে পারে খোলা মন নিয়ে। এভাবে ভেবে দেখতে গিয়ে প্রাথমিক সংশয় ধীরে ধীরে কেটে গেল।

একথা ঠিক যে, আমাদের মত গরীব দেশ থেকে শুরু করে বিশ্বের পরাশক্তিসমূহ, সবার বেলাতেই শাসনযন্ত্র কর্তৃক *প্রকাশিত* সত্য, আর যে কোন ঘটনার *অন্তর্নিহিত* সত্য, একেবারেই ভিন্ন দু'টো ব্যাপার হতে পারে। 'পাবলিক' বলতে যাদের বুঝায়, তারা আজকের দুনিয়ায় আসলে কিভাবে কি হচ্ছে, তা না জেনেই জীবনের শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষাসমূহ কাটিয়ে এক সময় পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। তবে একটা ব্যাপার বুঝি, দেশ যত উন্নত, 'পাবলিকের' অজ্ঞতাও তত বেশী। কারণও আছে — উন্নত দেশের শাসনযন্ত্র তাদের পাবলিকের হাতে, আধুনিক প্রযুক্তির বদৌলতে যে সব চমক-প্রদ ছেলে ভুলানো "লজেন্স" তুলে দিতে পারে, গরীব দেশগুলো তা পারে না। শাসকচক্রের লৌহপ্রাচীর বেষ্টিত Data-Bank থেকে কোন একটি বিচ্যুতি বশত, বা, অনেক বছর পরে বিশেষ কোন ব্যাপারের আর তাৎপর্য না থাকাতে, কখনো কখনো বিস্ময়কর সব তথ্য বেরিয়ে আসে। তখন তথাকথিত পাবলিকের অত্যন্ত সচেতন কোন ০.০১% হয়ত মাথা চুলকাতে চুলকাতে ভাবতে থাকে *'এও কি সম্ভব?'* এভাবেই পৃথিবীতে Conspiracy Theory (ষড়যন্ত্র তত্ত্ব) সমূহের জন্ম। পৃথিবীতে অনেক ধরনের Conspiracy Theory চালু আছে। হালে পশ্চিমা পণ্ডিতগণ, যে কোন কিছুতেই ষড়যন্ত্রের গন্ধ খোঁজার দোষে মুসলিমদের, বিশেষত মুসলিম পণ্ডিত বা চিন্তাবিদদের অভিযুক্ত করে থাকেন। ষড়যন্ত্রের আলামত খোঁজাটা মুসলিমদের একচ্ছত্র কোন ব্যাপার নয়। তবে একটা ব্যাপার সত্যিই ভাববার মত — Conspiracy Theory-র অধিকাংশ Conspiracy বা ষড়যন্ত্রের সাথে [ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে] ইহুদীদের একটা যোগ-সাজশ স্পষ্ট।

'অনুবাদকের ভূমিকা' অত্যন্ত সীমিত একটা ব্যাপার, তবু সেকথা মনে রেখেই এখানে আমি কয়েকটি বিষয় আলাপ করতে চাই। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় শত্রুর তালিকায় মিশরীয় আল্-গামা'আ আল্-ইসলামিয়ার ধর্মীয় গুরু, অন্ধ শেখ ওমর আব্দুর রহমান এক শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তি। বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ধ্বংসের প্রথম প্রচেষ্টা, এবং, হল্যান্ড ও লিংকন সুড়ঙ্গ ধ্বংসের তথাকথিত ষড়যন্ত্রের সাথে তাঁর নাম জড়িয়ে আছে। কিন্তু তিনি সুদানের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস থেকে বৈধ ভিসা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যান। তাঁকে নিয়ে যখন যুক্তরাষ্ট্রে তোলপাড় শুরু হলো, তখন প্রশ্ন উঠলো তিনি ভিসা পেলেন কিভাবে? পরে জানা গেলো যে, বিশ্বের অনেক মানুষের যেমন বিশ্বাস যে, মিশরের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ইসলামপন্থীদের হাতে যাওয়া কেবল সময়ের ব্যাপার মাত্র — ঠিক তেমনি একটা ঘটনা যদি সত্যিই ঘটে যায়, তাহলে ইসলামপন্থীদের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের কোন বন্ধুত্ব না থাকলে তারা তখনকার সম্ভাব্য মিশরীয় প্রশাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে — এমন একটা অকল্পনীয় অবস্থার Contingency Plan-এর অংশ হিসেবে বা বলা যায় Fail-Safe

Measure হিসেবে ঐ অন্ধ শেখের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের আশায়, সি-আই-এ ঐ ভিসার ব্যবস্থা করেছিল। মাননীয় পাঠক! যে কোন গোবেচারা আমেরিকান 'পাবলিকের' কাছে এরকম একটা কিছুর সম্ভাবনা হয়ত অকল্পনীয়! এখন শোনা যাচ্ছে পার্ল হার্বার আক্রমণের জাপানী পরিকল্পনার কথা নাকি তৎকালীন মার্কিন প্রশাসন জানত, কিন্তু ইহুদীদের স্বার্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করাটাকে যুক্তিযুক্ত করতে, তারা ঘটনাটা ঘটতে দেয় এবং তাতে কোন বাধা দেবার চেষ্টা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। এই যে Conspiracy theory, এটা নরসিংদীর জনৈক হাজী বরকত আলীর চায়ের দোকানের আড্ডা থেকে সৃষ্ট গল্প নয়। বরং যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতবর্ণ খৃস্টান জাতীয়তাবাদী একটি গোষ্ঠীর ম্যাগাজিন 'ফ্রি-আমেরিকান' থেকে জানা। পাঠকের অবগতির জন্য ঐ ম্যাগাজিন থেকে কিছু Conspiracy theory আমি হুবহু তুলে দিলাম:

In the United States, the Zionist Mafia again went to work on a US president. The names of the players had changed but the game was still the same. It was Franklin Delano Roosevelt's turn to deliver the US into another European war. Patriotic Americans such as famed aviator Charles Lindbergh saw this and tried to warn the American people that Zionist media influence was intending to drive us into another World War. Said Lindbergh:

"*I am not attacking the Jewish people. But I am saying that the leaders of both the British and the Jewish races, for reasons which are as understandable from their viewpoint as they are inadvisable from ours, for reasons which are not American, wish to involve us in the war.*"

Because of strong public anti-war sentiment, FDR and his Zionist allies had a hard time dragging the US into the European war. Then another "incident" came along at Pearl Harbor in 1941. Japan and Germany were bound to a mutual defense agreement, which meant that war with Japan would automatically mean war with Germany. FDR embargoed Japan's oil supply in the hopes of forcing Japan to attack Pearl Harbor. Overwhelming evidence from government documents clearly shows that FDR had advance knowledge of the Japanese attack and allowed it to happen so that he could drag the US into World War II. .....

Regardless of your view of World War II and whether or not the USA belonged in the fight, the essential point which cannot be refuted is again this: years before World War II had even started, ***the Zionists had yet again demonstrated that they had no aversion to sending Americans to die for their own selfish interests.*** [*STRANGER THAN FICTION – An Independent Investigation of 9-11 and the War on Terrorism* – Dr. Albert D Pastore, PhD.]

তাহলেই দেখুন, Conspiracy theory, আমাদের, 'মধ্যযুগীয় বর্বর' মুসলিমদের একচ্ছত্র কোন ব্যাপার নয়।

সেপ্টেম্বর ১১ সম্বন্ধে ভাই ইমরান নযর হোসেনের বক্তব্য, প্রচলিত অনেকগুলো Conspiracy theory-র একটা — এবং আমি এ বিষয়ে তাঁর সাথে একমত নই। কিন্তু গ্রন্থের বাকী অনেক বক্তব্যকেই আমার অত্যন্ত "চোখ-খুলে-দেয়া" ব্যাপার মনে হয়েছে। ড. মুরাদ হফ্‌ম্যানকে [তার ধর্মান্তর সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে] একটা সাক্ষাৎকারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, তিনি কিভাবে নিশ্চিত হলেন যে কুর'আন সত্যিই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তার বাণী। তিনি উত্তর দিলেন যে, কুর'আনের নির্দেশাবলীর মঙ্গলময়তায় তিনি নিশ্চিত যে, ঐ কিতাব সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে আগত। তিনি বললেন যে, কোন একটা বৈদ্যুতিক যন্ত্র [কথার কথা ওয়াশিং মেশিন] যখন কেনা হয়, তখন তার প্রস্তুতকারক কিভাবে ঐ মেশিনের যত্ন নিতে হবে এবং সংরক্ষণ করতে হবে, সে বিষয়ে নির্দেশাবলী সহ একখানা পুস্তক সাথে সরবরাহ করে থাকেন। এখন ঐ মেশিনের মঙ্গলের জন্যই, ক্রেতা বা ব্যবহারকারীর উচিত সে অনুযায়ী কাজ করা। ঠিক তেমনি সৃষ্টিকর্তা, বিশ্ব মানবতার সামগ্রিক কল্যাণের নিয়ম কুর'আনে সন্নিবেশিত করে দিয়েছেন। আমরা মানবতাকে ধ্বংস করব না সুন্দর পরিণতির দিকে নিয়ে যাব সে Choice যেমন আমাদের দেয়া হয়েছে, তেমনি কুর'আনের নির্দেশ অবজ্ঞা করব না মেনে চলব সে Choice-ও আমাদের আছে। এই একই ধরনের যুক্তিতে আমি একটা জিনিস বুঝি যে, আজকের পৃথিবীর সমস্ত পাপাচারের পিছনে ইহুদীদের কালো হাতের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা trace করা যাবে। আজ আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও মাত্র দুই শতাব্দী আগেও খৃস্টান জনসাধারণ, আজকের তথাকথিত মুসলিম মৌলবাদীদের মতই সুদকে 'হারাম' মনে করত — ইহুদীদের কল্যাণে আজ তারা আর তা মনে করে না। সুদ, মদ, নারী দেহ বিপণন, পর্নোগ্রাফি ইত্যাদির ব্যবসার মাধ্যমে, সমগ্র পৃথিবীকে পাপাচার তথা ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে ইহুদীরা কেবল অর্থ-সম্পদের লোভে — এছাড়াও অন্য অভিপ্রায় যা থাকতে পারে তা হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ লাভ। এসবের শৃঙ্খলে মানবতাকে আবদ্ধ করতে পারলে, সহজে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা যায় বা শোষণ ও শাসন করা যায়। শয়তান সম্বন্ধে আমার ধারণা খুব স্পষ্ট নয় — তবে ক্ষমতাশালী ইহুদীদের আমার সাক্ষাত শয়তানের চর ও দাজ্জালের বন্ধু বলে মনে হয় — অনেকটা খৃস্টানরা যে অর্থে Anti-Christ কথাটা ব্যবহার করে থাকে, সেই অর্থে। আজকের পৃথিবীতে শয়তানতন্ত্রের যে জয় জয়কার ধ্বনিত হচ্ছে, তার জানা-অজানা দিকগুলিকে ভাই ইমরান নযর হোসেন অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন — আর আমার মতে এখানেই এই গ্রন্থের সবচেয়ে বড় সার্থকতা নিহিত। *যাবতীয় পাপাচারের সাথে ইহুদী যোগাযোগের ধারণা*

কেবল 'মৌলবাদী মুসলিম মনের খেয়াল' — একথা যে সত্য নয়, তা প্রমাণ করতে আবারো 'ফ্রি-আমেরিকান' ম্যাগাজিন থেকে নিম্ন-লিখিত অংশটুকু হুবহু তুলে দিলাম:

From the beginning they have known that in order to enslave us they would have to de-Christianize America. They have been very successful at eliminating Christianity and the Bible as the moral compass of our nation. They have succeeded by using the federal courts, which they ideologically dominate *to remove Christianity and Bible study from our schools* [১] and all public institutions. **It has been their plan to promote a breakdown of our families and our morality and they have been very successful in this regard.** How have they done it? They exercise near complete control over Hollywood, Television and nearly all print and publishing media. **They continuously produce obscene films and lascivious television shows, intentionally flooding our nation and our minds with pornographic images for the express purpose of destroying the moral fiber of our people.** They have used the ACLU [American Civil Liberties Union] to remove every last vestige of God and Christianity from the public arena.

অনুবাদ করতে গিয়ে আমি চেষ্টা করেছি, ভাই ইমরান হোসেনের ভাবধারাকে অবিকৃত রাখতে – নিজের মনের ভাব-ভঙ্গিকে মেশানো থেকে মানবিক ভাবে যতদূর সম্ভব বিরত থাকতে চেষ্টা করেছি। গ্রন্থখানা যেহেতু গবেষণাধর্মী এবং প্রচুর পান্ডিত্যপূর্ণ – এর তথ্যের শুদ্ধতার দায়-দায়িত্ব আমার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয় – গ্রন্থের তথ্য সমূহের শুদ্ধতার দায় দায়িত্ব তাই লেখকের উপরই বর্তাবে। তৃতীয় বন্ধনীর ভিতরে লেখাগুলো একান্তই অনুবাদকের।

আপনাদের কাছে যদি আমার অনুবাদের এই প্রচেষ্টা গ্রহণযোগ্য হয়, তবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমার মত কর্মজীবীর হাতে, দ্বীনের সামান্য কাজে লাগার চেষ্টা করার জন্য কলম তুলে দিয়েছেন। আর যদি কোথাও আপনাদের খারাপ লাগে, তবে তার সবটুকু ব্যর্থতা একান্তভাবে আমার – কারণ আমি পেশাদার লেখক নই, আর বুদ্ধিজীবী তো নইই। *ওয়ামা তৌফীক্বী ইল্লা বিল্লাহ্*।

মোঃ এনামুল হক
ঢাকা, এপ্রিল, ২০০৪

---

[১] [মাননীয় পাঠক! ব্যাপারটা কেমন পরিচিত মনে হয় না? কাফির, মুশরিক ও হিন্দুস্থানের দালালরা আমাদের শিক্ষা/পাঠক্রম থেকে, পরিকল্পিত উপায়ে যেভাবে ইসলামি বিষয়াবলীকে দূর করতে চেয়েছেন – ঠিক যেন সেরকম একটা ব্যাপার!]

বাংলা পুনঃপ্রকাশ - ২০১১

ঘটনাপ্রবাহের আরও সাতটি বছর কোন্ ফাঁকে কেটে গেছে! যতই দিন যাচ্ছে ততই যেন গোটা পৃথিবী আঁচ করতে পারছে এক অজানা অশুভ দুর্ঘটনার আগমন। বিশেষ করে মুসলমানেরা এখন এক সুনামির মুখে দাড়িয়ে রয়েছে। গত চার মাসে এই সুনামির গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে গেছে। সামনের অবস্থা নিসন্দেহে আরও অধিক ভীতিপ্রদ।

এটি বুঝার জন্য আইন্স্টাইনের দরকার নেই, যে মুসলমানেরাই একান্ত ভাবে এসব ঘটনার মধ্যে আক্রান্ত দল, অর্থাৎ বাকি সকলের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য। অতএব যে জ্ঞানের আজ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তা হলো, এই আক্রমণ "কয় প্রকার ও কি কি" এবং এই আক্রমণকে প্রতিহত করে আমরা কিভাবে টিকে থাকবে পারব। আমি জোর গলায় বলতে পারি যে, শায়খ ইমরান হোসেনের এই গ্রন্থ সেই দিকনির্দেশনার জন্য শুধু যে অপরিহার্য তাই নয়, এই গ্রন্থের কোনো বিকল্প গোটা দিগন্তে আমার নজরে পড়েনি। কাউকে প্রশংসা করা এই সংকট মুহূর্তের তাগিদের মধ্যে পড়ে না। প্রশংসা তো একমাত্র আল্লাহ্রই। তাগিদ হচ্ছে আমরা যে যেখানে আছি, একক ভাবে এবং একত্রিত ভাবে কি করতে পারি সেটাকে জেনে নেওয়া আর সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তা পালন করা। শায়খ ইমরান হোসেনের এই গ্রন্থটি আমাদের জন্য সেই রোড-ম্যাপ, যার মধ্যে সবকিছু স্পষ্টভাবে অর্থাৎ কোনো হেঁয়ালী ছাড়াই তুলে ধরা হয়েছে।

এই গ্রন্থে কুর'আন থেকে প্রচুর পরিমাণে যে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে, সেগুলি অতীতের মত আজও লক্ষ-কোটি মুসলমান পড়ে চলেছে। কিন্তু এই সকল আয়াত সমূহের ভিতরে মানব-জীবনের এত বড় রহস্য লুকিয়ে রয়েছে, তা কি কেউ কখনো ধারনা করতে পেরেছিল? শুধু এই সাত বছরে নয়, তার বহু আগে থেকেই শায়খ ইমরান হোসেনের অন্যান্য লেখা ও বক্তৃতার মধ্যেও এই চিত্রের বিভিন্ন অংশ ফুটে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত বিশাল এই jig-saw puzzle-এর প্রত্যেকটি টুকরার সঠিক স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে শায়খ ইমরান হোসেনের এই গ্রন্থটিতে।

এই গ্রন্থে শায়খ ইমরান হোসেন অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বারে বারে বলেছেন যে, মানব ইতিহাসের যে সকল রহস্য কুর'আনের কথাগুলির ভিতরে আচ্ছাদিত ছিল বলে আজ মনে হচ্ছে, আসলে সেগুলি প্রকাশ হবার জন্য একটি বিষয় সময় নির্ধারিত রয়েছে। অবশ্যই তাঁর এই কথাটি ঠিক। তবে এটাও ঠিক যে, কথাগুলি তো আর লুকানো ছিল না, সেগুলি সব সময়ই মুসলমান অমুসলমান মিলিয়ে গোটা মানব সমাজের সামনে উপস্থিত ছিল। সেই কথাগুলির মধ্যে নিহিত আল্লাহ্তা'লার সমস্ত পরিকল্পনা,

সমস্ত সিদ্ধান্ত আমাদের দিকে সব সময়ই তাকিয়ে রয়েছে। অতএব আল্লাহ্-তা'আলার পরিকল্পনাগুলিকে কোনো রকম ষড়যন্ত্র বা conspiracy বলা যাবে না, কারণ তিনি কোনোকিছুই লুকিয়ে করছেন না, দিব্যি ঘোষণা দিয়েই করছেন।

দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজের কথা কুর'আন-হাদিসে নির্ভুল ভাষায় রয়েছে। যদি কেউ তাদের দুষ্ট মতলবের কথা তুলে ধরে, তাহলে সে কোনো conspiracy theory গড়ে তুলছে, তা বলা যাবে না। ঠিক তেমনি ইহুদীরা প্রথমে দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজের দোসর হয়ে কাজ করবে, এবং পরে তারা তাদেরই কারণে প্রতারিত হবে, এটাও শাস্ত্রের মধ্যে অগণিত কথায় তুলে ধরা হয়েছে। এই কথাগুলিকে গুছিয়ে যদি কেউ একটি সহজ এবং বোধগম্য চিত্র তৈরী করে, তাহলে সেই প্রচেষ্টাকেও conspiracy theory বলা যাবে না। Collins English Dictionary-তে conspiracy theory-কে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে: It is a belief that a group of people are secretly trying to harm someone or achieve something. This term is used to suggest that this is unlikely, অর্থাৎ যে বিষয়টিকে ষড়যন্ত্র বলে মনে হচ্ছে, সেটি আসলে কিছুই না।

আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসুল (সাঃ) শয়তান এবং তার বিভিন্ন শ্রেণীর দোসরদের সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন, সেগুলি অকাট্য সত্য; সেগুলি কল্প-কাহিনী নয়, conspiracy নয়। আর সেগুলি theory তো নয়ই; কারণ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, কোন theory-র উপর নির্ভর করে তিনি জ্ঞান অর্জনের পথে অগ্রসর হন না, না'উযো-বিল্লাহ্। ইসলামে প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণীকে বুঝতে গিয়ে conspiracy theory-র মত পশ্চিমা পরিভাষা ব্যবহার করাটা বিভ্রাট সৃষ্টি করতে পারে। যারা আজ পশ্চিমা ধারায় শিক্ষিত, এই পরিভাষা শোনার সাথে সাথে তাদের মানসে এক প্রত্যাখ্যান প্রবণতা স্থান করে নেবে, অর্থাৎ তারা এটিকে গ্রাহ্যের মধ্যে নিবে না।

এই গ্রন্থে শায়খ ইমরান হোসেন যে মূল প্রতিপাদ্য তুলে ধরেছেন, তাতে কোন ভুল নেই। মহাপ্রলয়ের আগে যে সকল প্রলয়ংকরী ঘটনা ঘটবে তথা ঘটছে, আমরা তারই ভিতর দিয়ে জীবন যাপন করছি। হ্যাঁ, অসংখ্য উদ্ধৃতি দেয়ার পরও, যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি বাদ পড়ে গিয়ে থাকে, সেটা তুলে ধরে তাঁর এই কাজকে সমৃদ্ধ করা যেতে পারে। অথবা, তিনি যদি এমন কোন উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন যার এই বিষয়ের সাথে কোন সম্পর্ক নেই, তাও তাঁকে জানান যেতে পারে। অথবা, তিনি যদি কোন উদ্ধৃতির অর্থ বুঝতে ভুল করেছেন, বা সেটাকে সঠিকভাবে সঠিক জায়গায় প্রয়োগ করেন নাই, তাও তাঁকে জানান যেতে পারে।

মোট কথা হলো, শায়খ ইমরান হোসেন এক বিশাল কাজ অতুলনীয়ভাবে করেছেন। তবুও বিষয়টি আরও বিশাল। কোন্ চিন্তা, কোন্ ভাবনা, আজকে আমাদের

জন্য একেবারে প্রাথমিক, সেটি জেনে নেবার পর আমাদের সকলকে নড়েচড়ে বসতে হবে। বাহিরে কি ঘটছে সেটিকে চোখ খুলে দেখতে হবে, এবং কুর'আন-হাদীসের কথাগুলির মধ্যে সেসম্পর্কে কি ইশারা করা হয়েছে, সেটিকে অন্তরের চোখ দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। এবিষয়ে কুর'আন-হাদীসের কথাগুলি নির্ভুল। সেটির উপর নির্ভর করে শায়খ ইমরান হোসেনের দেয়া বর্ণনা আমাদের জন্য একটি নীল-নকসা বা user manual। এই দুটিকে সম্বল করে আমরা নিজ নিজ পরিস্থিতি মোতাবেক আরও বিজ্ঞোচিত পদক্ষেপ উদ্ভব করব, তিনি এই প্রস্তাবই দিয়েছেন।

যারা এই গ্রন্থখানির পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজন অনুভব করেছেন, এবং সেই কাজ সমাধা করতে এগিয়ে এসেছেন, তাদের মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছেন জনাব জাবেদ আহমদ। একই সাথে যারা শায়খ ইমরান হোসেনের অন্যান্য গ্রন্থ এবং অডিও-ভিডিওগুলির অনুবাদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছেন, তাদের মধ্যে জনাব মুহাম্মদ ইমরান হোসেন, জনাব দীন চৌধুরী, জনাব শিহাবুদ্দীন সাদী অন্যতম। আমি শায়খ ইমরান হোসেনের পক্ষ থেকে এঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ জানাচ্ছি। অবশ্যই, সকল সৎকর্মের ফল আল্লাহ্‌র হাতে।

মুহাম্মদ আলমগীর
সিডনী, অস্ট্রেলীয়া
রজব, ১৪৩২
জুন, ২০১১

ইংরেজি পূর্বকথা

পবিত্র কুর'আনে জেরুজালেম একখানি দারুণ গ্রন্থ; যা আমাকে রোমাঞ্চিত ও পুলকিত করেছে। এমন বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ একখানি গ্রন্থ এত দেরীতে প্রকাশিত হল এই ভেবে আমি অবাক হচ্ছি। ফিলিস্তিনী জনগণের উপর যায়োনিস্টরা ভয়াবহ অত্যাচার ও জাতিগত নিধন শুরু করার পর অর্ধ শতাব্দীরও বেশী সময় অতিক্রান্ত হয়েছে — ফিলিস্তিনী জনগণের একমাত্র অপরাধ এই যে, তারা এমন একটি দেশে বসবাস করে যে দেশটিকে ইহুদীরা তাদের অঙ্গীকারকৃত পবিত্রভূমি মনে করে।

জেরুজালেমকে রাজধানী করে, নীলনদ থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ইসরাঈলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকল্পে, সাধারণ ইহুদীদের প্ররোচিত করতে এবং নিজেদের আগ্রাসী ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডকে যথাযথ প্রমাণ করতে, যায়োনিস্টরা সবসময়ই তৌরাত ও অন্যান্য বাইবেল সামগ্রী থেকে সংগৃহীত বিকৃত পাণ্ডুলিপির বরাত দিয়ে আসছে। উদাহরণস্বরূপ, ইসরাঈলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী David Ben Gurion নাকি বলেছিলেন, "ইসরাঈলের ভূমির জন্য বাইবেল হচ্ছে আমাদের দলিল"। অপরদিকে, নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় সূত্রের বরাত দিয়ে যায়োনিস্টদের মিথ্যা দাবী প্রত্যাখ্যান করতে মুসলিম পণ্ডিতগণ অনেকাংশেই ব্যর্থ হয়েছেন। শুধু তাই নয়, পবিত্র কুর'আন এবং আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ)-এর হাদীস থেকে এ ব্যাপারটিকে পরিস্কারভাবে তুলে ধরতে তাদের যে ধর্মীয় দায়িত্ব ছিল, তাও তারা পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। আমি যতদূর জানি, এ বিষয়ের উপর যা কিছুই লেখা হয়েছে তা অগভীর ও আবেগপূর্ণ — আর না হয় একদম সাধারণ তথ্য বর্ণনা। এই জ্ঞানগর্ভ নথি লিপিবদ্ধ করার জন্য, আল্লাহ্ তা'আলা যেন ভাই ইমরান হোসেনকে পুরস্কৃত করেন — যা অবশ্যই বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মীয় পর্যায়ে উক্ত বিষয়ের উপর যে শূন্যতা বিরাজ করছে, তা পুরণ করবে এবং বিশ্বের সকল অংশের মুসলিমদের জন্য একাডেমিক পর্যায়ে একটা রেফারেন্স স্বরূপও কাজ করবে। আমি যখন এই গ্রন্থের পরিচিতি লিখছি, তখন এই গ্রন্থ, যা কিনা মাত্র এক বছর আগে প্রকাশিত হয়েছে, ইতোমধ্যেই আরবী ও বসনিয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। অল্প দিনেই অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় এবং ইসলামি বিশ্বের সকল ভাষায় এর অনুবাদ বের হবে।

বলা আবশ্যক যে, কুর'আনে 'পবিত্র ভূমি' সম্বন্ধে কি বলা হয়েছে, তা নিয়ে একটি গ্রন্থ লেখার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব, The Muslim Institute for Research and Planning-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডঃ কলিম সিদ্দিকী এবং অধ্যাপক শহীদ ইসমা'ঈল আল-ফারূকির মত দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ও সৃষ্টিধর্মী মুসলিম চিন্তাবিদদের দৃষ্টি এড়ায়নি। আমার অবাক লাগছে এই ভেবে যে, সেই কবে ১৯৭৪ সালে, উপরের প্রথম জ্ঞানী

ব্যক্তিটি ইমরান হোসেনকে এই গ্রন্থটি লিখতে বলেছিলেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, মধ্যপ্রাচ্য তথা গোটা বিশ্বের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বুঝতে চাইলে, জেরুজালেম হবে একটা প্রধান গবেষণার বিষয়, এ বিষয়টি যেন ইমরান তুলে ধরেন। ২৭ বছর পরে, শায়খ ইমরান সফলতার সাথে সে কাজটি সম্পন্ন করেছেন। আপাত দৃষ্টিতে দেরিতে প্রকাশিত হল এমন মনে হলেও, আসলে যখন জেনিন, সাব্রা ও শাতিলায় যা ঘটেছে, তা দেখে গোটা বিশ্ব স্তম্ভিত, তখন এই গ্রন্থের আত্মপ্রকাশকে সময়োচিত বলতে হবে।

ইসমা'ঈল আল্-ফারূকি তার Islam and the Problem of Israel গ্রন্থে এই বিষয়টি উত্থাপন করেছেন, যে গ্রন্থের কথা এই গ্রন্থের লেখকও উল্লেখ করেছেন। তিনি [ইসমা'ঈল আল্-ফারূকি] দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন যে, ইউরোপীয় খৃস্টানদের মধ্যযুগীয় ক্রুসেড বা আধুনিক যুগের ইউরোপীয় উপনিবেশের চেয়ে, ইসরাঈল রাষ্ট্র, মুসলিমদের জন্য অনেক বেশী বিপজ্জনক। তিনি লিখেছেন, "ইসরাঈল এই দু'টি বিপজ্জনক শক্তির একটি নয়, বরং একত্রে দু'টিই এবং তার চেয়েও অনেক অনেক বেশী।" তিনি তাই আরব এবং মুসলিমদের প্রতি আহ্বান জানান যে, তারা যেন এশিয়া ও আফ্রিকার জাতিসমূহের অংশ হিসেবে ঐ ইহুদী রাষ্ট্রটিকে মেনে না নেন। তিনি মুসলিম জ্ঞানীগুণীদের এই ব্যাপারটি আরো গভীরভাবে তদন্ত করে দেখতে উৎসাহিত করেছেন। আমি নিশ্চিত যে, আজ যদি ঐ দু'জন সুবিদিত মুসলিম চিন্তাবিদ বেঁচে থাকতেন, তাহলে এই উন্নত শ্রেণীর গ্রন্থখানিকে তারা তাদের কাঙ্খিত গ্রন্থ বলেই আখ্যায়িত করতেন।

সবশেষে, ইমরানের লেখার ধরন দেখে আমি অভিভূত। যদিও *'পবিত্র কুর'আনে জেরুজালেম'*, ধর্মীয় এবং ঐতিহাসিক বিষয়ের সাথে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে সম্পৃক্ত করে বিস্তারিত বর্ণনা সহকারে লিখিত এক বিশদ রচনা এবং যেখানে কুর'আন ও হাদীসের ব্যাখ্যাসমূহ সংযোজিত হয়েছে — তবুও, পড়তে গেলে মনে হবে যেন একটা গল্পের গ্রন্থ। আপনি একবার পড়তে শুরু করলে, থামা কষ্টকর। একটি উপন্যাসের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য এই যে, পাঠক গ্রন্থটি একবার পড়ার পর সেটিকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে – কিন্তু, ভাই শায়েখ ইমরানের প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ ও ভাবনা উদ্রেককারী গবেষণামূলক এই গ্রন্থের বেলায় তা হবার নয়। এটা সংগ্রহে রাখার মত একখানা গ্রন্থ, এবং যখনই গ্রন্থের মূল বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার প্রয়োজন হবে, তখনই পুনরায় পড়া হবে। আমি বিশ্বাস করি যে তার বাচনভঙ্গির এই মাধুর্য, তার জন্মগত গুণাবলীর সাথে, *দা'ঈ* হিসেবে কাজ করার ফলে এবং তার বিশ্বস্ততার জন্য, আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ প্রাপ্তির ফলে অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

সবশেষে আবারও, সাধারণভাবে গোটা মুসলিম উম্মাহ্‌র এবং বিশেষভাবে ফিলিস্তিনী জনগণের আপাত দুঃখজনক ও হতাশাব্যঞ্জক অবস্থা সত্ত্বেও, গ্রন্থখানি পড়লে

যে কারো মনে অবশ্যই আমাদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে আশাবাদের সঞ্চার হবে – আমাদের ইতিহাসের দীর্ঘ অন্ধকার সুড়ঙ্গের শেষে যেন আলো বিকিরণকারী এক উজ্জ্বল আলো। আমরা সময়ের শেষ অধ্যায়ে বসবাস করছি। এমন একটা যুগ যখন, পবিত্র কুর'আন ও হাদীসের ভবিষ্যতবাণীসমূহ মানবতার কাছে আমাদের বিশ্বাসের [অর্থাৎ ধর্মের] সত্যতা প্রমাণ করতে একে একে আমাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করছে।

আমরা দেখেছি, আরব উপদ্বীপের নগ্নপদ-দরিদ্র মেষপালকরা গগনচুম্বী অট্টালিকা তৈরীর ব্যাপারে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত – ঠিক যেমন আমাদের নবী (সাঃ) আমাদের বলে গেছেন। আর আমরা দেখেছি সংখ্যায় অধিক হওয়া সত্ত্বেও, কিভাবে মুসলিমরা চরিত্রের দিক থেকে দুর্বল এবং কিভাবে পার্থিব জগতের ভালোবাসা ও মৃত্যুভয় তাদের নতজানু করে রেখেছে – যা এ ব্যাপারে বর্ণিত সহীহ্ হাদীসকে সত্যায়িত করে। এবং ঠিক যেমন আমাদের নবী (সাঃ) বলেছিলেন, ইসলামের পরাক্রমশালী শত্রুরা আজ আমাদের দেশগুলোকে এমনভাবে লুটেপুটে খাচ্ছে, যেন তারা এমন এক অভুক্ত মানুষের দল, যাদেরকে খাবারের এক বিরাট পাত্রে খেতে ডাকা হয়েছে। আর যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নাজিলকৃত পবিত্র কুর'আনে বলেছেন – ঠিক সেইভাবে ইসরাঈলের সন্তানরা, যারা সারা পৃথিবীতে বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় হিসেবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, 'পবিত্রভূমিতে' ফিরে এসেছে। এবং কুর'আনের বর্ণনার মতই তারা নানা পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে ও ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে এবং ক্ষমতার দম্ভে আত্মহারা হয়ে উঠেছে।

আমরা ঘটনার ক্রমবিকাশ এমনভাবে দেখলাম, যেন আমরা একটা লোমহর্ষক ছায়াছবি দেখছিলাম – ঠিক একইভাবে আমরা একটা সুখকর ও আসন্ন সমাপ্তি দেখতে পাব, যেমনটি কুর'আন ও হাদীসের মাধ্যমে আমাদের ভবিষ্যদ্‌বাণী হিসেবে বলা হয়েছিল। মুসলিম জাতি ঘুম থেকে জেগে উঠবে এবং ইহুদীরা তাদের প্রতি অঙ্গীকারকৃত ঐশ্বরিক শাস্তি লাভ করবে। যায়োনিস্ট রাষ্ট্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে আর তারা সেখানে যা কিছু স্থাপনা করেছে সব ধূলায় গড়াবে।

কুর'আন ও সুন্নাহ্ থেকে চমৎকার ব্যাখ্যাসহ, এই পর্বগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এই গ্রন্থে। কুর'আনের কিছু আয়াত ও মহানবীর (সাঃ) কিছু হাদীসের যে ব্যাখ্যা তিনি [ইমরান] দিয়েছেন, যদিও তার সাথে কারো কারো মত-পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু তার তীক্ষ্ণ চিন্তাশক্তি ও আধ্যাত্মিক গভীরতার মূল্যায়ন করতে কেউই ব্যর্থ হবেন না। আমি তাই পণ্ডিত ও সাধারণ মানুষ সবাইকেই গ্রন্থখানি সুপারিশ করছি।

মালিক বাদ্‌রী
অধ্যাপক, International Institute of Islamic Thought and Civilization,
কুয়ালালামপুর, মালয়শিয়া।
১৮ই নভেম্বর, ২০০২; ১৩ই রমজান, ১৪২৩ হিঃ

ইংরেজি দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রথম প্রকাশের নয় মাস পর, '*পবিত্র কুর'আনে জেরুজালেম*' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। এ সময়ের ভিতর এই গ্রন্থটি best seller-এ উন্নীত হয়েছে — আমার লেখা গ্রন্থগুলির মধ্যে এটাই প্রথম। সকল প্রশংসাই আল্লাহ্ তা'আলার। মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অবস্থিত International Institute of Islamic Thought and Civilization এর অধ্যাপক, বিশিষ্ট সুদানী পণ্ডিত ডঃ মালিক বাদরী এই নতুন সংস্করণের 'পূর্বকথা' অংশটুকু লিখেছেন। The Dilemma of Muslim Psychologists নামের মেধাসম্পন্ন নতুন ধারার গ্রন্থটির লেখক হিসেবে তিনি বেশী পরিচিত।

এই গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের ৭ম অধ্যায়ে আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে, মদীনার ইহুদীদের মাঝে পৌঁছানোর পরে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) জেরুজালেমকে কিব্‌লা করে নামাজ পড়তেন এবং তৌরাতের নিয়ম অনুযায়ী ইহুদীরা যে সব দিনে রোজা রাখত, সে সব দিনে তিনিও রোজা রাখতেন। আমরা এও বলেছি যে, তিনি যে ইব্রাহীম (আঃ)-এর মতই আল্লাহ্‌র একজন সত্যিকার নবী, ইহুদীদের কাছে তাঁর সে দাবীর যথার্থতা বুঝাবার জন্য তিনি এটা করেছিলেন। আমরা এই নতুন সংস্করণে একটা তৃতীয় বিষয় যোগ করেছি, সেটা হচ্ছে 'রজ্‌ম' (পাথর নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ড) সংক্রান্ত (৭ম অধ্যায় দেখুন)। '*পবিত্র কুর'আনে জেরুজালেম*'-এর বৃহত্তর বিষয়ে, 'রজ্‌ম' প্রসঙ্গ সংযোজন করাতে, অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইসলামে যিনার (বিবাহ বহির্ভূত যৌন সংসর্গ) শাস্তির বিষয়টিকে এক গুরুত্বপূর্ণ পটভূমির নিরিখে মূল্যায়ন করতে পারবেন।

দ্বিতীয় এই সংস্করণ এমন এক সময় ছাপাখানায় যাচ্ছে যখন, ইরাক আক্রমণ করার এবং সেখানকার সরকার উৎখাত করে তার স্থলে একটা আফগান-পাকিস্তান স্টাইলের মার্কিন (ইয়াংকি) সরকার বসানোর আমেরিকান হুমকি এখনো বাস্তবায়িত হয়ে সারেনি। '*পবিত্র কুর'আনে জেরুজালেম*' ইরাকের উপর আসন্ন ঐ হামলার পেছনে যে দুরভিসন্ধি রয়েছে সেটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। প্রথম অধ্যায়ে আমরা বাইবেলের ভাষ্যমতে 'পবিত্রভূমির' সীমানাকে (মিশরের নদী থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত) শক্তি মদমত্ত দুর্বিনীত ইসরাঈলের মহাপরিকল্পনার লক্ষ্য বলে চিহ্নিত করেছি, যার জন্যে সে অতি শীঘ্রই একটা বড় যুদ্ধ বাঁধাবে বলে আমরা মনে করি। প্রতারণায় যারা PhD ডিগ্রি লাভ করেছেন, তারা নিশ্চয় এমন একটা যুদ্ধ বাঁধাবেন না যাতে আপাত দৃষ্টিতে তাদের আগ্রাসী বা আক্রমণকারী বলে মনে হবে। ইরাকের উপর মার্কিন হামলার পেছনে উদ্দেশ্য সমূহের ভিতর এটাও একটা যে, আরব জনগণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে বিপুল সংখ্যায় রাস্তায় নেমে আসুক, যার ফলশ্রুতিতে আমেরিকাপন্থী আরব শাসকদের

কারো কারো পতন হোক, আর তাদের জায়গায় আমেরিকা বিরোধী ও ইসলামপন্থী সরকার ক্ষমতায় আসুক। এমতাবস্থায় হঠাৎ করে এক প্রচারণা যুদ্ধ শুরু হবে যাতে বলা হবে যে, তথাকথিত জঙ্গী ইসলামের পুনরুত্থানের ফলে ইসরাঈলের অস্তিত্ব চরম হুমকির মুখে রয়েছে। ইহুদীরা তখন আচম্‌কা তাদের 'মিশরের নদী থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত' বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর ইহুদী সামরিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে বিশাল যুদ্ধাভিযান শুরু করবে। গ্রন্থের এই দ্বিতীয় সংস্করণে, আমরা মনে করিয়ে দিতে চাই যে, 'মিশরের নদীর' কৌশলগত ব্যাখ্যা হচ্ছে 'সুয়েজ খালের' উপর ইহুদী নিয়ন্ত্রণ আর একইভাবে 'ফোরাত নদীর' মর্মার্থ হচ্ছে উপসাগরের তেল সম্পদের উপর ইহুদী নিয়ন্ত্রণ। এর সাথে ভবিষ্যত বাণী মোতাবেক মার্কিন ডলারের তথা মার্কিন অর্থনীতির ধ্বস, ইসরাঈলকে স্বাভাবিকভাবেই পৃথিবীর [নতুন] নিয়ন্তা রাষ্ট্রের আসন দান করবে। ইহুদীরা তখন ঐ মর্যাদা লাভ করবে যা তাদের মতে মসীহ্ কর্তৃক তাদেরকে দান করার কথা।

এই গ্রন্থের প্রকাশনা ও এই বিষয়ের উপর আমার বক্তৃতা ইতোমধ্যেই এমন প্রতিক্রিয়ার সূচনা করেছে যা পূর্বাহ্নেই আন্দাজ করা গিয়েছিল। গত ১৪ বৎসর যাবত একাধারে ইসলামের উপর ভাষণ দিয়ে থাকলেও, [এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুর উপর মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করার পর] একটি দ্বীপ রাষ্ট্রে এই প্রথম বারের মত আমাকে ইসলামের উপর ভাষণ দেয়ার অনুমতি দেয়া হয় নি।

কিন্তু সকল প্রতিক্রিয়ার মাঝে '*পবিত্র কুর'আনে জেরুজালেম*' গ্রন্থের ব্যাপারে সবচেয়ে দুঃখজনক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে ইসলামের ঐ সমস্ত উলামাদের তরফ থেকে, যারা ঢালাওভাবে গ্রন্থখানিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন; এই যুক্তিতে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আসল মসীহ্ {নবী ঈসা (আঃ)}, 'ভণ্ড-মসীহ্' দাজ্জালকে হত্যা না করবেন ততক্ষণ ইয়াজুজ ও মাজুজকে পৃথিবীতে ছেড়ে দেয়া হবে না। (এটা সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝা যায় যে, এধরনের বিশ্বাসের কোন ভিত্তি নেই)। আর তারা তাই বর্তমান পৃথিবীর ব্যবস্থাকে ইয়াজুজ ও মাজুজের নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা বলে মেনে নেয়াটা স্থির ও নিশ্চিত চিত্তে প্রত্যাখ্যান করেন (এমনকি পাকিস্তানের প্রখ্যাত পণ্ডিত ডাঃ ইসরার আহ্‌মদ তার বিশদ বর্ণনায় বর্তমান পৃথিবীর নিয়ন্ত্রকদেরকে ইয়াজুজ-মাজুজের 'আত্মীয়' বলে আখ্যায়িত করেছেন, তাও তারা মানতে রাজী নন) – বরং ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তির প্রশ্নে তারা আসল মসীহ্ {নবী ঈসা (আঃ)}-এর আগমনের অপেক্ষায় রয়েছেন। তারা অত্যন্ত দুঃখজনক ভ্রান্তির মাঝে রয়েছেন। আসলে তারা পর্বত সমান ভুল করছেন। এই ভুলের যে মাসুলটা তারা দিচ্ছেন তা হচ্ছে, বর্তমান পৃথিবীকে বুঝার ব্যাপারে তারা এক বিপজ্জনক ও দুঃখজনক অক্ষমতার কাছে বন্দী হয়ে রয়েছেন। এছাড়া, এখনকার আজব পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত ঘটনার দৃশ্যপট যে রকম ভয়ঙ্করভাবে ও দ্রুতভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, তা আগে থেকে আঁচ করতে না পারাটা আরও মারাত্মক এবং দুঃখজনক। ফলে

আমরা যে যুগে বাস করছি, সে যুগের ভয়ঙ্কর চ্যালেঞ্জকে সঠিকভাবে মোকাবেলা করতে তারা অক্ষম।

এই সংস্করণ যখন ছাপাখানায় যাচ্ছে, তখন এর আরবী ভাষান্তর প্রায় সমাপ্ত। বসনীয় ভাষান্তর ইতোমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে। উর্দু, মালয়শিয় ও ইন্দোনেশীয় ভাষায় ভাষান্তরের কাজও এগিয়ে চলেছে। ফরাসী এবং হওসা ভাষায় অনুবাদের একটা অঙ্গীকার ইতোমধ্যেই ব্যক্ত করা হয়েছে। মুসলিমরা যত ভাষায় কথা বলে, তার সবকটিতে গ্রন্থখানি অনুবাদ করার যে আহ্বান আমি জানিয়েছিলাম, এসব তারই আংশিক বাস্তবায়ন। প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রাপ্য। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই!

ইমরান নযর হোসেন
কুয়ালালামপুর
রমজান, ১৪২৩
ডিসেম্বর, ২০০২

ইংরেজি প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জেরুজালেমের আল্-আক্সা মসজিদে এরিয়েল শ্যারনের নাটকীয় প্রবেশ, শুধু যে ইসরাঈলী নির্যাতনের নতুন রক্তাক্ত অধ্যায়ের সূচনা করেছে এবং সেই নিপীড়ন-নির্যাতন প্রতিহত করতে নতুনভাবে বীরোচিত মুসলিম প্রতিরোধ আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে তাই নয়, বরং ঐ ঘটনা আমাকে '*সুরা কাহাফ্ এবং আধুনিক যুগ*' বিষয়ের উপর যে গ্রন্থখানি আমি তখন লিখছিলাম, সেটা বন্ধ করে তার পরিবর্তে, '*পবিত্র কুর'আনে জেরুজালেম*' নামক এই গ্রন্থটি লিখতে প্ররোচিত করে।

এক বছর পরে ১১ই সেপ্টেম্বরে যখন আমেরিকার উপর সন্ত্রাসী হামলা হয়, তখনও আমি নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা (আমি এখন আমার নতুন বাসস্থানের সন্ধানে আছি) এবং এই গ্রন্থখানি তখন প্রায় শেষের পথে। আসলে গ্রন্থখানি পরবর্তী পবিত্র রমজান মাসে কুয়ালালামপুরে শেষ হয়েছে, ঠিক যখন আমি বর্ণনাতীত মনঃকষ্টের সাথে আফগানিস্তানের সেই সব মুসলিমদের উপর আমেরিকার কাপুরুষোচিত ও নিতান্ত নির্লজ্জ সন্ত্রাসী হামলা পর্যবেক্ষণ করছিলাম, যারা ইসলামের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছিল এবং আমেরিকায় ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসী হামলার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিল।

এটা আমাদের সৌভাগ্য যে '*পবিত্র কুর'আনে জেরুজালেম*', পাঠকের হাতে ঠিক এমন সময় পৌঁছাচ্ছে যখন বিষয়টি নাটকীয়ভাবে সমগ্র মানবকুলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আপাত দৃষ্টিতে এক রকম অসম্ভব বলেই মনে হয় যে, একজন ইহুদী বা খৃস্টান '*পবিত্র কুর'আনে জেরুজালেমের*' বিষয়টিকে হয়ত বুঝবে এবং গ্রহণ করবে, তবুও মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সত্যিকার নবী হিসেবে এবং কুর'আনকে আল্লাহ্র বাণী বলে গ্রহণ করবে না। একইভাবে এটাও অসম্ভব মনে হয় যে, একজন আহমাদী (মির্জা গোলাম আহমদের অনুসারী — যাদেরকে কাদিয়ানীও বলা হয়) এই গ্রন্থের মূল যুক্তিগুলি এবং অনুসিদ্ধান্তগুলিকে মেনে নেয়ার পরও আহ্মাদী থাকতে পারবে! এটা পরিস্কারভাবে বুঝে যাওয়ার কথা যে, মির্জা গোলাম আহ্মাদের মাসীহ্ হবার দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল।

শায়েখ সফর আল্ হাওয়ালির গ্রন্থ: The Day of Wrath — Is the Intifada of Rajab only the Beginning? গ্রন্থখানি মাত্র প্রকাশিত হয়েছে এবং গ্রন্থখানি এই গ্রন্থের পাশাপাশি পড়া উচিত। পাঠককে অনুরোধ করা হচ্ছে, তারা যেন Internet-এর www.islaam.com/books/intifada.htm থেকে গ্রন্থখানি দেখে নেন।

এছাড়া এই গ্রন্থটি পড়ার পাশাপাশি, পাঠক যদি The Religion of Abraham and the State of Israel — A View from the Qur'an এর মত সহায়ক

গ্রন্থটি পড়তে পারেন, তবে তা খুবই কাজে লাগবে। ঐ গ্রন্থে তৌরাত ও কুর'আন থেকে অনেক উদ্ধৃতি রয়েছে, যেগুলি এই গ্রন্থের বহু বিষয়ের উপর আলোকপাত করে।

কেবলমাত্র আরবী কুর'আনই কুর'আন, এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পবিত্র কুর'আনের সব উদ্ধৃতির আরবী আয়াতগুলি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

আধুনিক ইসরাঈল সম্বন্ধে খবরের যে সব উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে, তার বেশীর ভাগই নেয়া হয়েছে The Jerusalem Post নামক ইসরাঈলী খবরের কাগজ থেকে। যেখানেই কোন উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে, সেখানেই তার সূত্রের উল্লেখ করা হয়েছে।

ডঃ ইসমা'ঈল রাজী ফারূকির গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ Islam and the Problem of Israel থেকে একটি অংশ এই গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এই ভেবে যে, ঐ পণ্ডিত ব্যক্তি এবং তাঁর ঐ উঁচু মাপের কাজ পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে, যা তাঁর প্রাপ্য।

State of Israel-এর মত যখন কোন ইংরেজি বক্তব্যে আমরা 'ইসরাঈল' শব্দটি ব্যবহার করেছি, তখন ইংরেজি বানান মতে 'ইসরাঈল'-ই ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু Banu Israil-এর মত কোন কুর'আনিক বক্তব্য যখন আমরা ব্যবহার করেছি, তখন সে বানানে আদি আরবী (Israil ইসরাঈল) শব্দটি প্রতিফলিত হয়েছে। কুর'আনের সব উদ্ধৃতিতে সুরার নাম ও তার পর সুরার সংখ্যামান ও আয়াতের নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে (উদাহরণ স্বরূপ প্রথম সুরার দ্বিতীয় আয়াত যখন উদ্ধৃত করা হয়েছে তখন তার শেষে লেখা হয়েছে: কুর'আন, সুরা ফাতিহা ১:২)।

দু'জন মালয়শিয় মুসলিম ভাইয়ের সহায়তায় এই গ্রন্থটি লেখা এবং প্রাথমিকভাবে ছাপান সম্ভব হয়েছে, যারা চাননি তাদের নাম উল্লেখিত হোক। আমি তাদের দু'জনের কাছে তাদের সহায়তার জন্যে কৃতজ্ঞ। সুলায়মান ড্যুফোর্ড, মোহাম্মদ আলমগীর এবং সাবিনা ওয়াতানাবি প্রুফ দেখে এবং উপদেশ দিয়ে সাহায্য করেছেন। কুয়ালালামপুরের Bounce Graphics-এর হাবিবুর রহমান প্রচ্ছদ ডিজাইন করেছেন। আল্লাহ্ যেন তাদের সকলকে তাদের সহায়তার জন্য পুরস্কৃত করেন। আমীন!

আমি অত্যন্ত বিনীতভাবে আল্লাহ্র ক্ষমা, দিক নির্দেশনা, সুরক্ষা ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি। আমি তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইছি, তিনি যেন দয়া করে সত্যের পক্ষে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু কবুল করেন ও আশীর্বাদ করেন, এবং এই গ্রন্থে প্রকাশিত তথ্যে যারা নিজকে আক্রান্ত মনে করবেন, তাদের আক্রোশ থেকে এই গ্রন্থটিকে রক্ষা করেন। আমীন! মওলানা আনসারী (রঃ), যিনি আমাকে ইসলামের শিক্ষা দিয়েছিলেন, আমার প্রিয় বাবা ইব্রাহীম হোসেন ও মা তাইমুন হোসেন, যারা আমায় ইসলামকে ভালোবাসতে শিখিয়েছিলেন এবং আমার স্ত্রী: আয়শা অ্যাঞ্জেলা, যিনি ইসলামের জন্য আমার এই ক্ষুদ্র

প্রচেষ্টায় দৃঢ়ভাবে, বিশ্বস্ততার সাথে, যত্ন সহকারে এবং স্নেহভরে আমার পাশে থেকেছেন — তাদের সবাইকে আল্লাহ্ যেন আশীর্বাদ করেন। আমীন!

ইমরান নযর হোসেন
কুয়ালালামপুর,
জুন, ২০০২

ইসরাঈল রাষ্ট্র সম্বন্ধে ইসমা'ঈল রাজী আল্-ফারূকীর বক্তব্য

Islam and the Problem of Israel
Ismail Raji Faruqi

[ডঃ ফারূকি মনে করেন যে, মুসলিমদের জন্য মধ্যযুগের ইউরোপীয় খৃস্টানদের ক্রুসেড অথবা আধুনিক ধর্ম-নিরপেক্ষ যুগের ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের চেয়ে ইসরাঈল হচ্ছে বৃহত্তর বিপদের কারণ। তাই 'এশিয়া ও আফ্রিকার মুসলিম জাতি সমূহের জগতে' সদস্য হিসেবে ইসরাঈলকে গ্রহণ করার আহ্বানকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন।]

"আজকের মুসলিম জগতের জন্য ইসরাঈল যে ধরনের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, ইসলামের ইতিহাসে তার কোন নজির নেই বা তার সমপর্যায়েরও কিছু নেই। মুসলিম বিশ্ব চেয়েছে এই সমস্যাকে আধুনিক উপনিবেশিকতার আরেকটা উদাহরণ হিসেবে দেখতে, অথবা বড়জোর ক্রুসেডের পুনরাবৃত্তি বলে ভাবতে।

ইসরাঈল এ দু'টোর কোনটিই নয় বলা ঠিক হবে না, বরং ইসরাঈল দু'টোই এবং তার চেয়েও বেশী, অনেক বেশী [বড় একটি সমস্যা]। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশতঃ এ ব্যাপারটির উপর কোন ইসলামি প্রকাশনা নেই।

সুতরাং, *'বর্তমান সময়ের'* সকল সমস্যার মত এই সমস্যার বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা সাধারণভাবে গোটা মুসলিম বিশ্বকে এবং বিশেষভাবে আরব বিশ্বকে চাপ দিচ্ছে যেন ইসরাঈলকে 'এশিয়া ও আফ্রিকার মুসলিম জাতি সমূহের' অভিন্ন সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।"

ইসমা'ঈল রাজী আল-ফারূকী

(Islamic Council of Europe কর্তৃক ১৯৮০ সালে প্রকাশিত তার গ্রন্থ: Islam and the Problem of Israel [ISBN: 0 907163 02 5] থেকে উদ্ধৃত)।

শব্দকোষ

ইনতিফাদা: অভ্যুত্থান।

ইঞ্জীল: খ্রীস্টানদের ধর্মগ্রন্থ – নতুন নিয়ম।

ইমাম আল-মাহ্দী: মুহাম্মদ (সাঃ)-এর একজন বংশধর। যখন ঈসা (আঃ) তাঁর জীবনের দ্বিতীয় অংশ কাটাবার জন্য পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করবেন, তখন ইমাম মাহ্দী তাঁকে সনাক্ত করবেন, যেমনটি পূর্বে তাঁর জীবনের প্রথম অংশে ইয়াহিয়া (আঃ) তাঁকে সনাক্ত করেছিলেন।

ইসরা এবং মি'রাজ: মক্কা থেকে জেরুজালেমে, অতঃপর ঊর্দ্ধাকাশে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অলৌকিক ভ্রমণ।

কাফির: অবিশ্বাসী – যে ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

কিব্লা: সাধারণ অর্থে দিক – বিশেষ অর্থে যে দিকে মুখ করে সালাত বা নামায আদায় করা হয়।

কুফ্র: সচেতনভাবে সত্যকে প্রত্যাখ্যান।

খোরাসান: নবীজী (সাঃ)-এর আমলে খোরাসান বলতে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব ইরান পর্যন্ত বিশাল অঞ্চলকে বুঝাত, গোটা আফগানিস্তান এবং আফিগানিস্তানের উত্তরে অবস্থিত এলাকা এর অন্তর্ভূক্ত ছিল।

জাস্যাসাহ্: আক্ষরিক অর্থে গুপ্তচর।

জিযিয়া: ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী ইহুদী ও খ্রীস্টানদের উপর আরোপিত কর বিশেষ।

দাজ্জাল: দাজ্জাল হচ্ছে একজন ব্যক্তির রূপে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের রূপে এবং এক অদৃশ্য শক্তির রূপে কুফ্রের চূড়ান্ত বহিপ্রকাশ। ব্যক্তি 'দাজ্জাল' জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করবে শেষ সময়ে, কিয়ামতের ঠিক আগে – সে নিজেকে 'মসীহ্' বলে দাবী করবে। এমতাবস্থায় প্রকৃত 'মসীহ্' ঈসা (আঃ) পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসবেন এবং তাকে হত্যা করবেন।

দা'ব্বাতুল আর্দ: আক্ষরিক অর্থে ভূমিতে বিচরণকারী একটি জন্তু (সম্ভবত পবিত্র ভূমিতে বিচরণকারী)।

দ্বীন: ধর্ম, জীবন-ব্যবস্থা।

নাজ্দ: আরবের পূর্বাঞ্চ।

ফাসাদ: দুষ্কর্ম, ধ্বংস, বিপর্যয়।

ফিত্না: পরীক্ষা ও বিপদ-আপদ।

বনী ইসরাঈল: ইসরাঈলি বংশোদ্ভূত ইহুদীগণ।

বাইত আল মাক্বদিস বা বাইতুল মুকাদ্দাস: জেরুজালেম।

মসীহ্: মানবজাতির ত্রাণের উদ্দেশ্যে যাঁর আবির্ভাব ঘটবে বলে ইহুদীরা আশা করে; (খৃস্টানদের মতে) যীশু খৃস্ট।

মাসজিদুল আক্সা: জেরুজালেমে সুলায়মান (আঃ)-এর তৈরী মসজিদ বা উপাসনালয়।

যুল ক্বারনাইন বা যুলকারনায়েন: আক্ষরিক অর্থে দুই শিংয়ের অধিকারী, অথবা দুই যুগে অবস্থানকারী। সুরা কাহ্ফে এই ব্যক্তির উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁর ক্ষমতা ঈমানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি সেই দেয়াল তৈরী করেছিলেন, যা ইয়াজুজ ও মাজুজকে শেষ যুগ না আসা পর্যন্ত আটকে রাখবে। কিয়ামতের সময় নিকটবর্তী হলে স্বয়ং আল্লাহ এই দেয়াল ধ্বংস করে দেবেন এবং ইয়াজুজ-মাজুজ পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে।

হিজায: পশ্চিম আরব।

প্রথম খন্ড

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

قَدْ جَاءَكُم بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۚ
وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿١٠٤﴾

"তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে নির্দেশনাবলী এসে গেছে। অতএব যে প্রত্যক্ষ করবে, সে নিজেরই উপকার করবে, এবং যে অন্ধ হবে, সে নিজেরই ক্ষতি করবে। আর আমি তো তোমাদের পাহারাদার নই।"

(কুর'আন, সুরা আন'আম ৬:১০৪)

পবিত্র কুর'আনে সকল ঘটনার ব্যাখ্যা রয়েছে — জেরুজালেমের ভবিষ্যত সহ

কুর'আন ঘোষণা করেছে যে সব কিছুর ব্যাখ্যা দেয়াই তার প্রাথমিক কাজ:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ
وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

"... এবং (হে মুহাম্মদ) আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যাতে রয়েছে প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, এবং হেদায়েত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ।"

(কুর'আন, সুরা নাহ্‌ল, ১৬:৮৯)

কুর'আন যখন উপরোক্ত ঘোষণাটি দিয়েছে, তখন বুঝতে হবে যে সেটি, মানব ইতিহাসের এযাবত ঘটে যাওয়া সকল ঘটনার সবচেয়ে আজব, সবচেয়ে রহস্যময় এবং সবচেয়ে ব্যাখ্যাতীত ঘটনাটিও বুঝিয়ে দিতে সক্ষম — সেই ঘটনাটি, যার প্রকৃত রূপ এখনো অনাবৃত হয়ে চলেছে, তবে যার ফলাফল ইতোমধ্যেই আমরা দেখেছি:

- ১৯১৭-১৮ সালে ধর্ম-বিমুখ ইউরোপ 'পবিত্রভূমিকে' মুক্ত করার সাফল্য অর্জন করে। প্রায় ১০০০ বছর পূর্বে ইউরোপীয় খৃস্টানদের দ্বারা পরিচালিত ক্রুসেডের মাধ্যমে যে প্রচেষ্টার সূচনা হয়েছিল, এই সাফল্য সেই সুদীর্ঘ প্রচেষ্টারই ফল।

{খৃস্টান ইউরোপের 'পবিত্রভূমিকে' মুক্ত করার মোহ ১০০০ বছর পুরানো। কিন্তু বর্তমান ইউরোপ পুরাপুরিভাবে ধর্মনিরপেক্ষ এবং অবশ্যই ধর্ম-বিমুখ। তাহলে, তারা কেন 'পবিত্রভূমিকে' মুক্ত করতে চাইবে? আর ১০০০ বছরের বেশী আগে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করা ইউরোপীয় খৃস্টানরাই বা কেন *একমাত্র* খৃস্টান জনগোষ্ঠী যারা 'পবিত্রভূমিকে' মুক্ত করার মোহে অন্ধ?}

- ২০০০ বছরেরও আগে, মহান আল্লাহ্ যাকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, সেই আদি ইসরাঈল রাষ্ট্রের পুনরুদ্ধার কাজে ইউরোপীয় ইহুদীদের সাফল্য — এই সাফল্যও সম্ভব হয়েছে একই ধর্মনিরপেক্ষ, মূলত ধর্ম-বিমুখ ইউরোপের সক্রিয় সহযোগিতায়।

{দাউদ (আঃ) এবং সুলায়মান (আঃ) কর্তৃক ২০০০ বছরেরও আগে প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় রাষ্ট্রটি পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে, ধর্মনিরপেক্ষ ইউরোপ কেন ইউরোপীয় ইহুদীদের সাহায্য করার ব্যাপারে এমন মোহাচ্ছন্ন হবে? আর কেনই বা [গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইহুদীদের মধ্যে] *কেবল* ইউরোপীয় ইহুদীরাই ইসরাঈল রাষ্ট্র পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে সংকল্পবদ্ধ হবে?}

- আল্লাহ্ কর্তৃক পবিত্রভূমি থেকে বহিষ্কৃত হবার পর এবং ২০০০ বছর বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় হিসেবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকার পর ইসরাঈলী ইহুদীদের পবিত্রভূমিতে প্রত্যাবর্তন (অর্থাৎ অ-ইউরোপীয় ইহুদীদের প্রত্যাবর্তন)। ইউরোপীয় ইহুদীরা, ইসরাঈলী ইহুদীদেরকে পবিত্রভূমিতে ফিরিয়ে আনলেও, তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে 'ফিরে এসেছে' কথাটি প্রযোজ্য নয়, কারণ তারা তো আগে কোন সময়েই সেখানকার বাসিন্দা ছিল না — তারা কেমনে সোজা পবিত্রভূমিতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করল?

{ইউরোপীয় মানুষজন কেন ইহুদী ধর্মে ধর্মান্তরিত হল, এবং কেনই বা তারা পবিত্রভূমিকে মুক্ত করার ও ইসরাঈলী ইহুদীদেরকে সেখানে ফিরিয়ে আনার মিশনকে যে করেই হোক সম্পন্ন করার ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করল?}

এর সবকিছুই, বাকি পৃথিবীর কাছে আজব এবং নৈরাশ্যজনক মনে হলেও, ইহুদীদের কাছে তাদের দাবীকৃত সত্যাসত্যের প্রমাণস্বরূপ মনে হয়। উপরের ঘটনাগুলো থেকে মনে হতে পারে যে, মহান আল্লাহ্ ইহুদীদেরকে যে কথা দিয়েছিলেন, অর্থাৎ তাদের মাঝে একজন নবী পাঠানো হবে, যাকে সবাই 'মসীহ্' বলে জানবে, এবং যিনি তাদের জন্য উপরোক্ত সব কিছু বা তার চেয়ে বেশী কিছু এনে দেবেন — সেই সকল প্রতিশ্রুতি বাস্তব রূপ লাভ করল বুঝি।

এই গ্রন্থে দেখানো হবে যে, কুর'আন শুধুমাত্র যে এসব আজব ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা দিয়েছে তাই নয়, বরং জেরুজালেমের শেষ পরিণতি কি হবে তাও বলে দিয়েছে। কুর'আন এমন এক পরিণতির কথা জানিয়ে দিয়েছে, যা ইহুদীদের সত্যাসত্যের দাবীর ভিতর যে মিথ্যাচার রয়েছে তাকে উন্মোচিত করে দেয় এবং রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে যা এসেছিল তার সত্যতাকে নিশ্চিত করে। ইতিহাসের সবচেয়ে কঠোরতম ঐশ্বরিক শাস্তির মাধ্যমে, ইহুদীরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কর্তৃক সাজা প্রাপ্ত হবে — ঐ পরিণতির মাধ্যমে সেটাই বাস্তবায়িত হবে।

জেরুজালেম এবং পবিত্রভূমির পরিণতি সম্বন্ধে কুর'আনিক দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রবিন্দুতে এই ঘোষণা রয়েছে যে, যখন শেষ সময় ঘনিয়ে আসবে, ইহুদী সম্প্রদায়কে, যারা বহুভাগে বিভক্ত হয়ে দেশে দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল, সেই অবস্থা থেকে 'মিশ্র জনগোষ্ঠী' হিসেবে 'পবিত্রভূমি'তে ফিরিয়ে আনা হবে (কুর'আন, সুরা বনী ইসরাঈল ১৭:১০৪)। আল্লাহ্র সেই কথা ইতোমধ্যে পূর্ণ হয়েছে। ইহুদীরা ইতোমধ্যে 'পবিত্রভূমিতে' ফিরে এসেছে এবং সেটির উপর নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠা করেছে। ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার সাফল্য, তাদেরকে এই রাষ্ট্রের ধর্মীয় বৈধতায় বিশ্বাসী করে তুলেছে। ইসলামের ব্যাখ্যা এই যে, ইসরাঈলের কোন ধর্মীয় বৈধতা নেই। বরং, ইতিহাসের সবচেয়ে বড় প্রতারণার মাধ্যমে ইহুদীরা প্রতারিত হয়েছে, এবং তাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে কঠোরতম ঐশ্বরিক শাস্তি নেমে আসার উপযোগী ক্ষেত্র। কিন্তু 'বনী ইসরাঈলের' উপর চুড়ান্ত শাস্তি কার্যকর হওয়ার আগে, 'পবিত্রভূমি' তথা গোটা বিশ্বে এক বিশাল ক্রমবিকাশমান নাটকের আরো দৃশ্যাবলীর বাস্তবায়ন এখনো বাকী আছে। এই গ্রন্থে সেই বিকাশমান নাটকের খানিকটা বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

অবশ্যই এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, 'পবিত্রভূমির' ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ইসলামের যে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তার ব্যাখ্যা দেয়া। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ইসরাঈলের সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। গ্যালিলি হ্রদ খুব শীঘ্রই শুকিয়ে যাবে! ঈসা (আঃ) খুব শীঘ্রই ফিরে আসবেন। আর তার প্রত্যাবর্তনের সাথে, বিশ্ববাসী ইসরাঈল রাষ্ট্রেরও ধ্বংস অবলোকন করবে। (প্রথম সংযোজনে দেখুন গ্যালিলি হ্রদে বর্তমানে পানির গভীরতা সম্বন্ধে বার্তা সংস্থার রিপোর্ট। আরও দেখুন আমাদের গ্রন্থ, The Religion of Abraham and the State of Israel — A view from the Qur'an)।

মুসলিমদের কাছে যে সত্যটি রয়েছে, ইহুদীদের কাছেও তাই ছিল, কিন্তু তারা সেটিকে বিকৃত করেছে। কুর'আনের মাধ্যমে যে অবিকৃত সত্যটি নাযিল হয়েছে সেটিকে, এবং ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতার শেষ নবী হিসেবে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে গ্রহণ করার জন্য মদীনার ইহুদীরা (হিজরতের পরে) দীর্ঘ ও পর্যাপ্ত সময় পেয়েছিল — কিন্তু

তারা একগুঁয়েমিবশত তা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। তারপর তাদের সময় ফুরিয়ে গেল এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কিব্‌লা পরিবর্তন করে দিলেন (দেখুন কুর'আন, সুরা বাক্বারা, ২:১৪১-১৪৫)। সমষ্টিগতভাবে যে করুণ পরিণতি তাদের জন্য এখন অপেক্ষা করছে, তা এড়ানোর জন্য ততক্ষণে দেরী হয়ে গেছে। ইতিহাসের যে সব ঘটনা এখনো আত্মপ্রকাশ করেনি, সেগুলির মধ্যে অন্য যে কোন ঘটনার চেয়ে, জেরুজালেমের শেষ পরিণতি এবং ইসরাঈল রাষ্ট্রের ভাগ্যই ইসলামের দাবীকে প্রমাণিত করবে, যা সত্যধর্ম হিসাবে সবচেয়ে সুস্পষ্ট ও অবিকৃত।

[মদীনায়] দীর্ঘ ১৭ মাস যাবত রাসূল (সাঃ) জেরুজালেমকে ক্বিব্‌লা করে নামায পড়েছেন। উদ্দেশ্য ছিল ইহুদীদের একথা বুঝানো যে, যে স্রষ্টা মূসা (আঃ)-কে পাঠিয়েছেন ও তৌরাত নাজিল করেছেন, ঐ একই স্রষ্টা [আল্লাহ্] তাঁকেও পাঠিয়েছেন এবং কুর'আন নাযিল করেছেন। ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রভুর কাছ থেকে ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য ইহুদীদের সামনে একটি মাত্র রাস্তা বা দরজা তখনো খোলা ছিল। মুহাম্মদ (সাঃ)-কে নবী হিসাবে স্বীকার করাই ছিলেন সেই রাস্তা বা দরজা (দেখুন, কুর'আন, সুরা আ'রাফ ৭:১৫৭)। কিন্তু তারা একগুঁয়েমিবশত তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে মহাপাপ করেছিল। আর ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। [অর্থাৎ, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ আর রইল না।]

পবিত্র কুর'আনে জেরুজালেম — মুসলিমদের জন্য ইঙ্গিত

যে সকল মুসলমান এই গ্রন্থের শেষ পাতা পর্যন্ত পড়বেন, তাদের কাছে কি আশা করা যায়?

প্রথমত, মক্কা ও মদীনার মতই, জেরুজালেম যেন আমাদের কাছে প্রাণপ্রিয় হয় — আর 'পবিত্রভূমিকে' ধর্ম নিরপেক্ষ ইসরাঈল রাষ্ট্রের ঘৃণ্য দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত করার মুক্তি-সংগ্রাম যেন মুসলিমদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় সংগ্রাম বলে পরিগণিত হয়। একজন ইহুদী যদি যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ বা রাশিয়া থেকে গিয়ে ইসরাঈলী নিরাপত্তা বাহিনীতে যোগ দিতে পারে এবং 'পবিত্রভূমির' মুসলিম ও খৃস্টান জনগণের নিধন কার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে — তাহলে একজন মুসলিম, সে যেখানকার বাসিন্দাই হোক না কেন, তারও নিশ্চয় নিজ দেশ ছেড়ে, 'পবিত্রভূমির' নির্যাতিত মানুষের সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামে যোগ দেবার স্বাধীনতা এবং অধিকার রয়েছে। একজন মুসলিমের সেই অধিকার এবং স্বাধীনতাকে যদি অস্বীকার করা হয় এবং তাকে 'সন্ত্রাসবাদী' বলে গ্রেফতার করার হুমকি দেয়া হয়, তখন তার উচিত হবে ঐ হুমকিকে গ্রাহ্য না করা, এবং ঐ সংগ্রামে যোগ দিতে যা কিছু তাকে বাধা দেয়, সে সবের বিরোধিতা করা। তার উচিত আল্লাহ্‌র

জন্যে, [তীরে উঠে পিছনে] "তার নৌকা পুড়িয়ে ফেলা" এবং 'ধর্মহীন পৃথিবীকে' অমান্য করা। আজকের পৃথিবীতে, মুসলিমদের ঈমানের ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য বহিঃপ্রকাশ বোধ হয় এটুকু যে, তাদের হৃদয়ে 'পবিত্রভূমির' সশস্ত্র সংগ্রামে যোগ দেয়ার অন্তত আকাঙ্খা থাকতে হবে। এখানে মুসলিমদের সাবধান করে দেয়া প্রয়োজন যে, যখনই তারা তাদের এই বিশ্বাসকে জনসমক্ষে প্রকাশ করবে যে, ইসরাঈল রাষ্ট্র এক মুসলিম বাহিনীর হাতে ধ্বংস হবে, আর, তারা ঐ বাহিনীর সদস্য হতে চায় — তখন তারা স্বাভাবিকভাবেই হয়রানির শিকার হবে, এমনকি, তাদেরকে স্তব্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে ও অন্যদেরকে নিরুৎসাহ করার জন্য তাদেরকে গ্রেফতারও করা হতে পারে, অন্যদের জন্য উদাহরণ হিসেবে ব্যবহারের লক্ষ্যে। হয়রানি ও নির্যাতনের ঐ প্রক্রিয়া ইতোমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র ও পৃথিবীর আরো অনেক দেশেই শুরু হয়ে গেছে। ইসরাঈল যখন পৃথিবীর 'নিয়ন্তা রাষ্ট্রে' পরিণত হবে, তখন স্বাভাবিকভাবে এই নির্যাতন আরও বৃদ্ধি পাবে।

দ্বিতীয়ত মুসলিম বিশ্বের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সম্পদসমূহ প্রাথমিকভাবে "পবিত্রভূমিকে" নির্যাতন থেকে মুক্ত করার কাজে সাহায্য করার লক্ষ্যে নিয়োজিত করা উচিত। যদিও কাশ্মীর, কসোভো বা চেচ্নিয়ার সংগ্রামগুলিও আমাদের হৃদয়ের প্রিয় বিষয়, তবু 'পবিত্রভূমি'র সংগ্রামে সাফল্যের যে নিশ্চয়তা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে দেয়া হয়েছে, সেটা অন্যান্য ক্ষেত্রে দেয়া হয়নি। [তাই] তাদের সাথে 'পবিত্রভূমি'র তুলনা করা যায় না। আসলে, 'পবিত্রভূমিকে' মুক্ত করার সংগ্রামে সাফল্য, নির্যাতন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত মুসলিমদের অন্যান্য সকল সংগ্রামের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

তৃতীয়ত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে মুসলিমরা (নারী ও পুরুষ সবাই) জেরুজালেমের শেষ অধ্যায় সম্পর্কে কুর'আনের বাণী ও দিকনির্দেশনা ভালোভাবে অধ্যয়ন করবে এবং তারপর তা অন্যদেরকে শিক্ষা দেবে। এই গ্রন্থে, কুর'আনের ঐ সব ব্যাখ্যা ও দিকনির্দেশনা খুঁজে বের করার এবং প্রকাশ করার বিনীত প্রচেষ্টা চালান হয়েছে।

যায়োনিস্ট[১] ইহুদীদের কৌশল

দুর্নীতিগ্রস্ত, স্থায়ীভাবে ধনী, লুণ্ঠনজীবী ও ধর্ম-বিমুখ সম্ভ্রান্ত শ্রেণী, যারা এখন ইসরাঈলের চারপাশের আরব-মুসলিম সম্প্রদায়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের সাথে সুবিধাবাদী আঁতাত গড়ে তোলা যায়োনিস্টদের সার্বিক কৌশলের একটা দিক। ঐ সম্ভ্রান্ত

[১] যে পাহাড়ের উপর সোলায়মান (আঃ)-এর হায়কাল অর্থাৎ মাসজিদুল আকসা অবস্থিত তার নাম যায়ন। ইহুদীদেরকে নির্বাসন থেকে ফিলিস্তিনে ফিরিয়ে এনে ইসরাঈল রাষ্ট্র সৃষ্টি করার উদ্যোগে উনবিংশ শতাব্দির শেষ দিকে যায়োনিয্‌মের তৎপরতা শুরু হয়।

শ্রেণী তাদের নিজেদের [অবৈধ] ক্ষমতা, শাসন-নিয়ন্ত্রণ, সুবিধা, অগ্রাধিকার ও সম্পদকে আঁকড়ে ধরে রাখতে গিয়ে ইসরাঈলের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে বাধ্য হয়। ইহুদীরা ঐ সব উঁচু শ্রেণীর মানুষের উপর সাধারণ মুসলিমদের নির্যাতন করার জন্য এমনভাবে সার্বক্ষণিক চাপ দিতে থাকে যেন তারা ইসরাঈলের আনুগত্য মেনে নিতে বাধ্য হয়। সেকারণে তাদের লোক দেখান ইসরাঈল-বিরোধিতা ইহুদীদের জন্য কোন হুমকি হিসাবে গণ্য হয় না। ইসরাঈল যখন 'পবিত্রভূমিতে' মুসলিমদের উপর তার নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, আর তার ফলশ্রুতিতে যখন আরব-মুসলিম জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, তখন টিকে থাকার প্রয়োজনে ঐ উচ্চশ্রেণীর শাসকবর্গ ইসরাঈলের বিরুদ্ধে ক্রোধের অভিনয় করতে বাধ্য হয়। এই ইহুদী-আরব (শাসকশ্রেণীর) কৌশল আজ চূড়ান্তভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার মাঝে রয়েছে শয়তানী, কূটবুদ্ধি আর সুবিধাবাদ। আর এটা এমন এক জনসমষ্টির কৌশল, যারা ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মের নীতিভিত্তিক সারসত্তকে পরিত্যাগ করেছে। কৌশলগত দিক দিয়ে ইহুদীরা একদিন ঐসব আরব শাসক শ্রেণীকে পরিত্যাগ করবে যাদের সাথে তারা আজ সুবিধাবাদের ভিত্তিতে আঁতাত করেছে। আরব শাসক শ্রেণীকে পরিত্যাগ করার কৌশলও অবশ্য ইতোমধ্যেই গৃহীত হয়েছে। এমনকি আমরা যখন [এই গ্রন্থ] লিখে চলেছি, সে সময়ও ইসরাঈল আরব-মুসলিমদের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে, যে যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে ইহুদী রাষ্ট্রটির পরিধি প্রসারিত হবে। তখন পৃথিবীর 'নিয়ন্তা রাষ্ট্র' হিসাবে (যুক্তরাষ্ট্রের স্থলাভিষিক্ত হয়ে) ইসরাঈল এই সমগ্র অঞ্চলের [মধ্যপ্রাচ্য] উপর শাসন করবে।

এ ধরনের সকল ইহুদী কৌশল, যা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে এবং মুমিনদেরকে অবজ্ঞা করতে চায় এবং নিয়তির বিধানকে বদলে ফেলতে চায়। সেই সকল কৌশলের প্রতি কুর'আন ভয়ঙ্কর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছে:

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّـهُ ۖ وَاللَّـهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿٥٤﴾

"আর তারা (ইহুদীরা) চক্রান্ত করেছে, এবং আল্লাহ্ও কৌশল অবলম্বন করেছেন; বস্তুত আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্বোত্তম কৌশলী।"

(কুর'আন, সুরা আলে 'ইমরান ৩:৫৪)

'পবিত্রভূমিতে' ঐ শয়তানসুলভ কৌশল বাস্তবায়ন করার লক্ষ্য নিয়েই ইসরাঈল ইয়াসির আরাফাত এবং তার ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী দল PLO-কে শান্তির জন্য নিজের সহযাত্রী হিসেবে বেছে নিয়েছে। ঐ কৌশল মিশর, জর্ডান, তুরস্ক এবং সৌদী আরবের বেলায় কাজ করেছে, যারা সবাই হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদার রাষ্ট্র। কিন্তু ঐ কৌশল 'পবিত্রভূমিতে' সফল হয়নি। সিরিয়া বা ইয়েমেনেও তা সফল হয় নি।

এই গ্রন্থের পাঠকবর্গ হয়ত এখানে, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর একটা প্রার্থনা সম্বন্ধে ভেবে দেখতে চাইবেন, যিনি প্রার্থনা করেছিলেন এভাবে:

"ইব্নে ওমর (রাঃ)-র বর্ণনায়: হে আল্লাহ্! আমাদের শাম (সিরিয়া) ও আমাদের ইয়েমেনের উপর তোমার রহমত নাজিল কর। লোকেরা বলল: আর আমাদের নাজ্দ (সৌদী আরবের ঐ অংশ যেখান থেকে বর্তমান সৌদী শাসকদের উৎপত্তি)। নবী (সাঃ) আবার বললেন: হে আল্লাহ্! আমাদের শাম ও ইয়েমেনের ওপর তোমার রহমত বর্ষণ কর। তারা আবার বলল: আর আমাদের নাজ্দের ওপরও [তোমার রহমত বর্ষণ কর]। এ সময় নবী (সাঃ) বললেন: সেখানে ভূমিকম্প ও দুর্ভোগ দেখা দেবে এবং সেখান (নাজ্দ) থেকে শয়তানের মাথার পার্শ্বদেশ বেরিয়ে আসবে।"

(সহীহ্, বুখারী)

ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈল তার অস্তিত্বের ৫০ বর্ষপূর্তি করেছে। কিন্তু "প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে" এটা ইহুদীদের তেমন কোন বিজয় নয়, যদিও তারা আমাদেরকে তাই বুঝাতে চাইবে। মূলত ধর্ম-বিমুখ যায়োনিস্টদের এই আন্দোলন, 'বনী ইসরাঈলকে' পর্বতপ্রমাণ মিথ্যা দ্বারা প্রতারিত করেছে। তেমনিভাবে তাদের একটা মিথ্যা শ্লোগান ছিল: "*ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর জন্য জনহীন ভূমি*"। ঐ ভূমিতে যদি জনমানুষ নাই থেকে থাকে, তবে আমরা কি জিজ্ঞেস করতে পারি: এখন তাহলে কারা 'পাথর' ছুঁড়ছে?

আরবরা যদি 'জনগোষ্ঠী' না হয়ে কেবল 'ঘাসফড়িং'-এর দলই হয় — যেমন প্রাক্তন ইসরাঈলী প্রধানমন্ত্রী শামীর একবার ঘোষণা করেছিলেন — তাহলেও তারা কি ২০০০ বছর ধরে ইহুদীদেরকে নিজেদের মাঝে বসবাস করতে দেয়নি? ইহুদীরা যে ২০০০ বছরেরও বেশী তাদের মাঝে আরব ভূমিতে বসবাস করেছে, তখন কি আরবরা তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা বিধান করে নি? আরবরা এসব করেছে, এবং তাদের জন্যে তার চেয়েও বেশী কিছু করেছে এমন সময়, যখন বাকী পৃথিবী ইহুদীদের জন্যে নিজ নিজ দরজা বন্ধ করে রেখেছিল, অথবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদেরকে নিম্নমানের বস্তিতে থাকার অনুমতি দিয়েছিল। আরবরা তা করেনি এজন্য যে, তাদের মাঝে ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মের 'অবশিষ্ট' কিছু রয়ে গিয়েছিল, যা ইসমা'ঈল(আঃ)-এর মাধ্যমে তাদের কাছে এসেছিল। সত্যের ঐ অবশিষ্টাংশ তাদেরকে আতিথেয়তা শিখিয়েছিল। আজও আরবদের সেই আতিথেয়তা টিকে আছে। ইব্রাহীম (আঃ)-এর সেই একই ধর্ম, ইহুদীদেরকে অতিথিপরায়ণ 'ঘাসফড়িং'-দের প্রতি কৃতজ্ঞ হতে শেখানোর কথা ছিল।

যায়োনিজ্ম যুক্তি দেখায় যে, ইহুদীধর্মের অন্তর্নিহিত 'সত্য', ইহুদী জনগোষ্ঠীকে 'পবিত্রভূমির' উপর একচ্ছত্র, অনন্তকাল, স্থায়ী এবং নিঃশর্ত অধিকার দান করেছে। প্রায় ২০০০ বছর আগে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যে ইহুদী রাষ্ট্র ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, তার পুনঃপ্রতিষ্ঠাই সাক্ষ্য দেয় যে, ইহুদী ধর্ম সত্যের যে সাম্রাজ্যবাদী

সংস্করণের দাবী করে সেটাই সঠিক। যায়োনিস্টরা এমন যুক্তি প্রদর্শন করে। সর্বোপরি তৌরাত তো বলেছেই, "প্রতিটি জায়গা, যার উপর তোমাদের পদচিহ্ন রয়েছে, তাই তোমাদের হবে" (তৌরাত, দ্বিতীয় বিবরণ (Deuteronomy) ১১:২৪)।

ইসরাঈলের জন্মের পর গত ৫০ বছর ধরে, পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখেছে যে, ক্রমাগতভাবে সম্প্রসারণশীল ইসরাঈলে কিভাবে ইহুদীরা দাপট দেখিয়ে চলেছে। ঐ সম্প্রসারণ এখনো বন্ধ হয় নি। আপাত দৃষ্টিতে যদিও মনে হবে যে, ইসরাঈল চারিদিক থেকে অবরুদ্ধ এবং সে তার শক্তি সুসংহত করছে কেবল আরবদের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য। কিন্তু এই গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হচ্ছে, তখনকার 'বাস্তবতা' এই যে, (জেনিন শরণার্থী শিবির ধ্বংস করে দেয়ার পর এবং আরো বহু আরবকে জবাই করার পর) ইসরাঈল এক বিশাল যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে চলেছে, যার মাধ্যমে তার সীমান্ত নাটকীয়ভাবে প্রসারিত হয়ে 'বাইবেলীয় পবিত্রভূমিকে' ঐ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করবে — অর্থাৎ "মিশরের নদী থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত"। এর অন্তর্নিহিত অর্থ এই যে, একদিকে সুয়েজ খালের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং অপরদিকে ইরানী তেল সম্পদের সম্ভাব্য ব্যতিক্রম ছাড়া, সমগ্র উপসাগরীয় তেল সম্পদের উপর ইসরাঈলের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ — যে তেল সম্পদের উপর ইউরোপ, জাপান এবং পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই নির্ভরশীল। ঐ যুদ্ধের পরিকল্পনা অত্যন্ত যত্ন সহকারে তৈরী করা হবে, যেন তার মাধ্যমে ইসরাঈল পৃথিবীর 'নিয়ন্তা রাষ্ট্র' হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রকে স্থানচ্যুত করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

আর তাই বাইবেলের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে মনে হবে, ইসরাঈল রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ইহুদীদের সাফল্য, পবিত্র নগরী জেরুজালেমের উপর ইহুদী নিয়ন্ত্রণ, এবং ইসরাঈল রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ, ইহুদী ধর্মের সত্যতার দাবীকেই প্রমাণিত করেছে।

আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে: 'মসীহ্' ছাড়া এটা সম্ভব হল কিভাবে? এর উত্তর হচ্ছে যে, এক ভণ্ড 'মসীহ্' অর্থাৎ *আল-মাসীহ্ আদ্-দাজ্জালের* প্রতারণার মাধ্যমে এটা সম্ভব হয়েছে!

এ ছাড়া, বাইবেলীয় ইসরাঈল প্রতিষ্ঠায় আপাত সাফল্যের মধ্যে নিহিত আরেকটি অর্থকে এড়ানো যায় না, আর তা হলো ইহুদীদের সেই দাবী যে ঈসা (আঃ) এবং মুহাম্মদ (সাঃ) উভয়েই ভণ্ড ছিলেন। *না'উযুবিল্লাহ্*।

কিন্তু, ইসরাঈল-রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে গিয়ে ইহুদী ধর্মকে সদ্য বিকশিত, মূলত ধর্ম-বিমুখ এবং ক্ষয়িষ্ণু, আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার সাথে 'গাঁটছড়া' বাঁধতে হয়েছে। পৃথিবীর মঞ্চে ঐ স্রষ্টা-বিমুখ পশ্চিমা জগত "*মানবকুলের উপর সকল উচ্চভূমি থেকে নেমে এসে*" এবং "*চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে*" (কুর'আন, সুরা আম্বিয়া ২১:৯৬) জলে,

স্থলে ও অন্তরীক্ষে তাদের একক কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নতুবা, ইহুদী রাষ্ট্রটি ঐ সর্বশক্তি সম্পন্ন অথচ নাস্তিক ও ক্ষয়িষ্ণু পশ্চিমের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া গত ৫০ বছর টিকে থাকতে পারত না। আসলে ঐ [পশ্চিমা] সভ্যতা 'ইয়াজুজ' ও 'মাজুজ' কর্তৃক সৃষ্ট ও লালিত সভ্যতা।

যে সকল ইহুদীরা ইসরাঈল রাষ্ট্রকে বাইবেলীয় ইসরাঈলের পুনঃপ্রতিষ্ঠা মনে করে সমর্থন করেন, তারা সেই রাষ্ট্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অথচ অভাগা ফিলিস্তিনী জনগণের উপর যে অবিচার এবং অত্যাচার করা হয়েছে সেদিকে নজর দিতে তারা সুবিধাজনকভাবে ভুলে যান। *ইহুদীদের* 'পবিত্রভূমি' সেখানকার খৃস্টান এবং মুসলিম জনগণের আপন নিবাস ছিল, এটাই ছিল তাদের একমাত্র অপরাধ। সেই অবিচার ও অত্যাচার ৫০ বছর ধরে ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে। ইহুদীদের কাছে আমাদের প্রশ্ন: সত্যের দাবী কি কখনই নাস্তিকতা, [নৈতিক] অবক্ষয়, অবিচার, বর্ণবাদ এবং নির্যাতনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে? একটা জাতি, ধর্ম-বিমুখতার ট্রেনের সাথে নিজেদের বগী সংযুক্ত করার পরও কেমনে ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতার প্রতি অনুগত রয়েছে বলে দাবী করতে পারে?

ইহুদীরা যুক্তি দেখিয়েছে যে, তারা ফিলিস্তিনীদেরকে ঘরছাড়া করেনি, বরং ফিলিস্তিনীরা নিজেরাই ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে। বেশ, তাহলে ইহুদীরা তাদের ঘরবাড়িকে পবিত্র আমানত ভেবে যত্ন সহকারে সুরক্ষা করেনি কেন, এবং কেন তাদেরকে ঘরে ফিরে আসার আমন্ত্রণ জানায়নি? তার পরিবর্তে ইহুদীরা ৫০টি দীর্ঘ ও দুর্ভোগপূর্ণ বছর ধরে তাদের [ফিলিস্তিনীদের] নিজ গৃহে 'প্রত্যাবর্তনের অধিকারকে' কঠোরভাবে অস্বীকার করেছে। আরো অবাক হবার ব্যাপার এই যে তারা এখন মনে করে: ইসরাঈল এবং ফিলিস্তিনী খৃস্টান তথা মুসলিমরা, কোন যুদ্ধ ছাড়া, 'পবিত্রভূমিতে' একই পরিসর ভাগাভাগি করে বসবাস করতে বাস্তবসম্মতভাবে একমত হবার জন্য 'সম্ভবত' আরো ৫০টি কঠিন বছর অতিক্রান্ত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এটাতো *পরলোকে কল্পিত সুখ* ছাড়া আর কিছুই না। এর সাথে দ্রুত বিকাশমান ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার কোন সম্পর্কই নেই। ইসরাঈলের জঘন্য নির্যাতন প্রতিদিনই তীব্রতর হয়ে চলেছে। অতিশীঘ্রই ইসরাঈল তার মিথ্যা বিজয় ও অহঙ্কারের শীর্ষে পৌঁছাবে, যখন সে পৃথিবীর 'নিয়ন্তা রাষ্ট্রে' পরিণত হবে। যা হোক, এই গ্রন্থে ঘোষণা করা হয়েছে যে, পৃথিবী এখন ভণ্ড ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের ধ্বংসের সূচনা দেখছে। নিজেদের বর্তমান অবস্থার জন্য, ইহুদীদের যায়োনিজ্‌মকে দোষারোপ করা উচিত নয়। যায়োনিজ্‌ম শুধু এটুকুই করেছে, যে বাইবেলে ঢোকানো প্রতিটি মিথ্যার সাথে আরও পর্বতপ্রমাণ মিথ্যা মিশিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগিয়েছে।

কুর'আনে নাম ধরে 'জেরুজালেমকে' উল্লেখ করা হয়নি

The Los Angeles Times নামক খবরের কাগজে Daniel Pipes এর লেখা ২০০০ সালের ২১শে জুলাই সংখ্যায় "Jerusalem means more to Jews than to Muslims" প্রবন্ধের খানিকটা প্রতিক্রিয়া হিসেবেই এই গ্রন্থখানা অর্থাৎ *'পবিত্র কুর'আনে জেরুজালেম'* লেখা হয়েছে। এই প্রবন্ধে তিনি চেষ্টা করেছেন, জেরুজালেমের উপর যে কোন ধরনের ইসলামি দাবীকে প্রত্যাখ্যান করতে; আর সেই প্রচেষ্টায় অন্যান্য ব্যাপারের সাথে তিনি যে প্রসঙ্গটা বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন তা হচ্ছে: "কুর'আনে বা প্রার্থনাগুলির মধ্যে কোথাও একবারো এর [জেরুজালেমের] উল্লেখ নেই।" Dr. Pipes তার প্রবন্ধ প্রকাশ করার পর, এমন অনেক কলামিস্ট ও ভাষ্যকার যারা 'পবিত্রভূমির' রাজনীতির উপর লিখে থাকেন, পাঠকদের ঐ একই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি দ্বারা প্লাবিত করেছেন। Dr. Pipes এবং মিডিয়ায় তার মুখপাত্ররা, যারা আমাদেরকে এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে প্ররোচিত করেছেন, যদি কখনো এই গ্রন্থটি পড়েন তবে হয়ত তাদের মতামত সংশোধন করতে চাইবেন।

ইসলাম ও কুর'আনকে যারা বরাবরই চ্যালেঞ্জ করেন, বিশেষত তাদের পরিচালিত নতুন ক্রুসেডের অংশ হিসেবে ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের পক্ষ অবলম্বন করেন, সেই সব বৈরী ভাবাপন্ন সমালোচকদের মোকাবেলা করতে একজন মুসলমান দায়বদ্ধ। সঠিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে [একজন মুসলমানের] সব সময়ই কুর'আনে যে সত্য রয়েছে, তার শরণাপন্ন হওয়া উচিত। কুর'আন ঘোষণা করেছে যে মিথ্যার বিরুদ্ধে যখন সত্যকে ছুঁড়ে দেয়া হয়, তখন সত্য সবসময়ই মিথ্যাকে পদানত করবে। আর মুমিনদেরকে আদেশ করা হয়েছে, অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ সংগ্রামে কুর'আনকে ব্যবহার করতে।

কুর'আনের শিক্ষা ও ভবিষ্যদ্‌বাণী তথা রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বাণীতে জেরুজালেমের শেষ অধ্যায় সম্বন্ধে যেসব তথ্য রয়েছে, সেটা যে সত্য, তা Daniel Pipes বা তার সমগোত্রীয়দের বুঝানোর চেষ্টা করাটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং, আমাদের উদ্দেশ্য, কুর'আন এবং হাদীস থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টাকে [পাঠকের জন্য] উপস্থাপন করা এবং তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা। Dr. Pipes-এর কাছে *'পবিত্র কুর'আনে জেরুজালেম'* [গ্রন্থখানি] গ্রহণযোগ্য হোক বা না হোক, এটা পরিস্কার যে, ইসরাঈল ও ইসলামের সমস্যা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা লাভ করা, এবং এবিষয়ে জ্ঞান লাভ করার প্রয়োজনটা মৌলিক। আর সেটাই হচ্ছে এই গ্রন্থের গুরুত্বের প্রাথমিক কারণ।

জেরুজালেম – আজকের জগতকে বুঝতে পারার চাবিকাঠি

জেরুজালেমে দ্রুত ও ক্রমবিকাশমান ভয়ঙ্কর নাটক সম্বন্ধে যে সব মুসলিম তাদের মতামত ব্যক্ত করতে চান বা তাদের কর্মপন্থা স্থির করতে চান, তাদের কাছে এই বিষয়টি যে বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ, তা ইতোমধ্যে পরিস্কার হয়ে যাবার কথা। লন্ডনের Muslim Institute for Research and Planning এর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি মরহুম কলিম সিদ্দিকী, সেই ১৯৭৪ সালে এই লেখককে ঠিক এই গ্রন্থখানিই বের করার তাগিদ দিয়েছিলেন, যে গ্রন্থ ব্যাখ্যা করবে যে আজকের পৃথিবীর ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে বুঝার ব্যাপারে জেরুজালেমই আসল চাবিকাঠি। আল্‌হামদুলিল্লাহ্, ২৭ বছর পরে ঐ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই গ্রন্থ থেকে যে কুর'আনিক দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে উঠে, তা পরিস্কার ভাবে এই বিষয়টিকে নিশ্চিত করে যে, আজকের জেরুজালেমের বাস্তবতাকে অনুধাবন করতে না পারলে, কারো পক্ষে সত্যিকার অর্থে আধুনিক পৃথিবীর রহস্যাবলীকে বুঝা সম্ভব নয়!

আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা চায় যে আমরা এমন ইসলামকে গ্রহণ করি, যা অন্য অনেক কিছুর সাথে ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈলকে মেনে নেবে এবং তার সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার পথও প্রশস্ত করবে। এখানেই এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে বুঝার মূলসূত্র নিহিত রয়েছে যা এ যুগের আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর উপর প্রভাব ফেলছে। পশ্চিমের ঐ কৌশলগত লক্ষ্যের ব্যাপারে কুর'আন ও হাদীসের উপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামি প্রতিক্রিয়া কি হবে তা এই গ্রন্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে এটাও বলা হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সত্যিকার অনুসারীদের এবং ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের মাঝে ভবিষ্যতে কখনই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না, এবং তাঁর সত্যিকার অনুসারীরা শেষ পর্যন্ত অত্যাচারী ইসরাঈলের উপর বিজয়ী হবে এবং 'পবিত্রভূমিকে' ইসরাঈলের নির্যাতন থেকে মুক্ত করবে। অপরপক্ষে, ঐ সকল মুসলিম যারা ইসলামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং ইসলামের নাস্তিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের শিবিরে যোগ দেয়, তারা ইসরাঈলকে মেনে নেবার এবং ঐ ইহুদী রাষ্ট্রের শাসনে নিজেদের ন্যস্ত করার একটা উপায় শেষ পর্যন্ত খুঁজে বের করবে।

সাধারণভাবে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, এবং বিশেষভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চ-শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে, কোথাও ফলপ্রদভাবে ইসলাম ধর্ম শেখানোর কোন প্রচেষ্টা দেখা যায় না। যাহোক, এটা স্পষ্ট যে, ইসলামি শিক্ষা আত্মস্থ করতে হলে, কুর'আনিক ভিত্তির উপর শিশুর বা ছাত্রের মনকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আজকের ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে, কুর'আনে লিপিবদ্ধ যে সব বিষয়াবলী পড়ান উচিত, তার মাঝে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে '*পবিত্র কুর'আনে জেরুজালেম*'। ধর্ম-

বিমুখ পৃথিবী সমকালীন আক্রমণের মাধ্যমে ইসরাঈলকে মেনে নেয়ার জন্য এবং মুসলিমদের [ধর্ম] বিশ্বাসকে সংশোধন করার উদ্দেশ্যে তাদের উপর যে চাপ প্রয়োগ করে চলেছে, *'পবিত্র কুর'আনে জেরুজালেম'-এর* মাধ্যমেই মুসলমানেরা এ সবের সফল মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে। (ইসমা'ঈল রাজী ফারুকির গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেখুন)। ঐ লক্ষ্য সামনে রেখেই, বিশেষ করে মুসলিম শিক্ষকদের, জেরুজালেম ও তার শেষ অধ্যায় সম্বন্ধে কুর'আনের দিক নির্দেশনা সম্বন্ধে অবহিত করার এক বিনীত প্রচেষ্টা হাতে নিয়েই এই গ্রন্থটি লেখা হয়েছে। *'পবিত্র কুর'আনে জেরুজালেম'* — এই বিষয়ের উপর, মুসলিম শিক্ষকবৃন্দ এবং ইসলামি স্কুলগুলি একটা 'নিরপেক্ষ' অবস্থান গ্রহণ করবে, তা হতে দেয়া উচিত নয়।

ইহুদীগোষ্ঠী, খৃস্টানগোষ্ঠী এবং *'পবিত্র কুর'আনে জেরুজালেম'*

সবশেষে, *'পবিত্র কুর'আনে জেরুজালেম'*-এর বিষয়টি যদিও মুসলিমদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ, তবুও [এই গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে] আমরা পবিত্র কুর'আনের মাধ্যমে ইহুদী ও খৃস্টানদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী ছিলাম। সময় বয়ে যাওয়ার সাথে সাথে যখন শেষ মুহূর্তটিও কাছে এগিয়ে আসছে, ইহুদী ও খৃস্টান পণ্ডিতদের জন্য ব্যাপারটি কঠিন হয়ে পড়ছে। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু তথা ইয়াজুজ-মাজুজ, 'ভণ্ড-মসীহ্', এবং ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে কুর'আন ও হাদীসের যে বক্তব্য সেটাকে বুঝতে পারা, এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা, তাদের জন্য ক্রমশই কঠিন হয়ে পড়েছে। অপর দিকে কুর'আনে বর্ণিত সত্যের নিশ্চিত প্রমাণের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

এই বিষয়টিকে ইহুদী ও খৃস্টানদের সামনে উপস্থাপন করার দায়িত্ব মুসলিমদের, আর এই গ্রন্থে আমরা সে দায়িত্ব পালন করেছি। কুর'আন ও বাইবেলীয় ভবিষ্যত বাণীসমূহের ভিতর যে মিল এবং অমিল রয়েছে, একজন পাঠক বা পাঠিকা যদি সে ব্যাপারে নিজেই খুঁটিয়ে দেখতে চান তবে, এই গ্রন্থের সম্পূরক হিসেবে, শায়খ সফর আল্ হাওয়ালীর The Day of Wrath — Is the Intifada of Rajab only the Beginning? গ্রন্থখানি সে ব্যাপারে তার সহায়তা করবে।

এই গ্রন্থে দুই ধরনের ইহুদী জনগণের ভিতর পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। আদি পিতা ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধর বনী ইসরাঈল ইহুদীগণ, এরা হচ্ছে 'সেমেটিক' জনগোষ্ঠী, বর্ণগত দিক থেকে যাদের সাথে আরবদের স্পষ্ট মিল রয়েছে। অপর পক্ষ হচ্ছে নীল চোখ ও সোনালী চুলের ইউরোপীয় ইহুদী জনগোষ্ঠী, যারা অতীতে কোন এক সময় ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু এরা ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধর নয়। আল্লাহ্ই

সঠিক জানেন, তবে এই গ্রন্থের লেখক মনে করেন যে, 'ইয়াজুজ-মাজুজ' ইউরোপীয় ইহুদীদের ভিতর কোথাও রয়েছে। এবং এই 'ইয়াজুজ-মাজুজ'-ই ইউরোপীয় খৃস্টান সভ্যতাকে ওলট-পালট করে দিয়েছে এবং তাকে বর্তমানের নাস্তিক সভ্যতায় রূপান্তরিত করেছে। 'ইয়াজুজ-মাজুজ' 'যায়োনিস্ট' আন্দোলনের সূচনা করেছে এবং [বর্তমান] ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১০ম অধ্যায়ে, ইসলামে 'ইয়াজুজ-মাজুজের' বিষয়টিকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের আগামী গ্রন্থ, Surah al-Kahf and the Modern Age-এ আমরা এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করব, ইনশা আল্লাহ্।

এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এই গ্রন্থখানি পশ্চিমা, খৃস্টান, ইহুদী এমনকি কিছু মুসলিম পাঠকের কাছেও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে মর্মঘাতী হতে পারে। কিন্তু আমরা এটা পরিস্কার ভাবে বলতে চাই যে, কাউকে অপমান করার জন্য আমরা এই গ্রন্থটি লিখি নি। মানুষ যখন "আপাত দৃষ্টিতে যা মনে হয়" তার উপর ভিত্তি করে কোন কিছুর বিচার করে, তখন তা আজকের পৃথিবীর "অন্তর্নিহিত বাস্তবতা" — যা কুর'আনের মাধ্যমে অনুধাবন করা সম্ভব — তা থেকে বেশ ভিন্নতর হয়। যারা দুই চোখে, অর্থাৎ অন্তরের দৃষ্টি ও বাহ্যিক দৃষ্টি দিয়ে দেখেন, আর যারা কেবল এক চোখে দেখেন [যাদের অন্তর্দৃষ্টি অন্ধ], অনুধাবন করার ক্ষেত্রে তাদের দু'দলের মাঝে আকাশ পাতাল তফাৎ দেখা যায়। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এ ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, দাজ্জাল এক চোখে অন্ধ, *"কিন্তু তোমার প্রভু এক চোখা নন!"* তিনি সতর্ক করতে গিয়ে একথাও বলেছেন যে ভণ্ড 'মসীহ্' দাজ্জালের যুগ হবে এমন একটা যুগ, যখন আপাত দৃষ্টিতে যা মনে হবে এবং যা বাস্তব বা সত্য, এই দু'টি একে অপরের তুলনায় একেবারে ভিন্ন হবে। যারা বিশ্বস্ততার সাথে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অনুসরণ করেন, তারা ছাড়া [পৃথিবীর] এই শেষ যুগে, আর কেউ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে ও সত্যকে ভেদ করতে সক্ষম নন।

ব্যাখ্যা ও বর্ণনা

আমরা অনেক ক্ষেত্রে (কুর'আনের) বক্তব্যকে নিজেরাই ব্যাখ্যা করেছি, যেখানে দেখা গেছে যে, সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ বা তার রাসূল (সাঃ) প্রত্যক্ষভাবে ঐ বক্তব্যের কোন ব্যাখ্যা দেন নি। আমাদের বিষয়ের সাথে কুর'আনের বক্তব্যের সম্পর্ক নির্ধারণ করতে গিয়ে আমরা তা করেছি। সেটা করতে গিয়ে আমরা ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের ঢালাওভাবে প্রত্যাখ্যানের শিকার হয়েছি, যারা কেবল সরাসরি ও আক্ষরিক অর্থ ছাড়া পবিত্র গ্রন্থের আর কোন ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন না। আবার এমন কিছু লোক আছেন যারা নিজেদের ব্যাখ্যা ছাড়া, বাকী সবই প্রত্যাখ্যান করেন। কুর'আনে যেখানে 'পবিত্র ভূমিতে'

ইহুদীদের প্রত্যাবর্তনের বর্ণনা রয়েছে, আমরা তাদেরকে তার ব্যাখ্যা দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, যারা আমাদের ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করেন।

দ্বিতীয়ত আমরা যখনই কুর'আনের বক্তব্যের ব্যাখ্যা করেছি, তখনই 'আল্লাহ্ই সবচেয়ে ভালো জানেন (আল্লাহু আ'লম)' এই অবকাশটুকু রেখেই ব্যাখ্যা করেছি। কুর'আনের চিরায়ত তফসীরকারকগণ সব সময়েই ঐ অবকাশ রাখতেন, এবং বর্তমান লেখকও তাই করেছেন।

জেরুজালেম এবং *"সত্য"* সম্পর্কে কুর'আনের দাবী

পৃথিবীর সার্বিক অবস্থাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতা কর্তৃক নাযিলকৃত বাণীর শরণাপন্ন হওয়াটা, আজকের এই ধর্মবিবর্জিত-জ্ঞানের যুগে, সেকেলে ব্যাপার মনে হতে পারে। অথচ, আধুনিক বিশ্বে যখন ইসরাঈল রাষ্ট্রের জন্ম ঘটে, তখন তারা এটাই করেছিল। ইসরাঈল রাষ্ট্রকে (সম্রাট-নবী দাউদ (আঃ) সর্বপ্রথমে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন) পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে, অর্থাৎ 'পবিত্রভূমি' দখল করে নেয়ার 'ঈশ্বর প্রদত্ত' অধিকারকে যুক্তিযুক্ত করতে গিয়ে, ইউরোপীয় যায়োনিজ্ম তৌরাতকে ব্যবহার করেছিল। ইসরাঈলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, David Ben Gurion বেশ খোলাখুলিভাবেই বলেছিলেন: "ইসরাঈলের ভূমির জন্য, বাইবেল হচ্ছে আমাদের দলিল।"

অতএব, [উপরোক্ত মন্তব্যের পাশাপাশি] কেবলমাত্র কুর'আন থেকে সংগৃহীত তথ্য উপস্থাপনা ব্যবহার, অর্থাৎ [বর্তমান] ইহুদী ইসরাঈলের উৎপত্তির ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করাটা সম্পূর্ণভাবে যুক্তিযুক্ত বলতে হবে। আমাদের এই অধিকারটুকু কারো অস্বীকার করা উচিত নয়, তা যে কারো জন্য যত অসুবিধাজনকই হোক না কেন। অনেকের ক্ষেত্রে এই উপস্থাপনার সাথে পরিচয় হয়ত তাদের জীবনে প্রথম। ইতিহাসের এই শেষ যুগে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া যখন নতুন নতুন বিষয়াদি প্রকাশিত করছে, আর কুর'আন যখন উত্তরোত্তর বর্তমান পৃথিবীকে এবং আজকের জেরুজালেমকে নির্ভূলভাবে ব্যাখ্যা করার সামর্থকে আরো বেশী করে প্রদর্শন করছে, তখন এই ঘটনাগুলি কুর'আনের সত্যতার দাবীকেই প্রমাণিত করবে। অতএব, সব কিছু ছাড়িয়ে এই গ্রন্থে, কুর'আনের সত্যতার দাবীকে উপস্থাপন করা হয়েছে। আর ঠিক এই ব্যাপারে কুর'আন নিজেই ঘোষণা করেছে এমন একটি সুরায় যার নামই রাখা হয়েছে আল্-ফুস্সিলাত (যা পরিস্কারভাবে বলে দেয়া হলো):

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ

أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾
أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ ۗ
أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴿٥٤﴾

"এখন আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী (এবং যা তার মাধ্যমে প্রকাশিত হবে) প্রদর্শন করব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের অন্তরে, ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এই কুর'আন সত্য।

"আপনার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষ্যদাতা, এটা কি যথেষ্ট নয়?

"শুনে রাখ, তারা তাদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে (যার মধ্যে তাদের জন্য নির্ধারিত পরিণতিও অন্তর্ভুক্ত) সন্দেহে পতিত রয়েছে।

"শুনে রাখ, তিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।"

(কুর'আন, সুরা ফুস্‌সিলাত ৪১:৫৩-৫৪)

জেরুজালেম নগরী, যা মুসলিম, খৃস্টান ও ইহুদীদের কাছে পবিত্র, ইতিহাসের সমাপ্তিতে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে [আল্লাহ্ কর্তৃক] নির্ধারিত। ইসলাম, খৃস্টধর্ম ও ইহুদীধর্ম সবাই এব্যাপারে একমত। যারা আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির আশীর্বাদপুষ্ট (অর্থাৎ যারা বাইরের চোখ এবং অন্তরের চোখ দু'টো দিয়েই দেখতে সক্ষম), তাদের কাছে এমন অনেক আলামত থেকেই এ ব্যাপারটা স্পষ্টত ধরা পড়ে যে আমরা এখন শেষ যুগে বসবাস করছি — অর্থাৎ সেই সময় যখন ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটবে। এই শেষ যুগ কতদিনের? কখন সেই সমাপ্তি ঘটবে? ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতা, আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান ছাড়া আর কেউ তা জানে না।

জেরুজালেম যেহেতু ইতোমধ্যেই তার শেষ 'ভূমিকা' পালন করতে শুরু করেছে, সেহেতু এটাই সেই সময় যখন এই বিষয়ের উপর কুর'আনের বক্তব্যকে বার বার উপস্থাপন করাটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থে জেরুজালেমের ঐ 'ভূমিকা'কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'ইতিহাসের সমাপ্তিতে' জেরুজালেমের 'ভূমিকা'কে যথাসম্ভব আধ্যাত্মিক অন্তর্জ্ঞানলব্ধ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা উচিত, কেননা ঐ 'ভূমিকা' প্রধানত এভাবেই সনাক্ত করা সম্ভব।

অবশ্যই আমাদের এই লেখা সাধারণ পাঠকের উদ্দেশ্যে। কুর'আন ও হাদীসে জেরুজালেম ও পবিত্রভূমির শেষ অধ্যায় সম্বন্ধে যে বক্তব্য রয়েছে, তার সাথে পরিচিত হওয়াটা তাদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ জেরুজালেমের শেষ অধ্যায়ের ব্যাপারে সকল পক্ষই দাবী করে যে কেবলমাত্র তাদের ঘোষিত 'সত্য'ই প্রমাণিত হবে, আর বাকী সকলের দাবী ভিত্তিহীন।

আরেকটু ভেঙ্গে বলতে গেলে এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, ইহুদীরা জেরুজালেমের এমন একটা পরিণতিতে বিশ্বাস করে, যাতে মসীহ্-র আগমনী প্রত্যক্ষ করা যাবে। যখন মসীহ্ আসবেন তখন তিনি ইহুদীধর্মের স্বর্ণযুগের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন এবং জেরুজালেম থেকে গোটা পৃথিবীকে শাসন করবেন। এভাবেই 'সত্য' সম্বন্ধে ইহুদীদের দাবী বাস্তব বলে প্রমাণিত হবে, এবং অন্যদের দাবী মিথ্যা প্রতীয়মান হবে। খৃস্টানদেরও রয়েছে একই ধরনের বিশ্বাস। যখন 'মসীহ্', অর্থাৎ যীশু খৃস্ট প্রত্যাবর্তন করবেন, তখন তিনি জেরুজালেম থেকে গোটা বিশ্বকে শাসন করবেন এবং খৃস্টধর্মের মূলতত্ত্ব অর্থাৎ ত্রিত্ববাদ [Trinity], অবতার ও প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি তত্ত্বগুলিকে সত্য বলে প্রমাণ করবেন। খৃস্টানরা যে তাদের ধর্মকে 'সত্য' বলে দাবী করে, তা এভাবে সত্যায়িত হবে এবং বাকী সবার দাবী মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে। মুসলিমরাও বিশ্বাস করে যে, জেরুজালেমের এমন একটা পরিণতি নির্ধারিত রয়েছে যা 'সত্য' সম্বন্ধে ইসলামের দাবীকে প্রমাণিত করবে এবং বর্তমান খৃস্টান ও ইহুদীদের দাবী মিথ্যা প্রতীয়মান হবে। 'সত্য' সম্বন্ধে এই তিনটি ধারণা, যার সবকটিই ইব্রাহীম (আঃ) থেকে আগত বলে দাবী করা হয়। এদের মাঝে এমন এক গভীর মতপার্থক্য রয়েছে যে, এদের সবকটি একই সাথে সঠিক হবার সম্ভাবনা নেই।

এই গ্রন্থে মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠবে। সেটা এরকম যে, 'আসল মসীহ্' ঈসা (আঃ) একদিন পৃথিবীর জীবনে ফিরে আসবেন, জেরুজালেমে যাবেন এবং *হাকিমুন 'আদিল* বা একজন সুবিচারকারী শাসক হিসেবে পৃথিবীতে শাসন করবেন; *"তিনি বিয়ে করবেন, সন্তান লাভ করবেন এবং মৃত্যুবরণ করবেন"*। *"মুসলিমরা তাঁর জানাযা পড়বে এবং তাঁকে মদীনায় রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পাশে সমাহিত করা হবে"* – অর্থাৎ আরব দেশে যেখানে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) শায়িত রয়েছেন। প্রত্যাবর্তনের পরে "ঈসা (আঃ) ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন" এবং ক্রুশের ধর্ম খৃস্টধর্মের সেখানেই সমাপ্তি ঘটবে এবং *"তিনি শূকরগুলিকে হত্যা করবেন"*:

"আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত: আল্লাহ্ রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যার হাতে আমার প্রাণ, তার নামের শপথ, মরিয়মের পুত্র শীঘ্রই তোমাদের মাঝে আবির্ভূত হবেন একজন সুবিচারকারী শাসক হিসেবে, তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন এবং শূকরগুলিকে হত্যা করবেন এবং জিযিয়া কর (মুসলিম রাজ্যে বসবাসরত ইহুদী ও খৃস্টানদের উপর আরোপিত এক ধরনের 'কর') বিলুপ্ত করবেন। তখন অর্থের প্রাচূর্য বিরাজ করবে এবং কেউ দান গ্রহণ করবে না।" — (সহীহ্ বুখারী)

'শূকরগুলি' কথাটি শব্দগত অর্থে ব্যাখ্যা করা যাবে না, কারণ, সেরকম একটা ব্যাখ্যা উল্লেখিত প্রসঙ্গে যথাযথ হবে না। বরং 'শূকর' শব্দের ব্যবহার আল্লাহ্র তরফ থেকে প্রবল ক্রোধের ইঙ্গিতবহ। এই গ্রন্থে প্রশ্ন করা হচ্ছে: মসীহ্র প্রত্যাবর্তনের

পর তিনি যে সব শূকরগুলিকে হত্যা করবেন, তারা কারা? কাদের উপর মসীহ্ [আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিফলন স্বরূপ] এমন ক্রোধ পোষণ করবেন [যে তাদেরকে তিনি গণহারে হত্যা করবেন]? কারা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল [অবশ্য, মুসলিমদের বিশ্বাস মতে তারা তা করতে সক্ষম হয়নি]?

চলমান সময়ের যে পর্বে ঈসা মসীহ্ (আঃ) প্রত্যাবর্তন করবেন, সে ব্যাপারে মুসলিমদের কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে। সে সময়টা হচ্ছে যখন গ্যালিলি হ্রদের পানি প্রায় বা সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে যাবে:

"...ঠিক এই সময়টাতেই আল্লাহ্ মরিয়েমের পুত্র ঈসা (আঃ)-কে প্রেরণ করবেন। দামেশ্কের পূর্ব দিকে সাদা মিনারে তিনি অবতরণ করবেন। তাঁর পরণে দু'টুকরো কাপড়ে তৈরী পরিচ্ছদ থাকবে যা কিনা হালকা জাফরান রঙে রঞ্জিত হবে, আর তিনি দু'জন ফেরেশতার ডানায় ভর দিয়ে নামবেন। তিনি যখন মাথা ঝুঁকাবেন, তখন তাঁর মাথা থেকে স্বেদবিন্দু ঝরে পড়বে, আর তিনি যখন মাথা উঠাবেন তখন তাঁর মাথা থেকে মুক্তার মত স্বেদবিন্দু ঝরে পড়বে। তাঁর দেহের গন্ধ পাওয়া প্রতিটি অবিশ্বাসী মৃত্যুবরণ করবে এবং তাঁর নিঃশ্বাস, যতদূর তাঁর দৃষ্টি পৌঁছাবে, ততদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে। তিনি তখন তার (অর্থাৎ দাজ্জালের) খোঁজ করবেন, যতক্ষণ না তিনি তাকে শেষ পর্যন্ত লুদ-এর সিংহদ্বারে বন্দী করবেন এবং হত্যা করবেন। আল্লাহ্ যাদের সুরক্ষা করেছেন, এমন এক জনগোষ্ঠী তখন মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ)-এর কাছে আসবে, তিনি তাদের মুখ মুছে দেবেন এবং বেহেশ্তে তাদের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করবেন। এরকম এক অবস্থায় আল্লাহ্ ঈসা (আঃ)-এর কাছে ওহী পাঠাবেন: 'আমার দাসদের মাঝ থেকে আমি এমন একটা দল তৈরী করেছি যাদের সাথে যুদ্ধ করে কেউ জয়ী হতে পারবে না, তুমি (তোমার সঙ্গিদের) নিরাপদে তূর পাহাড়ের উপর নিয়ে যাও', আর তখন আল্লাহ্ 'ইয়াজুজ' ও 'মাজুজ'কে পাঠাবেন এবং তারা প্রতিটি উঁচু স্থান থেকে দলে দলে নেমে আসবে। তাদের প্রথম জন টাইবেরিয়াস হ্রদের পাশ দিয়ে যাবার সময় সেখান থেকে পানি পান করবে। আর, তাদের শেষজন যখন সেই স্থান অতিক্রম করবে, সে বলবে এখানে একদা পানি ছিল...।"

(সহীহ্ মুসলিম)

গ্যালিলি হ্রদে (যার অপর নাম টাইবিরিয়াস হ্রদ,[১] আরেক নাম কিনেরেট হ্রদ) আজ ইতিহাসের যে কোন সময়ের তুলনায় সব চেয়ে কম পানি রয়েছে, আর সেই পানিটুকুও ক্রমশই কমে আসছে, কারণ ইসরাঈলের ইউরো-ইহুদী সরকার, প্রকৃতি সেখানে যে হারে পানি যোগান দিতে পারে, তার চেয়ে বেশী হারে পানি খরচ করছে। যখন সেখানে পানি শুকিয়ে যাবে এবং যখন পানযোগ্য পানি আর থাকবে না, ইহুদীরা তখন আরবদের, 'পবিত্রভূমিতে' ইহুদী শাসনের বশীভূত করার ব্যাপারে তাদের দীর্ঘ

[১] আরবীতে বুহায়রা আত্-তাবারিয়্যাহ্।

মেয়াদী কৌশলের চূড়ান্ত পর্বে উপনীত হবে। এই বশীভূত হবার নিহিতার্থ হবে, সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্‌র উপাসনা না করে, বরং ভণ্ড-মসীহ্‌র উপাসনা করা। ইসরাঈল যে লবণাক্ততা দূরীকরণ প্রকল্পসমূহ তৈরী করবে (নোনা পানি থেকে পানীয় জল তৈরী করার জন্য), সেখান থেকে খাবার পানি সংগ্রহ করতে গিয়ে আরবদেরকে সেই বশ্যতা প্রদর্শন করতে হবে। কিন্তু তারা এমনই দরিদ্র হবে যে ঐ পানি কিনে খাবার মত সঙ্গতি তাদের থাকবে না।

এই গ্রন্থে এটা পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, ইহুদীরা তাদের চূড়ান্ত ধ্বংসের আর কত সময় বাকী রয়েছে তা জানতে চাইলে, কেবল গ্যালিলি হ্রদের পানির গভীরতা পর্যবেক্ষণ করাই তাদের জন্য যথেষ্ট। তাদের কৌশল মতে, যে মুহূর্তটি তাদের চূড়ান্ত বিজয় নিশ্চিত করবে ভেবে তারা অপেক্ষায় রয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই আসল মসীহ্‌র প্রত্যাবর্তন ঘটবে এবং আল্লাহ্‌ ইহুদীদের পরিপূর্ণ রূপে ধ্বংস করবেন। (গ্যালিলি হ্রদের পানির বর্তমান গভীরতার বিষয়টি প্রথম সংযোজনে দেখুন)।

এই গ্রন্থের কাঠামো

এই গ্রন্থ শুরু হয়েছে, সঙ্গত কারণেই, কুর'আনে বর্ণিত 'সেই শহরটি' অর্থাৎ জেরুজালেমের রহস্য দিয়ে। কুর'আনে এই বিষয়ের রহস্যময় বর্ণনার কারণ বুঝিবা এই যে, 'শেষ যুগে' জেরুজালেম শহরের একটা কেন্দ্রীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পূর্ব-নির্ধারিত হয়ে রয়েছে; ইসলাম এমনই ধারণা দিয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে 'পবিত্রভূমি' সম্বন্ধে কুর'আনের বক্তব্যের মাধ্যমে বিষয়টিকে দেখা হয়েছে।

চতূর্থ অধ্যায়ে কুর'আনের এই ঘোষণার বর্ণনা রয়েছে, যাতে বলা হয়েছে যে, একসময় ইহুদীদেরকে পবিত্রভূমি ঠিকই দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তার পরে আরো বর্ণনার মাধ্যমে কুর'আন আমাদের অবহিত করেছে যে, বার বার পবিত্রভূমিতে ইহুদীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, অথবা তাদের সেখান থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। খৃস্টানরা যখন স্বল্প সময়ের জন্য জেরুজালেম শহর ও 'পবিত্রভূমি' জয় করেছিল, তখন তাদেরও ঐ একই ভাগ্য বরণ করতে হয়েছে।

এই পথ ধরে আমরা গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে প্রবেশ করব, যেখানে পবিত্রভূমির উত্তরাধিকারের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ কর্তৃক আরোপিত শর্ত সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, যে শর্তসমূহ ইহুদীরা বার বার লঙ্ঘন করেছে। শেষ লঙ্ঘন ঘটে যখন তারা মসীহ্‌ হিসাবে ঈসা (আঃ)-কে প্রত্যাখ্যান করে, এবং কিভাবে তারা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করেছে তা নিয়ে

বড়াই করতে শুরু করে। তখন তাদেরকে পুনরায় 'পবিত্রভূমি' থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং আর ততদিন ঐ ভূমিতে নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে ফিরে আসা থেকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়, যতদিন না 'ইয়াজুজ-মাজুজ' তাদের প্রত্যাবর্তনকে সম্ভব করে না দেয়।

আল্লাহ্ কর্তৃক আরোপিত শর্ত লঙ্ঘন করায়, 'পবিত্রভূমি' থেকে 'বনী ইসরাঈল'-এর ঐশ্বরিক বহিষ্কারের যে বর্ণনা কুর'আনে দেয়া আছে, ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা তার আলোচনা করেছি। 'পবিত্রভূমি'র উত্তরাধিকারের ব্যাপারে ইহুদীরা যেহেতু আল্লাহ্র আরোপিত শর্ত সমূহ এখনো লঙ্ঘন করে চলেছে, সুতরাং যুক্তিযুক্ত ভাবেই আরো একবার যে আল্লাহ্ হস্তক্ষেপ করবেন এবং তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। কুর'আনের এই অবস্থান প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে।

প্রথম খণ্ডের চতূর্থ অধ্যায়ে 'পবিত্রভূমির' উত্তরাধিকারের যে সব ঐশ্বরিক শর্তের কথা বলা হয়েছে, ধর্ম-বিমুখ রাজনৈতিক কাঠামো এবং ধর্ম-বিমুখ বা ধর্মনিরপেক্ষ অর্থনীতির মাধ্যমে, ইসরাঈল রাষ্ট্র যে ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মের স্পষ্ট বিরোধিতা করছে এবং সেহেতু, ঐ সব শর্তও লঙ্ঘন করছে, এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে যথার্থ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এই দু'টো অধ্যায়কে দ্বিতীয় খণ্ডে স্থান দেয়া হয়েছে যেন পাঠক কোন অযথা বিলম্ব ছাড়াই গ্রন্থের বিকাশমান ঘটনার সাথে তাল রেখে এগিয়ে যেতে পারেন।

জেরুজালেম থেকে মক্কার দিকে 'কিব্লা' পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে সপ্তম অধ্যায়ে। এই পরিবর্তন কোনভাবেই, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উম্মতকে ভণ্ড ইসরাঈল রাষ্ট্রটি ধ্বংস করার আল্লাহ্ নির্ধারিত কর্তব্য পালনে বাধা দেয় না।

সপ্তম অধ্যায়ের পর, গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের বাকী অংশকে, জেরুজালেমের শেষ অধ্যায় সম্বন্ধে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচনের কাজে একান্তভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যখন শেষ যুগ সমাসন্ন এবং ইহুদীদের জন্য আল্লাহ্র করুণা প্রার্থনার সময় চলে গেছে, তখন আল্লাহ্ নিজেই ইহুদীদেরকে 'পবিত্রভূমিতে' ফিরিয়ে আনবেন, যেন তারা সকল শাস্তির চেয়ে কঠিনতম শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। এই ব্যাপারে কুর'আনের ঘোষণাও এই অংশে পাওয়া যাবে। এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কল্পে তিনি (আল্লাহ্) ঐ সমস্ত সত্তা সৃষ্টি করেছেন, যারা ইহুদীদের উপর সবচেয়ে নিকৃষ্টতম শাস্তি চাপিয়ে দেবে (শেষ দিবস পর্যন্ত যা অব্যাহত থাকবে)। আল্লাহ্ তা'আলা দাজ্জাল, ইয়াজুজ-মাজুজ এবং দা'আব্বাতুল আর্দ-কে (বা ভূপৃষ্টের দানবকে) ঐ শাস্তি আরোপ করার জন্য সৃষ্টি করেছেন।

চূড়ান্ত পর্বের সূচনা ঘটবে তখন, যখন ঈসা (আঃ) ফিরে আসবেন এবং 'দাজ্জালকে' হত্যা করবেন, আর আল্লাহ্ 'ইয়াজুজ-মাজুজ'কে ধ্বংস করে দেবেন। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, যে ঐ সময় খোরাসান থেকে (যে অঞ্চলের কেন্দ্রবিন্দুতে আফগানিস্তান অবস্থিত) এক মুসলিম বাহিনী এগিয়ে আসবে এবং কেউ তাদেরকে জেরুজালেম পৌঁছান থেকে রোধ করতে পারবে না। এভাবে 'পবিত্রভূমি' মুক্ত হবে এবং 'পবিত্রভূমি'র নিয়ন্ত্রণ ইব্রাহীম (আঃ)-এর সত্যিকার ধর্মের হাতে পুনরায় ন্যস্ত হবে।

'আসল' মসীহ্ ঈসা (আঃ) তখন জেরুজালেম থেকে গোটা পৃথিবীর উপর শাসন করবেন, ঠিক যেমন ইহুদীরা বিশ্বাস করে থাকে। কিন্তু ঐ ভবিষ্যতবাণীর বাস্তবায়নে তাদের কোন লাভ হবে না, কারণ 'ভণ্ড-মসীহ্' দাজ্জাল তাদেরকে ইতোমধ্যেই প্রতারিত করেছে। এই প্রতারণা বা ধোঁকার ফলস্বরূপই তারা তার উপর আস্থাশীল ছিল, তারা আসল মসীহ্ ঈসা (আঃ)-এর পরিবর্তে তাকে, অর্থাৎ 'ভণ্ড-মসীহ্'কে অনুসরণ করেছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জেরুজালেমের রহস্য, কুর'আনের 'সেই শহরটি'

وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٩٥﴾
حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴿٩٦﴾

"এবং যে শহরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তার অধিবাসীদের সেখানে ফিরে না আসা অবধারিত;

"যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজকে বন্ধনমুক্ত করে দেয়া হবে, এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে (অথবা সব দিকে ছড়িয়ে পড়বে)।"

(কুর'আন, সুরা আম্বিয়া ২১:৯৫-৯৬)

(এই ঘটনার পর ইয়াজুজ-মাজুজ পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবে এবং *ইয়াজুজ-মাজুজের বিশ্ব ব্যবস্থা* অনুযায়ী পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব করবে)।

কম করে বললেও ব্যাপারটি আজব, রহস্যময় এবং একটি ধাঁধাঁর মত মনে হয় যে, পবিত্র কুর'আনে 'জেরুজালেম' (আরবিতে কুদ্‌স বা বায়তুল মোকাদ্দাস) শহরটির নাম একটি বারও উল্লেখ করা হয়নি! অথচ, কুর'আনে উল্লেখিত কত নবীর সাথে ঐ 'পবিত্র শহরের' সম্পর্ক রয়েছে; আর এই শহরেই, মক্কা ও মদীনায় আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) কর্তৃক নির্মিত আল্লাহ্‌র গৃহসমূহ ছাড়া, আরেক নবীর হাতে নির্মিত আল্লাহ্‌র অপর গৃহখানি রয়েছে। আসলে আল্লাহ্‌র ঐ গৃহখানি (মসজিদ আল্-আকসা) কুর'আনে কেবল উল্লেখিত হয়েছে তাই নয়, তারই সাথে উল্লেখ করা হয়েছে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর রাত্রিকালীন সেই অলৌকিক যাত্রার কথা, যে যাত্রায় তাঁকে মক্কা থেকে জেরুজালেমে অবস্থিত আল্লাহ্‌র ঐ গৃহখানিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এ বিষয়টি সম্পর্কে এমন রহস্য অবলম্বন করার পেছনে কারণ হয়তবা ইসলামের এই দৃষ্টিভঙ্গিতে নিহিত, যাতে মনে হয় যে, শেষ যুগে জেরুজালেম একটা কেন্দ্রীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য নির্ধারিত। সেকারণে আল্লাহ্ হয়ত ঐ শহরের নাম এবং পরিণতিকে একটা পবিত্র মেঘের আড়ালে আচ্ছন্ন রেখেছেন, যে মেঘের আবরণ উপযুক্ত সময় না আসা পর্যন্ত সরানো হবে না। অর্থাৎ, ইতিহাসের সমাপ্তিতে নিজ ভূমিকা পালন করার জন্য জেরুজালেমের প্রস্তুতি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সেই আড়াল সরানো হবে না।

জেরুজালেমের শেষ অধ্যায় সম্পর্কে ইসলামি সাহিত্যে প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি সম্বন্ধে ড. ইসমা'ঈল রাজী আল্-ফারুকি দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন: "দুর্ভাগ্যবশত বিষয়টির উপর কোন ইসলামি সাহিত্য নেই।" আসল ব্যাপারটি এই যে, মেঘের আবরণ প্রত্যাহার করার সময় না আসা পর্যন্ত, কেউ এই বিষয়ের উপর লিখতে পারত না। এই গ্রন্থখানি এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে যে, ঐ [রহস্যের] মেঘের আবরণ এখন সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

ইহুদীরা যখন ঈসা (আঃ)-কে প্রত্যাখ্যান করল এবং পরবর্তীতে এই বলে গর্ব করল যে, তারা তাঁকে হত্যা করেছে (দেখুন কুর'আন, সুরা নিসা ৪:১৫৭), তখনো তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্র আগমনী হচ্ছে ভবিষ্যতের একটি ঘটনা (যার সাথে সাথে ইহুদী ধর্মের সোনালী যুগের প্রত্যাবর্তন ঘটবে)। তারা বিশ্বাস করত যে, অন্যান্য অনেক কিছুর সাথে, স্বর্ণযুগের প্রত্যাবর্তনের জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলো পূরণ হতে হবে:

- Gentiles বা অ-ইহুদীদের নিয়ন্ত্রণ থেকে 'পবিত্রভূমি' মুক্ত হতে হবে।
- নির্বাসিত ইহুদীরা তাদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পবিত্রভূমিতে ফিরে আসবে।
- ইসরাঈল রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।
- ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতার (ইহুদী নিয়মে) উপাসনার জন্য, বিশেষ উপাসনালয়টি পুনরুদ্ধার করা হবে।
- হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আঃ)-এর যুগের মত, আবারো, ইসরাঈল সমগ্র পৃথিবীর জন্য 'নিয়ন্তা রাষ্ট্রে' পরিণত হবে।
- ইসরাঈলের শাসক হিসেবে, দাউদ (আঃ)-এর সিংহাসন থেকে, অর্থাৎ জেরুজালেম থেকে, একজন ইহুদী রাজা সমগ্র পৃথিবীর উপর শাসন করবেন; আর সেই রাজাই হবেন প্রতিশ্রুত মসীহ্।
- আর সেই শাসন হবে চিরস্থায়ী।

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) ঘোষণা করেছেন যে ক্বিয়ামতের একটি প্রধান আলামত হবে এই যে, আল্লাহ্ ইহুদীদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য এমন একজনকে তৈরী করবেন এবং ইহুদীদের কাছে পাঠাবেন, যে নিজেকে 'মসীহ্' হিসেবে প্রতীয়মান করবে এবং তাদেরকে বিশ্বাস করাবে যে কথিত "স্বর্ণযুগ" ফিরে আসছে। কিন্তু আসলে ঐ 'ভণ্ড-মসীহ্', ধোঁকা দিয়ে তাদেরকে আল্লাহ্র কঠিনতম শাস্তির পথে পরিচালিত করবে। সেই 'ভণ্ড-মসীহ্' বা দাজ্জালকে, (খৃস্টানদের কাছে যার পরিচয় হচ্ছে Anti-Christ বা 'খৃস্ট-শত্রু'), সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন, এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 'শেষ যুগে' তাকে পৃথিবীতে ছেড়ে দেয়া হবে। এখন নীচের বিষয়গুলো ভেবে দেখুন:

- ব্রিটিশ সেনাপতি অ্যালেনবি (Gen. Allenby) ১৯১৭ সালে যখন তুর্কী মুসলিমদের কাছ থেকে জেরুজালেম দখল করে নেন, তখনই (ইহুদী বিশ্বাস মতে) মুসলিম 'gentile' বা অ-ইহুদীদের কাছ থেকে 'পবিত্রভূমি' মুক্ত হয়।
- আল্লাহ্ নির্ধারিত ২০০০ বছরের নির্বাসনের পর [আদি] ইসরাঈলী ইহুদীগণ, 'পবিত্রভূমির' উপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সেখানে 'প্রত্যাবর্তন' করেছে। ১৪০০ বছর আগে কুর'আন যেমন বলেছিল যে 'সময়ের শেষ অধ্যায়ে' এমনটি হবে, ব্যাপারটা ঠিক তেমনি ঘটেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য স্থানে বসবাসরত ককেশীয় ইহুদীদেরও সেখানে পৌঁছানটা নিয়তিরই লেখা।
- ১৯৪৮ সালে ইসরাঈল "পুনরুদ্ধার" করা হয়েছিল আর সেটাকে প্রাচীন ইসরাঈল রাষ্ট্র বলে তারা দাবী করে।
- এই ইসরাঈল পারমাণবিক ও তাপ-পারমাণবিক মারণাস্ত্র দ্বারা যুদ্ধসাজে সজ্জিত। মনে হচ্ছে ফিলিস্তিনী 'ইনতিফাদা' (যা এ্যরিয়েল শ্যারন কর্তৃক উস্কানীর মাধ্যমে ইচ্ছাকৃত ভাবে সৃষ্ট) এবং ১১ই সেপ্টেম্বরে মোসাদ কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ — এই দুই ঘটনার অজুহাতে ইসরাঈল এমন এক যুদ্ধে যাওয়ার নিয়তি বরণ করতে যাচ্ছে, যে যুদ্ধের এক পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, জাতিসংঘ এবং বাকী গোটা বিশ্বকে **অবজ্ঞা** করে, ইসরাঈল নিজ প্রতিবেশের গোটা অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবে। ঐ যুদ্ধে, তৌরাতে প্রতিশ্রুত এলাকা অনুযায়ী ইসরাঈলী ভূখণ্ডের সম্প্রসারণ ঘটবে বলেই মনে হয়, অর্থাৎ মিশরের নদী থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত। **যুক্তরাষ্ট্রসহ গোটা পৃথিবীকে অবজ্ঞা করার কার্যে সাফল্য এবং মার্কিন ডলার তথা মার্কিন অর্থনীতির ধ্বস্ সম্পর্কিত ভবিষ্যতবাণীর বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে**, ইউরো-ইসরাঈল অবশেষে, ব্রিটিশদের উপর তার প্রাথমিক নির্ভরশীলতা এবং তৎপরবর্তী পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্রের উপর তার নির্ভরশীলতা থেকে বেরিয়ে আসবে। অবশেষে ইউরো-ইহুদী রাষ্ট্রটি পৃথিবীর সামরিক ও অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের স্থলাভিষিক্ত হবে, আর সেই সুবাদে, গোটা পৃথিবীর নেতৃত্বের দাবীসহ এমনভাবে পৃথিবীর উপর তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে, যা ব্রিটেন বা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে কখনো করা সম্ভব হয়নি।
- এরপরেই, ভবিষ্যত বাণী মোতাবেক, আল্-আক্সা মসজিদের ধ্বংস-সাধন ও সেই স্থলে ইহুদী উপাসনালয় প্রতিষ্ঠার কাজটি সমাধা হবে। "মসীহ্, বিধাতার জন্য একখানা গৃহ নির্মাণ করবেন" (বাইবেলের পুরাতন নিয়ম, ১ খান্দাননামা ১৭:১১-১৫) — নবী নাথনের এই ভবিষ্যদ্বাণী, বর্তমান মসজিদের ধ্বংস সাধনের ইঙ্গিত বহন করে।

[উপরে আলোচিত] প্রতিটি বিষয় থেকে ইহুদীদের কাছে অবশ্যই মনে হবে যে, হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর জেরুজালেম থেকে পৃথিবী শাসন করার স্বর্ণযুগ ফিরে

আসার ভবিষ্যদ্‌বাণী বুঝিবা বাস্তবতা লাভ করতে চলেছে। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, ভণ্ড-মসীহ্ 'দাজ্জালের' হস্তক্ষেপ ছাড়া উপরের কোন ঘটনাই বাস্তবায়িত হবার উপায় নেই। সুতরাং উপরে বর্ণিত সকল ঘটনাবলীই আসলে এক ধরনের ধোঁকা। উপরোক্ত ঘটনাবলী ঘটে যাওয়ার পরও বলতে হবে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর গড়ে তোলা পবিত্র ইসরাঈল রাষ্ট্র তখনো সত্যিকার অর্থে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং আসল ইসরাঈলের জায়গায় এক ভণ্ড-ইসরাঈল আজ অবস্থান গ্রহণ করেছে। এই লেখকের কাছে এটা স্পষ্ট যে, ঐ [রহস্যের] মেঘের আবরণ সরে গেছে এবং 'শেষ সময়' সমাসন্ন; আর, ইহুদীদের জন্য [অবধারিত ধ্বংস থেকে] ফিরে আসার উপায় নেই। সেজন্যই সম্ভবত, এখনকার এই সময়ে এই গ্রন্থটি লেখা সম্ভব হয়েছে। উপরে উল্লেখিত সবকিছুরই ব্যাখ্যা কুর'আনে রয়েছে। তবে সেই ব্যাখ্যা অনায়াসে সনাক্ত করা যায় না। এর অনেক কিছুই আমাদের গ্রন্থ, The Religion of Abraham and the State of Israel — A View from the Qur'an-এ ব্যাক্ত করা হয়েছে।

নাম ব্যবহার না করে কুর'আন বার বার জেরুজালেমকে একটি 'নগরী' বা 'শহর' বলে অভিহিত করেছে। 'শেষ যুগে' জেরুজালেমের ভূমিকার উপর, আল্লাহ্‌র তরফ থেকে যে রহস্যের মেঘের আবরণ ছড়িয়ে রাখা হয়েছিল, এটা যেন তারই অংশ। উদাহরণ স্বরূপ, কুর'আনে ঐ ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে যখন তাদের নবী মূসা (আঃ)-কে, আল্লাহ্ তলব করেছিলেন এবং তিনি সিনাইয়ের চূড়ায় গিয়েছিলেন, আর ইত্যবসরে ইহুদীরা সোনার তৈরী বাছুরের পূজা করতে শুরু করে। পবিত্র কুর'আনে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর ঐ ধরনের উপাসনা হলো 'শির্ক', যার পরিণতি হচ্ছে আল্লাহর শাস্তি :

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ
وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٢﴾
وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا
إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥٣﴾

"অবশ্য যারা ঐ (সোনার) বাছুরকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে (অতএব শির্ক করেছে) তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পার্থিব এ জীবনেই গযব ও লাঞ্ছনা এসে পড়বে।

"যারা (আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে) মিথ্যা আবিষ্কার করে, এভাবেই আমরা তাদের শাস্তি দিয়ে থাকি।

"আর যারা মন্দ কাজ করে, তারপরে তওবা করে নেয় এবং ঈমান নিয়ে আসে,

"তবে নিশ্চয় (তারা দেখবে যে) তোমার প্রতিপালক তওবার পর অবশ্য ক্ষমাকারী, করুণাময়।"

(কুর'আন, সুরা আ'রাফ ৭:১৫২-১৫৩)

এরপর কুর'আন ঘটনার বর্ণনাকে অব্যাহত রাখে — 'পবিত্রভূমি'তে প্রবেশের অনুমতি লাভের আগে, ইসরাঈলিরা তখনও সিনাই মরুভূমিতে অবস্থান করছে — সেই সময় সম্পর্কে কুর'আন ঘোষণা করে:

وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ۚ
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ
فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ
قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۚ
وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ۖ
كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۚ
وَمَا ظَلَمُونَا وَلَـٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦٠﴾

"আর আমি তাদেরকে ১২টি গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছি,

"এবং নির্দেশ দিয়েছি মূসাকে, যখন তার কাছে তার সম্প্রদায় পানি চাইল যে, স্বীয় যষ্টির দ্বারা আঘাত কর এ পাথরের উপর।

"অতঃপর এর ভেতর থেকে ফুটে বের হল বারটি প্রস্রবণ।

"প্রতিটি গোত্র চিনে নিল নিজ নিজ ঘাঁটি। আর আমি তাদের উপর মেঘের ছায়া দান করলাম, এবং তাদের জন্য অবতীর্ণ করলাম মান্না ও সাল্ওয়া

"(এবং বললাম): 'আমি তোমাদের জন্য যে উত্তম আহার্য দান করেছি, সেখান থেকে আহার কর'।

"(কিন্তু তারা বিদ্রোহ করল): তারা আমার কোন ক্ষতি করেনি, বরং নিজেদের আত্মারই ক্ষতি করল।"

(কুর'আন, সুরা আ'রাফ ৭:১৬০)

এর পরেই কুর'আন জেরুজালেমকে, রহস্যজনকভাবে শুধুমাত্র একটি 'শহর' বলে অভিহিত করে:

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَـٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ
وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ ۚ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦١﴾

"আর যখন তাদের প্রতি নির্দেশ হল যে, তোমরা এ নগরীতে (অর্থাৎ জেরুজালেমে) বসবাস কর এবং তোমাদের যেমন ইচ্ছা আহার কর, কিন্তু বিনয় সহকারে কথাবার্তা বল

"এবং প্রণত অবস্থায় দরজা দিয়ে প্রবেশ কর; আমি তোমাদের দোষ ত্রুটি ক্ষমা করে দেব; অবশ্য আমি সৎকর্মীদেরকে অতিরিক্ত দান করব।"

(কুর'আন, সুরা আ'রাফ ৭:১৬১)

কুর'আনের নিম্নলিখিত অধ্যায়ে সতর্কবাণী সহকারে, আরো রহস্যজনকভাবে জেরুজালেমকে কেবল একটি 'শহর' বলে আবারও উল্লেখ করা হয়েছে:

وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٩٥﴾

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴿٩٦﴾

"এবং যে শহরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তার অধিবাসীদের ফিরে না আসা অবধারিত;

"যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজকে বন্ধনমুক্ত করে দেয়া হবে, এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে (অথবা সব দিকে ছড়িয়ে পড়বে)।"

(কুর'আন, সুরা আম্বিয়া ২১:৯৫-৯৬)

যখন তারা সকল উঁচু জায়গা থেকে [সমতল ভূমিতে] নেমে আসে, অথবা, সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে, কার্যত তারা তখন পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে এবং 'ইয়াজুজ-মাজুজের' বিশ্ব ব্যবস্থা (World Order) মোতাবেক পৃথিবীর উপর শাসন করে।

উপরে উল্লেখিত 'শহরটির' পরিচিতি নির্ধারণ করতে গিয়ে আমরা, কুর'আন এবং হাদিসে 'ইয়াজুজ-মাজুজ' সংক্রান্ত যত প্রসঙ্গ রয়েছে, তার সবকটি পরীক্ষা করে দেখেছি। আমরা কেবল একটি মাত্র শহরকেই 'ইয়াজুজ-মাজুজের' সাথে সম্পৃক্ত বলে সনাক্ত করেছি — সেটা হচ্ছে জেরুজালেম (দশম অধ্যায় দেখুন)। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, কুর'আনের উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত 'শহরটি' হচ্ছে জেরুজালেম!

যখন আমরা জেরুজালেমকে ঐ 'শহরটি' বলে সনাক্ত করতে পারি, তখন এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কুর'আনে জেরুজালেমের উপর যে রহস্যের মেঘ দেখা যায়, তা তখনই সরিয়ে নেয়া হবে যখন 'ইয়াজুজ-মাজুজ'কে মুক্তি দেয়া হবে এবং তার পরিণতিতে তারা প্রতিটি উঁচু স্থান থেকে নেমে আসবে অথবা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে (অর্থাৎ 'ইয়াজুজ-মাজুজের' বিশ্ব-ব্যবস্থায়, পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবে)। বর্তমান সময়ে পবিত্রভূমিতে ইসরাঈলী ইহুদীদের প্রত্যাবর্তন এটা নিশ্চিত করেছে যে 'ইয়াজুজ-মাজুজ'কে ইতোমধ্যেই মুক্তি দেয়া হয়েছে, এবং তারা ইতোমধ্যেই 'প্রতিটি উঁচু স্থান

থেকে নেমে এসেছে, অথবা, সবদিকে ছড়িয়ে পড়েছে,' এবং সেহেতু এটা বলা ভুল হবে না, যে তারা ইতোমধ্যেই পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেছে। যে বিশ্বব্যবস্থায় পৃথিবী আজ শাসিত হচ্ছে, তা হচ্ছে 'ইয়াজুজ-মাজুজের' বিশ্ব বিন্যাস বা বিশ্ব-ব্যবস্থা। আর অবশ্যই, 'ইয়াজুজ-মাজুজ'ই 'পবিত্রভূমিতে' ইহুদীদের প্রত্যাবর্তনকে সম্ভব করে দিয়েছে।

এখন আমাদের জন্য এই ব্যাপক পরিকল্পনা অনুধাবন করা সম্ভব, যার আওতায় 'ভণ্ড-মসীহ্' দাজ্জাল ইহুদীদেরকে এই ব্যাপারে আশ্বস্ত করতে থাকবে যে, সে তাদের সোনালী যুগ ফিরিয়ে দিচ্ছে। ঐ মহাপরিকল্পনার সূচনা মনে হয় তখনই হয়েছিল, যখন 'দাজ্জাল' (সহীহ্ মুসলিমে তামীম দারী-র হাদীস দেখুন) ব্রিটেন থেকে বেরিয়ে তার যাত্রা শুরু করেছিল, ইউরোপীয় সভ্যতাকে একটা খৃস্টধর্ম-উত্তর সভ্যতা ও নিশ্চিতভাবে ধর্ম-বিমুখ সভ্যতায় রূপান্তরিত করার জন্য, এবং সেই সভ্যতাকে তাদের খুশী মত ক্ষমতাশালী করে তোলার জন্য। [যুল-কারনাইনও এমনই এক যাত্রায় বেরিয়েছিলেন, তবে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য, অন্যায়কে নয়।] তারপর ঐ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দেখা গেল 'যায়োনিস্ট' আন্দোলনের সূচনা হল। 'যায়োনিয্ম' পরবর্তী পর্যায়ে ইসরাঈল রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত করল। 'পবিত্রভূমি' যেখানে অবস্থিত, সেখানকার সমগ্র অঞ্চলটাই শেষ পর্যন্ত ইহুদী নিয়ন্ত্রণাধীনে যাবে, এটাও মনে হচ্ছে ঐ মহা-পরিকল্পনার অংশ। সেটাই হবে ইহুদীদের দ্বারা পৃথিবী শাসিত হবার দিকে আরেক ধাপ এগিয়ে যাওয়া। এবং সেটাই হচ্ছে ইহুদীদের নজরে 'দাজ্জালকে' আসল 'মসীহ্' মনে করার একটা পূর্বশর্ত। আর এই মহা-পরিকল্পনার প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে সম্পদ ও পানিসম্পদ দ্বারা এই অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারটি। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) 'দাজ্জাল'-এর সাথে সুদের সম্পর্ক এবং 'ইয়াজুজ-মাজুজ'-এর সাথে পানির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে গেছেন।

ইসরাঈলী ইহুদীরা 'পবিত্রভূমিতে' ফিরে এসেছে। আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা ছাড়া (যাতে ব্রিটেন সবচেয়ে প্রকাশ্য ভূমিকা রেখেছে) ঐ প্রত্যাবর্তন সম্ভব ছিল না। আর তাই আজ এটা স্পষ্ট যে, যেমনভাবে ভণ্ড-মসীহ্ 'দাজ্জাল' ব্রিটেন থেকে তার অভিযাত্রা শুরু করেছে, তেমনি 'ইয়াজুজ-মাজুজ'-ও ইউরোপীয় সভ্যতার ভিতরেই অবস্থিত।

'জেরুজালেম' থেকে 'পবিত্রভূমি'

কুর'আনে জেরুজালেমের রহস্য আরো ঘনীভূত হয় যখন দেখা যায় যে, পবিত্র গ্রন্থখানি কখনো কখনো 'জেরুজালেম' [অর্থাৎ একটা শহর] ও 'পবিত্রভূমি'কে সমার্থক ভাবে বর্ণনা করেছে (যেমনটি সুরা আল্-আম্বিয়া থেকে উদ্ধৃত ৯৫-৯৬ নং আয়াতে দেখা যায়), এবং 'জেরুজালেমকে' যেমন রহস্যময় ভাষায় উল্লেখ করেছে,

একই রকম ভাষায় 'পবিত্রভূমিকেও' উল্লেখ করেছে। উদাহরণস্বরূপ সুরা বনী ইসরাঈলে কুর'আন ঘোষণা করে যে, দুইটি উপলক্ষে 'পবিত্রভূমিতে' ফাসাদ (বা ধ্বংসাত্মক দুষ্কর্ম) সৃষ্টি করাটা ছিল বনী ইসরাঈলের নিয়তি। কিন্তু এই আয়াতে 'পবিত্রভূমিকে' ঐ নামে উল্লেখ করা হয়নি। বরং কুর'আন রহস্যপূর্ণভাবে 'পবিত্রভূমিকে' কেবল 'ভূমি' বলে উল্লেখ করেছে:

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ
وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤﴾

"আমি বনী-ইসরাঈলকে কিতাবে পরিস্কার বলে দিয়েছি যে, তোমরা দুই বার 'ঐ ভূমিতে' ফাসাদ (দুর্নীতি ও ভয়ঙ্কর অত্যাচার) সৃষ্টি করবে
"এবং শক্তিমদমত্ত হয়ে অহঙ্কারী হয়ে উঠবে (এবং দু'বারই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে)!"

(কুর'আন, সুরা বনী ইসরাঈল ১৭:৪)

আর তারপরে যখন কুর'আন, 'পবিত্রভূমির' উত্তরাধিকার হবার প্রশ্নে আল্লাহ্ তা'আলা যে সকল শর্ত আরোপ করেছেন সে বিষয়ে বক্তব্য রাখে, তখন আবারো তাকে 'পবিত্রভূমি' সম্বোধন না করে, কেবল সাধারণভাবে ও রহস্যজনকভাবে 'ঐ ভূমি' বলে সম্বোধন করে:

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٠٥﴾

"এর আগে, আমি উপদেশের পর {অর্থাৎ মূসা (আঃ)-এর কাছে পাঠান তৌরাতের পর} যবুরে লিখে দিয়েছি যে আমার সৎ বান্দারা 'ঐ ভূমির' উত্তরাধিকার লাভ করবে।"

(কুর'আন, সুরা আম্বিয়া ২১:১০৫)

সবশেষে, কুর'আন এমন একটা সময়ের কথা উল্লেখ করে যখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ 'ভূমির দানব'-এর উত্থান ঘটাবেন:

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ
تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾

"আর যখন তাদের বিরুদ্ধে (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের বিরুদ্ধে) উচ্চারিত সতর্কবাণী বাস্তবায়িত হবে, আমরা ঐ ভূমি থেকে এক দানব সৃষ্টি করব যে তাদের (বনী ইসরাঈলের) মুখোমুখি দাঁড়াবে।

"সে তাদের সাথে কথা বলবে, কেননা ঐ সব লোকজন নিশ্চয়তা সহকারে আমাদের নিদর্শনসমূহ বিশ্বাস করেনি।"

(কুর'আন, সুরা নম্‌ল ২৭:৮২)

'দাজ্জাল' ও 'ইয়াজুজ-মাজুজের' মতই, এই 'ভূমি থেকে উত্থিত দানব'-ও শেষ সময়ের অন্যতম প্রধান নিদর্শন। এটা স্পষ্ট যে ঐ দানবের প্রসঙ্গে উল্লেখিত 'ভূমি', 'পবিত্রভূমি' ছাড়া অন্য কিছু নয়। কুর'আন তার আলোচ্য বিষয়কে যখন নিম্নলিখিত ভাষায়, স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে, তখনই ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে যায়:

إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾

"বনী ইসরাঈল যে সকল বিষয়ে মতবিরোধ করে, অবশ্যই এই কুর'আন তার অধিকাংশ তাদের কাছে বর্ণনা করে।"

(কুর'আন, সুরা নম্‌ল ২৭:৭৬)

সুতরাং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ যখন ইহুদীদের শাস্তিদানের জন্য প্রস্তুত হলেন, তখন তিনি 'পবিত্রভূমিতে' একটি 'দানব' [বা জানোয়ার] সৃষ্টি করলেন। এই দানবের পরিচয় অনায়াসেই পাওয়া যায় — তা আধুনিক ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈল ছাড়া আর কিছুই নয়।

তৃতীয় অধ্যায়

কুর'আনে জেরুজালেমের কাহিনীর সূচনাঃ জেরুজালেম ও নবীগণ

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾

"আমি তাঁকে {ইব্রাহীম (আঃ)} ও (তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র) লূত (আঃ)-কে উদ্ধার করে ঐ ভূমির দিকে নিয়ে গেলাম, যেখানে আমি বিশ্বের জন্য কল্যাণ রেখেছি।"

(কুর'আন, সুরা আম্বিয়া ২১:৭১)

ইব্রাহীম (আঃ)

জেরুজালেম ও 'পবিত্রভূমি' সম্বন্ধে কুর'আনে বর্ণিত কাহিনী (এবং এটি একটি সত্যিকার কাহিনী, কোন কল্পকাহিনী নয়) শুরু হয় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নবী ইব্রাহীম (আঃ)-কে দিয়ে। তিনি তার জনগণের উপাসনালয়ে রাখা মূর্তিসমূহ ভেঙ্গে ফেলেছিলেন (আজকের ইরাকে অবস্থিত, তখনকার মেসোপটেমিয়ার উর্ নামক স্থানে), শুধু সবচেয়ে বড় মূর্তিটি তিনি অক্ষত রেখেছিলেন, যেন তার সম্প্রদায়ের মূর্তিপূজারী জনগণ, মূর্তি পূজার ভিত্তিহীনতা সম্বন্ধে সচেতন হতে পারে; (কুর'আন, সুরা আম্বিয়া ২১:৫৭-৭৩)। আজ যদি ইব্রাহীম (আঃ) পৃথিবীতে ফিরে আসতেন এবং তার ঐ কাজের [মূর্তি ভাঙ্গা] পুনরাবৃত্তি ঘটাতেন, তাহলে ধর্মনিরপেক্ষ সরকারসমূহ এবং তাদের তথাকথিত ইসলামি পণ্ডিতগণ তাঁকে এই বলে তিরস্কার করতেন যে, তার ঐ কাজ হচ্ছে সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসবাদ এবং ব্যাবিলনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধ্বংস সাধন। যে সরকার তাঁকে আশ্রয় দিত, জাতিসংঘ ঐ সরকারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করত। আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ সরকারসমূহ ও তাদের তথাকথিত ইসলামি পণ্ডিতগণ, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথেও কোন ভিন্ন আচরণ করত না, যদি তিনি ফিরে আসতেন এবং কাবায় রক্ষিত মূর্তিসমূহ ভাঙ্গার ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাতেন।

মূর্তির ধ্বংসযজ্ঞ এবং মূর্তি নিয়ে [ইব্রাহীম (আঃ)-এর] ঠাট্টা-বিদ্রূপের প্রতি উর্‌বাসীরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। তারা ইব্রাহীম (আঃ)-কে শাস্তি দেয়ার জন্য অগ্নিকুণ্ড তৈরী করে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করে। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ এখানে হস্তক্ষেপ করেন এবং ঐ আগুনকে আদেশ করেন "তাঁর জন্য ঠাণ্ডা" হয়ে যেতে এবং "তাঁকে ক্ষতি থেকে নিরাপদ রাখতে"; (কুর'আন, সুরা আম্বিয়া ২১:৬৮-৬৯)। তারপর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জানাচ্ছেন যে, তিনি তাকে [ইব্রাহীম (আঃ)-কে] ও লুত

(আঃ)-কে এমন এক ভূমিতে পৌছে দিলেন যেখানে সমগ্র মানবকুলের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে:

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾

"আমি তাঁকে {ইব্রাহীম (আঃ)} ও (তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র) লূত (আঃ)-কে উদ্ধার করে ঐ ভূমির দিকে নিয়ে গেলাম, যেখানে আমি বিশ্বের জন্য কল্যাণ রেখেছি।"

(কুর'আন, সুরা আম্বিয়া ২১:৭১)

এই আয়াতের মাধ্যমেই, কুর'আনে প্রথমবারের মত 'পবিত্রভূমি' বা 'আশীর্বাদপুষ্ট ভূমির' ধারণার সূচনা হয়। এর তাৎপর্য কি? সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ গোটা পৃথিবী থেকে কেনই বা একটি জায়গা বেছে নিলেন এবং সেই স্থানকে কেনই বা 'পবিত্র আশীর্বাদপ্রাপ্ত ভূমি' বানালেন? আর কেনই বা তিনি তাঁর নবী ইব্রাহীম (আঃ) ও লূত (আঃ)-কে ঐ 'পবিত্রভূমি'তে পথ নির্দেশনা দিয়ে নিয়ে গেলেন? এসব প্রশ্নের কেবল একটি উত্তরই হতে পারে। সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্, গোটা মানবজাতির মধ্য থেকে ইব্রাহীম (আঃ)-কে তাঁর 'বন্ধু' বা 'প্রিয়জন' (খলীল) হিসাবে বেছে নিয়েছেন (কুর'আন, সুরা নিসা ৪:১২৫)। ইব্রাহীম (আঃ)-কে তিনি কঠিনভাবে পরীক্ষা করেছেন, যেগুলিতে ইব্রাহীম (আঃ) উৎরে গেছেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তখন তাকে গোটা মানবকুলের জন্য ধর্মীয় প্রধান (ইমাম) হিসাবে নিযুক্ত করেছেন (কুর'আন, সুরা বাক্বারা ২:২১৪)। সেখান থেকেই এই ধারণার সূচনা যে, [মহাবিশ্ব জুড়ে] কেবল একটি মাত্র 'সত্যই' বিরাজমান, আর সেই সত্য থেকে গোটা মানবকুলের জন্য কেবল 'একটি' ধর্মই বিকাশ লাভ করতে পারে, আর সেটা হবে ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্ম। তাই [পৃথিবীতে] কেবল একটি সত্য ধর্মই রয়েছে, বাকী সব মিথ্যা, আর সেটা হচ্ছে মানবকুলের 'ইমামের' ধর্ম, অর্থাৎ ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্ম। কোন বিশপ বা র‍্যাবাই এই বাস্তবতাকে বোধ করি চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না। অথচ আমরা যখন তা প্রয়োগ করতে চাই, তখন র‍্যাবাইরা আমাদেরকে আত্ম-গরিমার অভিযোগে অভিযুক্ত করে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ যখন পবিত্রভূমি হিসেবে আশীর্বাদ করার জন্য একখণ্ড ভূমি বেছে নিলেন এবং ইব্রাহীম (আঃ)-কে দিক নির্দেশনা সহকারে ঐ ভূমির পানে অভিবাসনকল্পে নিয়ে গেলেন, তখন তাঁর উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা এটাই ছিল যে, ঐ 'পবিত্রভূমি' সত্যের "লিটমাস্ পরীক্ষা" [নিশ্চিতকরণ পরীক্ষা] হিসেবে কাজ করবে। কেবলমাত্র ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মই 'পবিত্রভূমি'তে টিকে থাকার কথা। আর বাকী সব কিছুই সেখান থেকে বহিষ্কৃত হবার কথা। অন্যভাবে বলতে গেলে, ঐ 'ভূমিতে' দৃশ্যতই সবসময় মিথ্যার উপর সত্যের জয় প্রতিষ্ঠিত হবে, আর, সেহেতু ঐ ভূমিতে মিথ্যার উপর সত্যের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হবার আগে ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটতে পারে না! ধর্মভীরুতা,

জীবনে আল্লাহ্ প্রদত্ত গুণাবলীর প্রতিপালন, সততা এবং একজন ক্রীতদাস যেভাবে তার প্রভুর ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করা উচিত, সেভাবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণ, এ সবই সত্যের নির্যাস, আর সেটাই ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মের মূল কথা বা মর্মবাণী। খৃস্টধর্ম, ইহুদীধর্ম, না ইসলাম, কোন্টা সত্য? ইতোমধ্যেই জেরুজালেম সে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলেছে! জেরুজালেমের ভূমিকাই হচ্ছে সত্যকে সত্যায়িত করা। আর এটাই হচ্ছে এই গ্রন্থের অন্যতম প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়।

সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ তা'আলাই যেহেতু ইব্রাহীম (আঃ) ও লূত (আঃ)-কে 'পবিত্রভূমিতে' যাবার এবং সেখানে অভিবাসী হবার নির্দেশ দিয়েছিলেন, এর নিহিতার্থ ছিল এই যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাদের অন্যত্র প্রত্যাবাসনের নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত, তাঁরা এবং তাঁদের বংশধরেরা সেখানেই বসবাস করবেন। আর তাই ঐ ভূমি তাদেরই অধিকারে ছিল।

এখানে একটি প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে — 'পবিত্রভূমিতে' বসবাসের আমন্ত্রণ কি শর্তহীন ছিল? যদি তাদের বংশধরেরা ইব্রাহীম (আঃ)-এর [সত্য] ধর্ম ত্যাগ করে নাস্তিক হয়ে যায় এবং বেশ্যাবৃত্তি বা নির্যাতনের মত পাপাচারে লিপ্ত হয়, তবুও কি তাদের বেলায় ঐ আমন্ত্রণ বহাল থাকবে? ইহুদীরা যখন 'পবিত্রভূমি'তে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করল, যার ঘোষণা মোতাবেক 'চূড়ান্ত কর্তৃত্বের' অধিকারী হচ্ছে রাষ্ট্র-যন্ত্র, ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতা [আল্লাহ্] নন, এবং যেখানে সর্বোচ্চ আইন হচ্ছে রাষ্ট্রের আইন, আল্লাহ্র আইন নয় — সেক্ষেত্রেও কি সে আমন্ত্রণ বহাল থাকবে? সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ যেটাকে হারাম (নিষিদ্ধ) ঘোষণা করেছেন, সেটাকে যদি ঐ রাষ্ট্রযন্ত্র হালাল (বৈধ) বলে ঘোষণা করে তবুও কি ঐ আমন্ত্রণ বজায় থাকবে? পাঠক এখানে খেয়াল করুন যে, ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতা [আল্লাহ্] সুদের ভিত্তিতে অর্থের লেনদেন নিষিদ্ধ করেছিলেন। অ-ইহুদীদের সুদের ভিত্তিতে অর্থ ধার দেওয়াকে বৈধ প্রতিপন্ন করতে গিয়ে, ইহুদীরা তৌরাত-এর লিখন বদলে দিয়েছে। আজ 'পবিত্রভূমি'তে কেবল যে সুদ বা রিবাই বৈধ তা নয়, বরং এমন অনেক কিছুই আজ সেখানে বৈধ, যা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, এবং একই মাপের গুরুত্ব সম্পন্ন প্রশ্ন হচ্ছে: সর্বশক্তিমান আল্লাহ যদি ঐ ভূমিকে 'সকল মানবকুলের জন্য' আশীর্বাদে ধন্য করে থাকেন, তাহলে একথার নিহিতার্থ কি এই নয় যে, যে কেউ বা মানবকুলের সেই সকল সদস্য যারা বিশ্বস্ততার সাথে ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্ম অনুসরণ করবে, তাদের সকলেরই ঐ সমস্ত আশীর্বাদ লাভ করার কথা? এটা কি একটি বিশ্বজনীন বক্তব্য নয়? তাহলে 'পবিত্রভূমির' উপর ইহুদীদের একচ্ছত্র অধিকারের দাবীর প্রশ্ন কোথা থেকে এবং কিভাবে আসে?

এই গ্রন্থে আমরা যখন এসকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করছি, তখন পাঠককুল যদি ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর প্রভুর মধ্যে সংঘটিত নিম্নলিখিত কথোপকথনের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তাহলে হয়ত ব্যাপারটা বুঝার জন্য বিশেষ সহায়ক হবে:

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ
قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾

"আর মনে কর, যখন ইব্রাহীমকে তার পালনকর্তা কয়েকটি বিষয় পরীক্ষা করেছিলেন, অতঃপর তিনি তা পুর্ণ করে দিলেন, তখন পালনকর্তা বললেন: 'আমি [এতদ্বারা] তোমাকে সমগ্র মানবকুলের ইমাম (ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতা) নিয়োজিত করলাম।'

"তিনি (ইব্রাহীম {আঃ}) জিজ্ঞেস করলেন: 'এবং আমার বংশধর থেকেও?' (তারাও কি এই মর্যাদার অধিকারী হবে?)। তিনি [আল্লাহ্] বললেন: 'আমার এই অঙ্গীকার যারা জুলুম করে (অর্থাৎ অবিচার, অত্যাচার, নির্যাতন, দমন, নিপীড়ন) তাদের কাছে পৌঁছাবে না (অর্থাৎ তারা এর অন্তর্ভুক্ত হবে না)'।"

(কুর'আন, সুরা বাক্বারা ২:১২৪)

কুর'আন যে সমস্ত কাজকে জুলুম বলে চিহ্নিত করে তার মাঝে রয়েছে, "মানুষকে তাদের বাড়ি থেকে অথবা আবাসভূমি থেকে বিতাড়িত করা বা বহিষ্কার করা"; আর তাও যখন করা হয় "কোন যুক্তিযুক্ত কারণ ছাড়া; শুধুমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের বিশ্বাসের কারণে":

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّـهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾
الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّـهُ ۗ

"যুদ্ধে অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে। কারণ, তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে; আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম।

"যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্...।"

(কুর'আন, সুরা হাজ্জ ২২:৩৯-৪০)

ঠিক এই পন্থায়ই ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আল্লাহ্‌র বাণীকে বদলে ফেলা এবং আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের মত জুলুমের জন্য, কুর'আন তার সবচেয়ে কঠিন তিরস্কার ব্যবহার করেছে। ইহুদীরা ঠিক এই [জঘন্য জুলুমের] কাজটিই করেছিল, যখন তারা তৌরাতকে পুনরায় [সম্পাদনা করে] লিখেছিল এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র বাণীকে বদলে দিয়ে তাকে অপবিত্র করেছিল:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّـهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ
إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢١﴾

"আর যে আল্লাহ্‌র প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথবা তাঁর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে, তার চাইতে বড় জালেম কে?
"নিশ্চয় জালেমরা সফলকাম হবে না।"

(কুর'আন, সুরা আন'আম ৬:২১)

আমাদের গ্রন্থ: The Religion of Abraham and the State of Israel-এ তৌরাতের বহু পরিবর্তনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

মূসা (আঃ)

সময়ের ধারায় প্রায় ৫০০ বৎসর পরের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে কুর'আনে আবার 'পবিত্রভূমির' উল্লেখ করা হয়, যখন মূসা (আঃ) ইসরাঈলী জনগোষ্ঠীকে 'পবিত্রভূমির' নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য যুদ্ধে যাবার আহ্বান জানান। তিনি তখন সবে তাদেরকে মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এনেছেন, এবং আল্লাহ্‌র অলৌকিক অনুগ্রহে সাগরের পানি ভাগ হয়ে তাদের জন্য রাস্তা তৈরী হয়ে যায়, কিন্তু তাদের শত্রুরা সেই রাস্তায় নেমে পড়লে সাগরের পানি এক হয়ে যায় এবং তারা সবাই ডুবে মারা যায়। তখন সিনাই থেকে পবিত্রভূমিকে মুক্ত করার অভিযান শুরু করার কথা:

يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّـهُ لَكُمْ
وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿٢١﴾

"হে আমার জনগণ! আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে যে 'পবিত্রভূমি' দান করেছেন তাতে প্রবেশ কর,
"এবং লজ্জাজনক ভাবে পিঠ প্রদর্শন কর না, কেননা তাহলে তোমরা বিপর্যস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে (এবং অনেক কিছুর সাথে ঐ ভূমিতে থাকার অধিকারও হারাবে)।"

(কুর'আন, সুরা মায়েদাহ্‌ ৫:২১)

পূর্বে বর্ণিত সুরা আম্বিয়ার ২১:৭১ আয়াতে যা প্রচ্ছন্ন ছিল, কুর'আনের এই আয়াতে [৫:২১] তা নিশ্চিত করা হয়েছে। যেহেতু ইসরাঈলীরা ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশোদ্ভূত ছিল এবং যেহেতু তখনও তারা আল্লাহ্‌র নবী মূসা (আঃ)-এর পথ নির্দেশনা মোতাবেক ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্ম অনুসরণ করছিল, সেহেতু 'পবিত্রভূমিতে' তাদের বসবাসের অধিকার ছিল। ঐ ভূমি [তখনও] তাদেরই ছিল!

মূসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পরে এক সময়, ইসরাঈলীরা 'পবিত্রভূমিতে' প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু ঐ ভূমির আশপাশে বসবাসরত বৈরীভাবাপন্ন গোত্রসমূহ প্রায়ই তাদের হয়রানি করত। কখনো কখনো জীবন বাঁচাতে তাদের পালিয়ে বেড়াতে হত। কুর'আনে এ ব্যাপারটা আলোচিত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে এমন একজন রাজার আবির্ভাবের প্রত্যাশার কথাও আলোচিত হয়েছে, যিনি তাদেরকে 'পবিত্রভূমির' উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবেন:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ
فَقَالَ لَهُمُ اللَّـهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۚ
إِنَّ اللَّـهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٤﴾
مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّـهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ
وَاللَّـهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾
أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ
إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ ۖ
قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ۖ
قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ۖ
فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٦﴾

"তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা (সংখ্যায়) হাজার হাজার হওয়া সত্ত্বেও, মৃত্যুর ভয়ে (পবিত্রভূমিতে তাদের) বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল?

"আল্লাহ্‌ তাদের বলেছিলেন: মরে যাও। তারপর তাদেরকে জীবিত করে দিলেন।

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের উপর অনুগ্রহকারী; কিন্তু তাদের [মানুষের] বেশীর ভাগই অকৃতজ্ঞ।

"তাহলে আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করে যাও, জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সব কিছু শোনেন এবং জানেন (সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ চান যে, তোমরা ঐ সমস্ত অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর ও প্রতিরোধ সৃষ্টি কর যারা তোমাদের, তোমাদের ভূমি থেকে এবং তোমাদের বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ করতে চায়)।

"কে আছ যে আল্লাহ্কে ঋণ দেবে সুন্দর ঋণ, যা আল্লাহ্ দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন।

"আল্লাহ্ই সংকোচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা দান করেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা সবাই ফিরে যাবে।

"তোমরা কি অবগত নও যে, মূসার (সময়ের) পরে, ইসরাঈলী প্রবীণগণ, তাদের একজন নবীকে কিভাবে বলেছিল:

"আমাদের জন্য একজন রাজা নিয়োগ করুন যাতে আমরা আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করতে পারি।

"তিনি বললেন: এটা কি সম্ভব না যে তোমাদেরকে লড়াইয়ের হুকুম দিলে তোমরা লড়বে না?

"তারা বলল: আমাদের কি হয়েছে যে আমরা আল্লাহ্র পথে লড়াই করব না? অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের ঘর-বাড়ী ও সন্তান-সন্ততি থেকে।

"অতঃপর যখন লড়াইর নির্দেশ হল, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তাদের সবাই ঘুরে দাঁড়াল। আর আল্লাহ্ তা'আলা জালেমদের ভাল করেই জানেন।"

(কুর'আন, সুরা বাক্বারা ২:২৪৩-২৪৬)

উপরের আয়াতে যে নবী ইসরাঈলীদের সাথে কথা বলেছিলেন, তিনি ছিলেন শামুয়েল (আঃ)। তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল:

قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ۖ

" আমাদের কি হয়েছে যে আমরা আল্লাহ্র পথে লড়াই করব না? অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের ঘর-বাড়ী ও সন্তান-সন্ততি থেকে।"

(কুর'আন, সুরা বাক্বারা ২:২৪৬)

তাদের নিজেদের ভাষায় এবং তাদের নিজেদের জিহ্বায় উচ্চারিত ঐ প্রতিক্রিয়া, এই নীতিকেই প্রতিষ্ঠিত করে যে, কোন অত্যাচারী যখন কোন জনগোষ্ঠীকে তাদের ঘর-বাড়ি এবং ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে, তখন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অধিকার ঐ জনগোষ্ঠীর রয়েছে। কথাটি সকল ভূ-খণ্ডের বেলায়ই প্রযোজ্য, এবং 'পবিত্রভূমির' বেলায় বিশেষভাবে প্রযোজ্য। একটা জনগোষ্ঠী, অর্থাৎ ফিলিস্তিনিরা, যারা ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতার [আল্লাহ্র] উপাসনা করে, সেই জনগোষ্ঠীকে তাদের বাড়ি-ঘর এবং ভূমি থেকে উচ্ছেদ করার নীতি এবং পরবর্তী ৫০ বছরেরও বেশী সময় যাবত তাদের

ফিরে আসা থেকে বিরত রাখার একগুঁয়েমির ভিত্তিতে ইসরাঈল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা তাহলে কিভাবে সম্ভব?

ইউশা (Joshua)

ইসরাঈলী জনগণকে যখন মিশর থেকে উদ্ধার করা হল, তারপর (আরো একবার) তাদেরকে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত 'পবিত্রভূমির' উত্তরাধিকার সমেত আশীর্বাদ করা হল। বাইবেল আমাদের বলে যে, ইউশার নেতৃত্বে তারা 'পবিত্রভূমি'তে প্রবেশ করেছিল। পবিত্র কুর'আন ইউশা সম্বন্ধে বাইবেলের বক্তব্য সমর্থনও করে না বা প্রত্যাখ্যানও করে না:

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۖ
وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۖ
وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٧﴾

"অথচ এমন এক জনগোষ্ঠী যাদেরকে (অতীতে) অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর মনে করা হত (কোন হিসাবেই ধরা হত না), আমি তাদেরকে উত্তরাধিকার হিসেবে ঐ (পবিত্র) ভূমির পূর্ব ও পশ্চিম অংশ দান করেছি যাতে আমি বরকত সন্নিহিত রেখেছি

"এবং বনী-ইসরাইলের প্রতি তোমার প্রভূর প্রতিশ্রুত কল্যাণ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তাদের ধৈর্যধারণের দরুন।

"আর ধ্বংস করে দিয়েছি সে সবকিছু যা ফেরাউন ও তার লোকজন তৈরী করেছিল, এবং ধ্বংস করেছি যা কিছু তারা (অহঙ্কার ভরে) সুউচ্চ নির্মাণ করেছিল।"

(কুর'আন সুরা আ'রাফ ৭:১৩৭)

এর আগে মূসা (আঃ) যখন তাদের 'পবিত্রভূমি'তে প্রবেশের জন্য যুদ্ধ করতে বলেছিলেন, তখন তারা তা করতে অস্বীকার করে। ঐ সময় তাদের মাঝে দুই ব্যক্তি 'পবিত্রভূমি'তে প্রবেশের জন্য তাদেরকে যুদ্ধ করার তাগিদ দেন। কুর'আনের তফসীরকারগণ, ইউশা-কে ঐ দুই ব্যক্তির একজন বলে চিহ্নিত করেন:

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّـهُ عَلَيْهِمَا
ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ ۚ
وَعَلَى اللَّـهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾

"(কিন্তু তাদের) আল্লাহ্-ভীরুদের মধ্য থেকে দু'জন যাদের উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছিলেন (তৌরাত মতে ইউশা এবং কালুত) বলল:

"তোমরা তাদের উপর আক্রমণ করে দরজায় প্রবেশ কর (অর্থাৎ সামনে থেকে আক্রমণ কর)। একবার তোমরা যখন ভিতরে যাবে, তখন জয় তোমাদেরই হবে;

"যদি তোমরা মুমিন হও তবে আল্লাহ্র উপর ভরসা কর।"

(কুর'আন, সুরা মায়েদাহ্ ৫:২৩)

সুলায়মান (আঃ)

'পবিত্রভূমি'র ব্যাপারে কুর'আনের চতুর্থ বক্তব্য এমন একটা সময়ের বর্ণনা যা আরো ৫০০ বৎসর পরে সংঘটিত হয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সুলায়মান (আঃ)-এর রাজত্বের কথা এভাবে বলেছেন:

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۚ
وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ﴿٨١﴾

"এবং সুলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে; তা তাঁর আদেশে প্রবাহিত হত ঐ ভূমির দিকে, যেখানে আমি কল্যাণ দান করেছি।

"আমি সব বিষয়েই সম্যক অবগত রয়েছি।"

(কুর'আন: সুরা আম্বিয়া, ২১:৮১)

আল্লাহ্র এই সকল আশীর্বাদের জন্যই, ইসরাঈলের তৎকালীন (ইসলামি) রাষ্ট্রটি, যা সুলায়মান (আঃ)-এর শাসনাধীন ছিল, তা শুধু যে গোটা পৃথিবীর নিয়ন্তা রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল তাই নয়, বরং তা পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে চমৎকার রাষ্ট্র বলেও স্বীকৃত। সুলায়মান (আঃ)-এর ইসরাঈলের মাধ্যমেই ইসরাঈলী জনগণ স্বর্ণযুগের অভিজ্ঞতা লাভ করে।

মুহাম্মদ (সাঃ)

পরিশেষে কুর'আন [ঘটনার ক্রমানুবর্তিতায়] পঞ্চমবারের মত 'পবিত্র বা আশীর্বাদপ্রাপ্ত ভূমির' উল্লেখ করে, যখন মক্কা থেকে জেরুজালেম এবং সেখান থেকে আসমানসমূহে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অলৌকিক রাত্রিকালীন যাত্রার বর্ণনা করা হয়:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى
الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١﴾

"পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত;

"যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি, যাতে আমি তাঁকে আমার কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল।"

(কুর'আন, সুরা বনী ইসরাঈল ১৭:১)

ঐ মসজিদে আকসাকে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) সনাক্ত করেন জেরুজালেমে নির্মিত নবী সুলায়মান (আঃ)-এর উপাসনালয় হিসাবে।

"জাবির ইব্নে আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত: যে তিনি আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে: কুরাইশরা যখন আমার কথা বিশ্বাস করল না (রাত্রিকালীন যাত্রার কাহিনী), আমি তখন আল্-হিজ্রে দাঁড়িয়েছিলাম এবং আল্লাহ্ জেরুজালেমকে আমার সামনে তুলে ধরেন, এবং আমি তা দেখতে দেখতে তাদেরকে বর্ণনা দিতে লাগলাম।"

(সহীহ্ বুখারী)

এরপর রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) মুসলিমদেরকে কেবল তিনটি স্থান ব্যতীত অন্য কোন পবিত্র স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে নিষেধ করেন:

"আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত: রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন: তিনটি মসজিদ ছাড়া আর কোন স্থানকে লক্ষ্য করে (তীর্থ) যাত্রা শুরু করো না — অর্থাৎ মসজিদুল হারাম (মক্কায়), আল্লাহ্র রাসূলের মসজিদ (মদীনায়), এবং মসজিদ আল্-আক্সা (জেরুজালেমে)।"

(বুখারী)

"মাইমুনাহ্ বিনতে সা'দ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত: আমি বললাম: হে আল্লাহ্র রাসূল, বাইতুল মুক্বাদ্দাস (জেরুজালেম) যাত্রার ব্যাপারে আইনগত নির্দেশ সম্বন্ধে আমাদের বলুন। আল্লাহ্র রাসূল বল্লেন, যাও এবং সেখানে প্রার্থনা কর। কিন্তু ঐ সময়ে সব শহরগুলো যুদ্ধে আক্রান্ত ছিল। তাই তিনি আরো বললেন: তোমরা যদি সেখানে যেতে না পার এবং [সেখানে গিয়ে] নামায পড়তে না পার, তাহলে প্রদীপের জ্বালানীস্বরূপ কিছু তেল পাঠিয়ে দিও (অর্থাৎ সহায়তা পাঠিয়ে দিও)।"

(সুনান আবু দাউদ)

খৃস্টাব্দ ৭০ সালে সেনাপতি টাইটাস্-এর নেতৃত্বে রোমান বাহিনী মসজিদ আল্-আক্সা অর্থাৎ সুলায়মান (আঃ) কর্তৃক নির্মিত উপাসনালয়কে ধ্বংস করে দেয়। খলিফা উমর (রাঃ)-এর সময় যখন মুসলিম বাহিনী জেরুজালেম জয় করে, তখনো ঐ মসজিদের ধ্বংসস্তুপ পড়েছিল। তিনিই সুলায়মান (আঃ) কর্তৃক নির্মিত আদি উপাসনালয়ের (মসজিদের) ধ্বংসাবশেষের স্থলে, বর্তমান 'মসজিদ আল্-আক্সা' নির্মাণ করার আদেশ দেন।

চতুর্থ অধ্যায়

জেরুজালেম সহ [গোটা] পবিত্রভূমি বনী ইসরাঈলকে দান করা হয়েছিল বলে কুর'আনের ঘোষণা

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ
إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾
يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّـهُ لَكُمْ
وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿٢١﴾

"স্মরণ কর, যখন মূসা তার জনগণকে বললেন: হে আমার জনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে স্মরণ কর,

"যখন তিনি তোমাদের মধ্যে নবী সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করেছেন আর তোমাদেরকে এমন জিনিস দিয়েছেন, যা বিশ্বজগতের কাউকে দেননি।

"হে আমার জনগণ! আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে যে 'পবিত্রভূমি' দান করেছেন তাতে প্রবেশ কর,

"এবং লজ্জাজনক ভাবে পিঠ প্রদর্শন করো না, কেননা তাহলে তোমরা বিপর্যস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে (এবং অনেক কিছুর সাথে ঐ ভূমিতে থাকার অধিকারও হারাবে)।"

(কুর'আন, সুরা মায়েদাহ্‌ ৫:২০-২১)

Los Angeles Times-এ প্রকাশিত তার প্রবন্ধে (*Jerusalem means more to Jews than to Muslims,* July 21, 2000) Dr. Daniel Pipes চেষ্টা করেছেন জেরুজালেমের উপর মুসলিমদের দাবীকে প্রত্যাখ্যান করতে, অন্য অনেক কিছুর সাথে এই যুক্তি দেখিয়ে যে, "কুর'আনে বা দোয়ার মধ্যে কোথাও একবারও [নামধরে] জেরুজালেমের উল্লেখ নেই।"

এটা সত্যি যে 'জেরুজালেম' শব্দটি আক্ষরিক ভাবে কুর'আনে উল্লেখিত হয়নি, কিন্তু তা মনে হয় আল্লাহর প্রজ্ঞার ফলস্বরূপ। পবিত্র কুর'আনে এক রহস্যময় ভাষায় জেরুজালেমের কথা বলা হয়েছে (এবং সঙ্গত কারণেই) একটি ধ্বংস প্রাপ্ত শহর বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যার জনগণকে বহিষ্কার করা হয়েছিল এবং তার পরে ঐ শহর পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় তাদের ফিরে আসা সব সময়ের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ঐ

নিষেধাজ্ঞা 'ইয়াজুজ-মাজুজ'-এর অভ্যুদয়ের আগে পর্যন্ত বহাল থাকবে (দেখুন, কুর'আন, সুরা আম্বিয়া ২১:৯৫-৯৬)। জেরুজালেমের আরবী নাম 'বাইত আল্-মাক্বদিস' হাদীস সমূহে বহুবার উল্লেখিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীতে জেরুজালেমের রোমান নাম 'Aelia' উল্লেখিত হয়েছে।

এটা সত্যিই অবাক হবার বিষয় যে, Dr. Pipes কুর'আনের ঐ সমস্ত আয়াতগুলিকে, যেখানে স্পষ্টভাবে আল্লাহ্ কর্তৃক ইহুদীদেরকে পবিত্রভূমি (যার প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে জেরুজালেম) দান করার কথা বলা হয়েছে, কিভাবে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। মূসা (আঃ) যখন ইসরাঈলী জনগোষ্ঠীকে মিশরে তাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে নিয়ে যান, এবং তারা অলৌকিকভাবে সমুদ্র পার হয়ে সিনাইয়ে প্রবেশ করল, তখন মূসা (আঃ) তাদেরকে পবিত্রভূমির নিয়ন্ত্রণ লাভ করার সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য আদেশ করেন। তিনি বলেন:

يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّـــهُ لَكُمْ
وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿٢١﴾
قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا
فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿٢٢﴾
قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّـــهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ
فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ ۚ وَعَلَى اللَّـــهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾

"হে আমার জনগণ! আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে 'পবিত্রভূমি' দান করেছেন তাতে প্রবেশ কর,

"এবং লজ্জাজনক ভাবে পিঠ প্রদর্শন করো না, কেননা তাহলে তোমরা বিপর্যস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে (এবং অনেক কিছুর সাথে ঐ ভূমিতে থাকার অধিকারও হারাবে)।

"তারা বলল: হে মূসা, সেখানে একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি রয়েছে। আমরা কখনও সেখানে যাব না, যে পর্যন্ত না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়।

"তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবে নিশ্চিতই আমরা প্রবেশ করব। (আরো দেখুন তওরাত, শুমারী ১৩:৩২-৩৩)।

"(কিন্তু তাদের) আল্লাহ্-ভীরুদের মধ্য থেকে দু'জন যাদের উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছিলেন (তাওরাত মতে ইউশা এবং কালুত), বলল: "তোমরা তাদের উপর আক্রমণ করে দরজায় প্রবেশ কর (অর্থাৎ সামনে থেকে আক্রমণ কর)।

"একবার তোমরা যখন ভিতরে যাবে, তখন জয় তোমাদেরই হবে; যদি তোমরা মুমিন হও তবে আল্লাহ্র উপর ভরসা কর।"

(কুর'আন, সুরা মায়িদাহ্ ৫:২১-২৩)

মূসা (আঃ)-এর প্রস্তাবের জবাবে ইহুদীরা যা বলেছিল তা এমনই অপমানজনক ছিল যে, আল্লাহ্ সাথে সাথে 'পবিত্রভূমি'তে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিলেন:

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا ۖ
فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴿٢٤﴾
قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي ۖ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٥﴾
قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ۛ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۛ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ۗ
فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

"তারা বলল: হে মূসা (আঃ)! তারা যতক্ষণ সেখানে আছে, আমরা কখনোই ('পবিত্রভূমিতে') প্রবেশ করব না।

"সুতরাং তুমি এবং তোমার প্রভু যাও এবং গিয়ে যুদ্ধ কর! আমরা এখানেই বসে রইলাম।

"তিনি [মূসা (আঃ)] বললেন: হে আমার প্রভু! আমার ভাই এবং আমার নিজের উপর ছাড়া, আর কারো উপর আমার নিয়ন্ত্রণ নেই; সুতরাং এইসব পাপী বিদ্রোহীদের কাছ থেকে আমাদেরকে দূরে রাখুন।

"(তাদের প্রভু) বললেন: (এই বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের জন্য) নিশ্চিতভাবে এ ভূমি (অর্থাৎ 'পবিত্র-ভূমি') চল্লিশ বছরের জন্য তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হল। তারা ভূপৃষ্ঠে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ফিরবে।

"সুতরাং (হে মূসা) আপনি অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্যে দুঃখ করবেন না।"

(কুর'আন, সুরা মায়িদাহ্ ৫:২৪-২৬)

পবিত্র কুর'আন আসলে অন্যত্র এই ঘোষণা পুনঃনিশ্চিত করেছে যে, ইহুদীদেরকে 'পবিত্রভূমি' দান করা হয়েছিল:

فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿١٠٣﴾
وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ

"অতঃপর সে (ফেরাউন) বনী ইসরাঈলকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চাইল। কিন্তু আমি তাকে এবং তার সঙ্গীদের সবাইকে নিমজ্জিত করে দিলাম।

"তারপর আমি বনী ইসরাঈলকে বললাম: এ ভূমিতে (অর্থাৎ 'পবিত্রভূমিতে') তোমরা নিরাপদে বসবাস কর...।"

(কুর'আন, সুরা বনী ইসরাঈল ১৭:১০৩-১০৪)

এবং আবার:

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۖ
وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۖ
وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٧﴾

"অথচ এমন এক জনগোষ্ঠী যাদেরকে (অতীতে) অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর মনে করা হত (কোন হিসাবেই ধরা হত না), আমি তাদেরকে উত্তরাধিকার হিসেবে ঐ (পবিত্র) ভূমির পূর্ব ও পশ্চিম অংশ দান করেছি যাতে আমি বরকত সন্নিহিত রেখেছি

"এবং বনী-ইসরাইলের প্রতি তোমার প্রভূর প্রতিশ্রুত কল্যাণ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তাদের ধৈর্যধারণের দরুন।

"আর ধ্বংস করে দিয়েছি সে সবকিছু যা ফেরাউন ও তার লোকজন তৈরী করেছিল, এবং ধ্বংস করেছি যা কিছু তারা (অহঙ্কার ভরে) সুউচ্চ নির্মাণ করেছিল।"

(কুর'আন সুরা আ'রাফ ৭:১৩৭)

এটা সত্যিই অবাক হবার বিষয় যে, ইহুদী ও যায়োনিস্ট পণ্ডিত ব্যক্তিগণ কিভাবে অত্যন্ত জ্ঞানপূর্ণ উপায়ে ঐ সমস্ত পরিস্কার বক্তব্যের উদ্ধৃতি এড়িয়ে গেছেন, যেখানে কুর'আন ঘোষণা করে যে, ইহুদীদেরকে 'পবিত্রভূমি' দান করা হয়েছিল:

- "হে আমার জনগণ! পবিত্রভূমিতে প্রবেশ কর যা আল্লাহ্ তোমাদের দান করেছেন...।"
- "তারপর আমরা (আল্লাহ্) বনী ইসরাঈলকে বললাম: "নিরাপদে ঐ (পবিত্রভূমিতে) বসবাস কর..."
- "উত্তরাধিকার হিসেবে, আমরা [আল্লাহ্] তাদেরকে ঐ (পবিত্র) ভূমির পূর্ব ও পশ্চিম অংশ দান করলাম, যে ভূমিকে আমরা আশীর্বাদ করেছিলাম।"

আমাদের পাঠকদের মাঝে যারা বিশ্বস্ততার সাথে, জেরুজালেমের শেষ অধ্যায় সম্বন্ধে সত্যকে অন্বেষণ করতে চান, তাদের উচিত, এই বিষয়ে কুর'আনের সূত্র উল্লেখ করতে ইউরো-ইহুদী, যায়োনিস্ট এবং ইসরাঈলী পণ্ডিত ব্যক্তিদের কেন এত অনীহা, তা নিয়ে গবেষণা বা চিন্তা ভাবনা করা। এই গ্রন্থে [কুর'আনের বক্তব্য এড়িয়ে যাওয়ার] ঐ ধরনের অদ্ভুত আচরণের একটা ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। 'পবিত্রভূমি'র উত্তরাধিকার লাভের জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ যে শর্ত আরোপ করেছিলেন, তৌরাতে তা যে বদলে ফেলা হয়েছে, এই সত্যটি প্রকাশ করতে ঐ সব পণ্ডিত ব্যক্তিদের

অনীহার মাঝেই কুর'আনের উদ্ধৃতি এড়িয়ে যাবার ব্যাখ্যা নিহিত। আসলে, পুনর্লিখিত তৌরাতের জালিয়াতি কুর'আনে উন্মোচন করা হয়েছে। ঐ জালিয়াতি কি ছিল?

পঞ্চম অধ্যায়

পবিত্রভূমির উত্তরাধিকার লাভের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত শর্ত

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٠٥﴾

"এর আগে, আমি উপদেশের পর {অর্থাৎ মূসা (আঃ)-এর কাছে পাঠানো তৌরাতের পর} যবুরে লিখে দিয়েছি যে আমার সৎ বান্দারা 'ঐ ভূমির' উত্তরাধিকার লাভ করবে।"

(কুর'আন, সুরা আম্বিয়া ২১:১০৫)

Dr. Pipes যদি কুর'আনের ঐ অধ্যায়ের ব্যাপারে সচেতন হতেন (আর এটা অসম্ভব যে তিনি এ সম্বন্ধে অবগত নন), যেখানে ঘোষণা করা হয়েছে যে, 'পবিত্রভূমি' ইহুদীদেরকে দান করা হয়েছিল, তাহলে তার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল: সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ইহুদীদের যে ভূমি দান করেছিলেন (যার প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে 'ঐ শহরটি'), সে ভূমির উপর থেকে ইহুদীদের মালিকানা মুসলিমরা কোন অধিকার বলে ছিনিয়ে নিতে চায়? যে কারণে তিনি এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন নি তা হচ্ছে এই যে, তাতে রহস্যের ঝুঁড়ির ডালা খুলে যাবে। প্রথমত তিনি চান না, কুর'আনের প্রতি [তার পাঠকদের] মনোযোগ আকর্ষণ করতে, বিশেষত কুর'আনে ইহুদী ও 'পবিত্রভূমি' সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার প্রতি। দ্বিতীয়ত ঐ প্রশ্নের উত্তর কুর'আনের অপর একটি আয়াতে নিহিত রয়েছে, যেখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, জেরুজালেম এবং 'পবিত্রভূমির' উপর ইহুদীদের অধিকার হচ্ছে "ঈমান ও সৎকাজের শর্ত সাপেক্ষে"। ঈমান বলতে অবশ্যই, ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্ম বিশ্বস্ততার সাথে পালন করাকে বুঝান হয়েছে:

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٠٥﴾

"এর আগে, আমি উপদেশের পর {অর্থাৎ মূসা (আঃ)-এর কাছে পাঠানো তৌরাতের পর} যবুরে লিখে দিয়েছি যে আমার সৎ বান্দারা 'ঐ ভূমির' উত্তরাধিকার লাভ করবে।"

(কুর'আন, সুরা আম্বিয়া ২১:১০৫)

এটা পরিস্কার যে উপরের আয়াতে কুর'আন যখন 'মাটি' বা 'ভূমি' শব্দটি ব্যবহার করেছে, তখন গোটা পৃথিবীকে বুঝান হয়নি। তা যদি বুঝান হত, তাহলে তা স্পষ্ট মিথ্যাচার বলে গণ্য হত, বর্তমান সময়ের জন্য যেমন মিথ্যা, ইতিহাসের বেশীর

ভাগের জন্যও মিথ্যা। যারা আজকের পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করে, এবং এমনকি যখন আমরা গ্রন্থের এই অধ্যায় লিখে চলেছি ঠিক তখনও, যাদের প্রতিনিধিরা নিউ ইয়র্কে Millennium Summit বা সহস্রাব্দ শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয়েছে তারা আসলে মানবতার আবর্জনা। তারা হচ্ছে প্রতারক, ক্ষয়িষ্ণু, অত্যাচারী এবং অতি অবশ্যই ধর্ম-বিমুখ, ধর্ম-নিরপেক্ষ আধুনিক বিশ্ব-ব্যবস্থার উঁচু মাপের প্রতিনিধিবৃন্দ। তারা হচ্ছে ঐ রক্ত চোষা আভিজাত্যের প্রতিনিধি, যা আজ মানবতাকে সুদভিত্তিক এক নতুন ও সূক্ষ্ম অর্থনৈতিক দাসত্বের শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে।

কিন্তু আল্লাহ্‌র 'কালাম' সর্বদা সত্য। তা কখনই মিথ্যা হতে পারে না! তাই, উপরের আয়াতে 'পৃথিবী', 'মাটি' বা 'ভূমি' বলতে সমগ্র পৃথিবী বুঝান হয়নি। তাহলে ঐ আয়াতে কোন্ ভূখণ্ডের কথা বলা হয়েছে? এর উত্তরও স্পষ্টত তৌরাত এবং যবুরে বিদ্যমান। এমনকি তা ইঞ্জিলের মধ্যেও রয়েছে (ইঞ্জিলের অনুবাদগুলি এমন যে, কেউ কখনো তা সনাক্ত করতে পারে না)। তা হচ্ছে 'পবিত্রভূমি'! কিন্তু সকল অনুবাদেই earth বা দেশ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে:

"কে সেই লোক, যে মাবুদকে ভয় করে? কোন্ পথ তাকে বেছে নিতে হবে তা তিনি তাকে দেখিয়ে দিবেন। সে উন্নতির মধ্যে তার জীবন কাটাবে, আর তার বংশধরেরা **দেশের** অধিকার পাবে। মাবুদকে যারা ভয় করে তাদের কাছেই তিনি তাঁর গোপন উদ্দেশ্য প্রকাশ করেন, আর তাঁর স্থাপন করা ব্যবস্থা তিনি তাদেরই জানান।"

(যবুর, ২৫:১২-১৪)

"কিন্তু নম্র লোকেরা **দেশের** দখল পাবে; প্রচুর দোয়া পেয়ে তারা আনন্দে মাতবে।

(যবুর, ৩৭:১১)

"খোদাভক্ত লোকেরা **দেশের** দখল পাবে আর সেখানে চিরকাল বাস করবে (অর্থাৎ যদি খোদাভক্ত হয় তাহলে)।"

(যবুর, ৩৭:২৯)

"মোবারক তারা, যাদের স্বভাব নম্র, কারণ **দুনিয়া** তাদেরই হবে।"

(ইঞ্জীল, মথি ৫:৫)

এই প্রসঙ্গে 'পৃথিবী' বা 'ভূমি' বলতে যে 'পবিত্রভূমিই' বুঝান হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে কুর'আনের ঐ অধ্যায়ে যেখানে ঘোষণা করা হয়েছে যে, বনী ইসরাঈল 'পৃথিবী' বা 'ভূমিতে' দু'বার 'ফাসাদ' (ভয়ঙ্কর অত্যাচার ও শয়তানী) সৃষ্টি করবে:

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ
وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤﴾

"আমি বনী-ইসরাঈলকে কিতাবে পরিস্কার বলে দিয়েছি যে, তোমরা দুই বার 'ঐ ভূমিতে' ফাসাদ (দুর্নীতি ও ভয়ঙ্কর অত্যাচার) সৃষ্টি করবে
"এবং শক্তিমদমত্ত হয়ে অহঙ্কারী হয়ে উঠবে (এবং দুই বারই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে)!"

(কুর'আন, সুরা বনী ইসরাঈল ১৭:৪)

এ ব্যাপারটা সর্বজনস্বীকৃত যে উপরের আয়াতে পৃথিবী বা ভূমি বলতে [কেবল] 'পবিত্রভূমিকেই' বুঝান হয়েছে। সুতরাং সকল কিতাবসমূহই এক সুরে ঘোষণা করেছে যে ঈমান এবং সদাচারের শর্ত সাপেক্ষে, ইহুদীগণ 'পবিত্রভূমির' বৈধ মালিকানা লাভ করতে পারত এবং সেখানে বসবাস করতে পারত।

কিন্তু জনৈক ব্যক্তি এই শর্তকে প্রত্যাহার করার উদ্দেশ্যে তৌরাতকে বদলে লিখেছে। সে লিখেছে:

*"কাজেই তোমরা জেনে রেখো, তোমরা ধার্মিক বলেই যে তোমাদের মাবুদ স্রষ্টা এই চমৎকার **দেশটা** তোমাদের অধিকার করতে দিচ্ছেন তা নয়। তোমরা তো একটা একগুঁয়ে জাতি।"*

(তৌরাত, দ্বিতীয় বিবরণ ৯:৬)

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ এবং ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই মিথ্যাচারকে সমর্থন করার প্রচেষ্টা, Dr. Pipes-এর জন্য খুব সুবিধাজনক নাও হতে পারে। কিন্তু উপরোক্ত বক্তব্য যে মিথ্যা, তা বুঝার জন্য খুব বেশী সাধারণ জ্ঞান, নৈতিক প্রজ্ঞা বা আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। ত্রুটিমুক্ত আল্লাহ্র সুবিচারের সাথে বক্তব্যটা মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এটা আসলে এক জালিয়াতি! পবিত্রভূমির উত্তরাধিকার বজায় রাখতে ইহুদীদের উপর আল্লাহ্ কর্তৃক ঈমান ও সদাচারের যে শর্ত আরোপিত হয়েছিল, তা এড়িয়ে যাবার লক্ষ্যেই এই মিথ্যাচারের শিল্পকর্ম। সারা পৃথিবীর মানচিত্র থেকে যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ঐ একটুকরো ভূমিকে বেছে নিয়ে থাকেন এবং সেই ভূমিখণ্ডকে বিশেষভাবে আশীর্বাদ করে থাকেন, তাহলে, তারা সদাচারী, না সদাচারের নৈতিক মান অনুযায়ী জীবনযাপনকে একগুঁয়েভাবে প্রতিরোধকারী, এসব বাছ-বিচার ছাড়াই এক "একগুঁয়ে জনগোষ্ঠীকে" কেন তিনি বিনাশর্তে ঐ ভূ-খণ্ড দান করবেন?

দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিক সূত্র নিশ্চিত করে যে, জেরুজালেম এবং 'পবিত্রভূমি' থেকে ইহুদীরা আল্লাহ্র ইচ্ছা [বা আদেশ] অনুযায়ী বার বার বহিষ্কৃত হয়েছে। যখনই

তারা ঈমান ও সদাচারের শর্ত লঙ্ঘন করেছে, তখনই এমনটা ঘটেছে। পবিত্র কুর'আন এসব বহিষ্কারের কথা উল্লেখ করেছে। আর তারপর, সর্বশেষ বহিষ্কারের পর, যখনই তারা আল্লাহ্ নির্ধারিত 'ঈমান' ও 'সদাচারের' শর্ত পূরণ না করে 'পবিত্রভূমি'তে প্রত্যাবর্তন করবে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করতে থাকবেন। আল্লাহর এই অভিপ্রায়ও কুর'আনে ব্যক্ত হয়েছে (কুর'আন, সুরা আম্বিয়া ২১:১০৫)। অনেক ইসরাঈলী ইহুদী (যারা ইউরোপীয় নয়) অনায়াসেই এটা স্বীকার করে যে, পাপপূর্ণ আচরণের জন্য তারা নিজেদের উপর, পুনঃপুনঃ 'পবিত্রভূমি' থেকে বহিষ্কারের আল্লাহ্-নির্ধারিত শাস্তি ডেকে এনেছে। ধর্ম-বিমুখ ধর্ম-নিরপেক্ষ ইউরোপীয় যায়োনিস্টরা অবশ্য এই সূত্র [বা ফর্মুলা] অস্বীকার করে থাকে।

আমাদের এই যুক্তির উত্তরে ইহুদীরা বলে যে, উপরে উদ্ধৃত (তৌরাত, দ্বিতীয় বিবরণ ৯:৬)-এ কেবল মাত্র ইহুদীদের এই ব্যাপারটা মনে করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ঐ ভূমি তাদের পূর্বপুরুষ ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঈমান ও সদাচারের বদৌলতে তাদেরকে দান করা হয়েছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, তারা তাদের সদাচারের কারণে ঐ ভূমির বরাদ্দ এবং উত্তরাধিকার অর্জন করেনি।

এই ধরনের যুক্তি ঐ অনুচ্ছেদের (তৌরাত, দ্বিতীয় বিবরণ ৯:৬) আসল উদ্দেশ্যকে পরিবর্তন করতে পারে না, অর্থাৎ তারা বলতে পারে না যে, "ঐ ভূমি তাদের নিঃশর্তভাবে দান করা হয়েছিল"। এবং কুর'আন এধরনের অনুমানকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করে। কুর'আনের ঘোষণা স্পষ্ট। বনী ইসরাঈলকে ঐ ভূমিখানা শর্তসাপেক্ষে দেয়া হয়েছিল। শর্ত ছিল 'আল্লাহ্য় বিশ্বাস এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ' এবং 'সদাচার'। (কুর'আন, সুরা আম্বিয়া ২১:১০৫)।

শেষবারের মত ইহুদীরা 'পবিত্রভূমি' থেকে বহিষ্কার হওয়ার প্রায় ৬০০ বৎসর পরে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মুসলিমদেরকে ঐ ভূমির উত্তরাধিকার লাভ করতে সমর্থ করলেন, যখন মুসলিম বাহিনী তা জয় করল এবং খলিফা ওমর (রাঃ)-কে অনুরোধ করা হল ব্যক্তিগতভাবে জেরুজালেমে এসে ঐ শহরের চাবি বুঝে নিতে। ঐদিন এ বিষয়ে কুর'আনের ভবিষ্যতবাণী বাস্তব রূপ নিল:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

"তিনিই তোমাদেরকে (পবিত্র) ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন, এবং একে অন্যের উপর মর্যাদায় সমুন্নত করেছেন,

"যাতে তোমাদেরকে এ বিষয়ে পরীক্ষা করেন, যা তোমাদেরকে দিয়েছেন (বনী ইসরাঈল অন্যান্য জনগোষ্ঠীর চেয়ে বেশী লাভ করেছে)। আপনার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদাতা এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু।"

(কুর'আন, সুরা আন'আম ৬:১৬৫)

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন যে, মুসলিমরা 'পবিত্রভূমির' উত্তরাধিকার লাভ করবে, এটা তাঁর সিদ্ধান্ত। এভাবেই 'পবিত্রভূমিতে' মিথ্যার উপর সত্যের বিজয় ঘটেছিল। তারা যখন 'পবিত্রভূমির' নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল, তখন থেকে (মাঝখানের অল্প কিছু সময় ছাড়া) ১২'শ বৎসরের বেশী সময় ধরে মুসলিমরা ঐ ভূমির উপর শাসন করেছে। সেটা ছিল আসমান থেকে নেমে আসা এক স্পষ্ট নিদর্শন এবং ইঙ্গিত। সেটা ছিল 'পবিত্রভূমির' উপর মুসলিম শাসনের ঐশ্বরিক অনুমোদন। এত দীর্ঘ সময়ের জন্য 'পবিত্রভূমির' উপর এই নির্বিঘ্ন মুসলিম শাসনের একটা ব্যাখ্যা, ইহুদী পণ্ডিত ব্যক্তিদের দেয়া উচিত — যে মুসলিম শাসন সুবিচারপূর্ণ এবং আল্লাহ্ ভীরু দু'টোই ছিল।

যখন ইউরোপীয় (অ-ইসরাঈলী) যায়োনিস্ট ইহুদীরা, ইসরাঈলী ইহুদীদের ধোঁকা দিয়ে 'পবিত্রভূমিতে' ফিরে আসার এক 'মোটা-মাথা' একগুঁয়ে প্রচেষ্টায় তাদের সাথে যোগ দেওয়াতে সফল হয়, যে প্রচেষ্টাকে তারা [যায়োনিস্টরা] *'ঈশ্বর-নির্ধারিত ইসরাঈল রাষ্ট্রের পুনরুদ্ধার'* বলে দাবী করে, তখন ইসরাঈলী ইহুদীদের সামনে একটা স্পষ্ট আলামত ছিল, যা দেখে তাদের বুঝা উচিত ছিল যে, যায়োনিস্টদের ঐ আহবান মিথ্যা ছিল। এটা ছিল এক মিথ্যাচার। ইসরাঈলের জন্য যায়োনিস্টদের ঐ সংগ্রামে, ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মে "ঈমান এবং সদাচারের" স্রষ্টা-নির্ধারিত শর্তসমূহ সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত ছিল। আর যখন ইসরাঈল রাষ্ট্র বাস্তবতা লাভ করল, তখন ঐ রাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল একটা আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ভিত্তি যা হয় তাই। একটা আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মূলভিত্তি হচ্ছে 'শির্ক' ও 'কুফ্র', এবং এগুলি ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মকে অস্বীকার করে। বিষয়টি আমাদের এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উত্তরাধিকারের শর্ত লঙ্ঘন করায় ‘পবিত্রভূমি’ থেকে আল্লাহ্ কর্তৃক ইহুদীদের বহিষ্করণ

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ
وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤﴾
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ۚ
وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴿٥﴾
ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿٦﴾
إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ
كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴿٧﴾

“আমি বনী-ইসরাঈলকে কিতাবে পরিস্কার বলে দিয়েছি যে, তোমরা দুই বার ‘ঐ ভূমিতে’ ফাসাদ (দুর্নীতি ও ভয়ঙ্কর অত্যাচার) সৃষ্টি করবে

“এবং শক্তিমদমত্ত হয়ে অহঙ্কারী হয়ে উঠবে (এবং দুই বারই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে)!”

“অতঃপর যখন প্রতিশ্রুত সেই প্রথম সময়টি এল, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমার কঠোর যোদ্ধা বান্দাদেরকে। অতঃপর তারা প্রতিটি জনপদের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল।

“এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল।

“অতঃপর আমি তোমাদের জন্যে তাদের বিরুদ্ধে পালা ঘুরিয়ে দিলাম, তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও পুত্রসন্তান দ্বারা সাহায্য করলাম এবং তোমাদেরকে জনসংখ্যার দিক দিয়ে একটা বিরাট বাহিনীতে পরিণত করলাম।

“তোমরা যদি ভাল কর, তবে নিজেদেরই ভাল করবে এবং যদি মন্দ কর তাও নিজেদের জন্যেই।

“এরপর যখন (অবিচার অনাচারের) দ্বিতীয় সে সময়টি এল, তখন অন্য বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম, যাতে তোমাদের মুখমন্ডল বিকৃত করে দেয়, আর (সুলায়মান (আঃ) নির্মিত) মসজিদে ঢুকে পড়ে

"যেমন প্রথমবার (তাদের পূর্বসূরীরা) ঢুকেছিল, এবং যেখানেই জয়ী হয় সেখানেই ধবংসযজ্ঞ চালায়।"

(কুর'আন, সুরা বনী ইসরাঈল ১৭:৪-৭)

পবিত্র কুর'আনের সুরা বনী ইসরাঈল (১৭নং সুরা) জেরুজালেমের ইতিহাস বর্ণনা করে, এবং তৌরাতের নিম্নলিখিত জাল বক্তব্যের জালিয়াতি উন্মোচিত করে:

*"কাজেই তোমরা জেনে রেখো, তোমরা ধার্মিক বলেই যে তোমাদের মাবুদ স্রষ্টা এই চমৎকার **দেশটা** তোমাদের অধিকার করতে দিচ্ছেন তা নয়। তোমরা তো একটা একগুঁয়ে জাতি।"*

(তৌরাত, দ্বিতীয় বিবরণ ৯:৬)

এই ঘোষণাটি জাল, কারণ তা এমন একটা বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করে যাতে মনে হবে যে, ইহুদীদেরকে ঐ 'পবিত্রভূমি' আল্লাহ্ নিঃশর্তভাবে দান করেছিলেন। অন্য কথায় ঐ বক্তব্য ইহুদীদেরকে এই যুক্তি উত্থাপন করার সুযোগ দেয় যে, তারা সদাচার না করে থাকলেও 'পবিত্রভূমি' এখনো তাদেরই, কারণ 'পবিত্রভূমির' উত্তরাধিকার হবার জন্য 'সদাচার' একটা পূর্বশর্ত ছিল না। ইহুদীরা যুক্তি দেখাবে যে, ইব্রাহীম (আঃ) সদাচারী ছিলেন এবং তাঁর সদাচারের পুরস্কার হিসেবে ঐ ভূমিখণ্ড তাঁকে এবং তাঁর বংশধরদের দান করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ইহুদী জনগোষ্ঠীর কোন ধরনের অসদাচরণই আর 'পবিত্রভূমির' উপর তাদের সেই অধিকার হরণ করতে পারে না। তাছাড়া তৌরাত তো এই বিষয়ের উপর পরিস্কার বক্তব্য উপস্থাপন করেছে:

*"তোমাদের দিল ও মনে আমার এই কথাগুলো গেঁথে রাখবে, তা মনে রাখবার চিহ্ন হিসাবে হাতে বেঁধে রাখবে এবং কপালে লাগিয়ে রাখবে। তোমাদের সন্তানদের সেগুলো শিখাবে। ঘরে বসে থাকবার সময়, পথে চলবার সময়, শোবার সময় এবং বিছানা থেকে উঠবার সময় তোমরা এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে। তোমাদের বাড়ীর দরজায় এবং চৌকাঠে তোমরা সেগুলো লিখে রাখবে। যদি তোমরা এই সব কর তবে যে **দেশ** দেবার কসম মাবুদ তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে খেয়েছিলেন সেই **দেশে** তোমরা ও তোমাদের ছেলেমেয়েরা ততকাল বেঁচে থাকবে যতকাল এই দুনিয়ার উপর আসমান থাকবে। তোমাদের মাবুদ খোদাকে মহব্বত করবার, তাঁর পথে চলবার এবং তাঁকে আঁকড়ে ধরে রাখবার এই যে সব হুকুম আমি তোমাদের দিলাম তা তোমরা যত্নের সঙ্গে পালন করবে। তা করলে মাবুদই তোমাদের সামনে থেকে ঐ সব জাতিগুলোকে বের করে দেবেন, আর তোমরা তোমাদের চেয়েও বড় বড় এবং শক্তিশালী জাতিকে বেদখল করবে। দক্ষিণের মরুভূমি থেকে লেবানন পর্যন্ত এবং ফোরাত নদী থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত তোমরা যেখানে পা ফেলবে সেই জায়গাই তোমাদের হবে। কোন লোকই তোমাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। তোমরা*

*সেই **দেশের** যেখানেই যাবে তোমাদের মাবুদ খোদা তাঁর ওয়াদা অনুসারে সেখানকার লোকদের মনে তোমাদের সম্বন্ধে একটা ভয়ের ভাব ও কাঁপুনি ধরিয়ে দেবেন।"*

(তৌরাত, দ্বিতীয় বিবরণ ১১:১৮-২৫)

Jewish Encydopeadia-য় Michael Avi-Yonah-র প্রবন্ধে বলা হয়েছে: "David বা দাউদ (আঃ) যখন রাজ্য জয় করতে থাকেন, তখন তিনি জেরুজালেমকে, মিশর থেকে ফোরাত পর্যন্ত বিস্তৃত এক সাম্রাজ্যের কেন্দ্র বানিয়েছিলেন, যদিও তার উত্তরসূরী সুলায়মান (আঃ)-এর শাসনামলেই কেবল এর পূর্ণ সুফল লাভ করা সম্ভব হয়েছিল।"

কিন্তু 'পবিত্রভূমির' উত্তরাধিকার পাবার শর্ত হিসেবে সদাচার ও ঈমানকে বাদ দেয়ার কারণেই বুঝা যায় যে, তৌরাত, দ্বিতীয় বিবরণ ৯:৬ এবং ১১:১৮-২৫ মিথ্যা। পবিত্র কুর'আন যে কেবল ঐ ধরনের উত্তরাধিকারের জন্য সদাচারকে একটা পূর্বশর্ত বলে পুনরায় নিশ্চিত করেছে তাই নয়, বরং আরো বর্ণনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক প্রমাণাদির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, যাতে দেখা যায় যে, ঐ শর্ত-ভঙ্গের ফলস্বরূপ সব সময় পবিত্রভূমি থেকে আল্লাহ্ কর্তৃক বহিষ্কারের ঘটনা ঘটেছে। ঐ সুরাতে (অন্ততঃ) দু'টি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে যখন বনী ইসরাঈল ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্ম এবং সদাচারের মান থেকে দূরে সরে গিয়েছিল যে, এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সেজন্য তাদেরকে পবিত্রভূমি থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। (এ বিষয়ের উপর আমাদের গ্রন্থ The religion of Abraham and the State of Israel – A View from the Qur'an-এ আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।

[আল্লাহ্ নির্ধারিত শাস্তির] প্রথম ঘটনাটি ঘটে খৃস্টপূর্ব ৫৮৭ সনে, যখন বখতে-নাসারের (Nebuchadnezzar) নেতৃত্বে ব্যাবিলনীয় এক বাহিনী জেরুজালেম অবরোধ করে, তারপর শহরটি পুড়িয়ে দেয়, এর অধিবাসীদের হত্যা করে, সুলায়মান (আঃ) কর্তৃক তৈরী করা মসজিদ ধ্বংস করে দেয় এবং ইহুদী জনসংখ্যার উৎকৃষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ অংশকে ক্রীতদাস হিসেবে ব্যাবিলনে নিয়ে যায়। যেভাবে মহান আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে ঘোষণা করেছেন (কুর'আন, সুরা বনী ইসরাঈল ১৭:১৫-১৬) যে, তিনি সতর্কবাণী না পাঠিয়ে কোন জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেন না, ঠিক সেইভাবে নবী ইয়ারমিয়া (Jeremiah) তাদে কে এব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলেন (ইয়ারমিয়া ৩২:২৬)। যারা যবুর [পুনরায়] লিপিবদ্ধ করেছেন, তারা উপরোক্ত ঘটনায় জেরুজালেম এবং ঐ উপাসনালয় [সুলায়মান (আঃ) কর্তৃক নির্মিত মসজিদ]-এর ধ্বংসলীলার মাঝে ঐশ্বরিক শাস্তি সনাক্ত করতে পারেননি, আর তাই একটা নালিশের মধ্যে দিয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন:

"হে বিধাতা, অন্য জাতিরা তোমার সম্পত্তি আক্রমণ করেছে, তারা সেখানে ঢুকে পড়েছে; তোমার পবিত্র ঘরটা তারা নাপাক করেছে; জেরুজালেমকে তারা ধ্বংসের স্তূপ করেছে।"

(যবুর, ৭৯:১)

অন্যান্য অনেক কিছুর মাঝে, এভাবে তাদের শায়েস্তা করার অন্যতম কারণ ছিল এই যে, তারা মহান আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ (হারাম) ব্যাপার সমূহকে জায়েয (হালাল) করার জন্য তৌরাতের লিখন বদলে ফেলেছিল। ইহুদীদের নিজেদের মাঝের অর্থনৈতিক লেনদেনে সুদ নিষিদ্ধ রেখে, অ-ইহুদীদেরকে সুদের ভিত্তিতে অর্থ ধার দেয়া জায়েয করতে গিয়ে তারা তৌরাতের লিখন বদলে পুনরায় তাতে লিখেছিল:

"তোমার কোন ইরাইলীয় ভাইয়ের কাছ থেকে সুদ নেবে না; সেই সুদ টাকা-পয়সার উপরেই হোক কিংবা খাবার জিনিসের উপরেই হোক কিংবা অন্য যে কোন জিনিষের উপরেই হোক (কারণ, সেকালে কখনো কখনো দ্রব্যাদিও টাকা পয়সার মতই ব্যবহৃত হত)। অন্য জাতির লোকদের কাছ থেকে তোমরা সুদ নিতে পার..."

(তৌরাত, দ্বিতীয় বিবরণ ২৩:১৯-২০)

(The Importance of the Prohibition of Riba in Islam এবং The Prohibitions of Riba in the Qur'an and Sunnah নামক আমাদের দু'টি গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে)।

আল্লাহর নবীদের হত্যা করার অপরাধে, তারা দ্বিতীয় দফায় পুনরায় পবিত্রভূমি থেকে বহিষ্কৃত হয় (উদাহরণ স্বরূপ, কুর'আন, সুরা বাক্বারা ২:৬১ দেখুন)। তারা জাকারিয়া (আঃ)-কে মসজিদে হত্যা করেছিল। তাঁর ছেলে ইয়াহিয়া (আঃ) নিহত হয়েছিলেন প্রতারণার কারণে। ঈসা (আঃ), নবীদের এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে কথা বলেছেন এবং এই জঘন্য অপরাধের কঠোর সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি তার সুর মোটেই নরম করেননি:

"এইজন্য বিধাতা তাঁর উদ্দেশ্য অনুসারে এই কথা বলেছেন, 'আমি তাদের কাছে নবী ও রাসূলদের পাঠিয়ে দেব। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে তারা হত্যা করবে এবং অন্যদের উপর জুলুম করবে।' এর ফল হল, দুনিয়া সৃষ্টির সময় থেকে শুরু করে যতজন নবীকে খুন করা হয়েছে, তাঁদের রক্তের দায়ী হবে এই কালের লোকেরা। (অর্থাৎ ইহুদীদের এই প্রজন্ম, অন্য কথায় ঈসা (আঃ)-এর সময়কার প্রজন্ম)। জ্বী, আমি আপনাদের বলছি হাবিলের খুন থেকে শুরু করে যে জাকারিয়াকে কোরবানগাহ্ এবং পবিত্র স্থানের মধ্যে হত্যা করা হয়েছিল সেই জাকারিয়ার খুন পর্যন্ত সমস্ত রক্তের দায়ী হবে এই কালের লোকেরা।"

(ইঞ্জীল, লূক ১১:৪৯-৫১)

সবশেষে তারা এ নিয়ে গর্ববোধ করেছে যে কিভাবে তারা মসীহ্, অর্থাৎ মরিয়মেরর পুত্র ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করেছে (কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করেন):

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّـهِ
وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ
وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ
مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٧﴾

"তারা (গর্বভরে) বলল যে: আমরা মরিয়মের পুত্র, আল্লাহ্র রাসূল ঈসা মসীহ্কে হত্যা করেছি;

"কিন্তু তারা তাঁকে হত্যা করেনি বা ক্রুশবিদ্ধও করেনি, কিন্তু তাদের কাছে যেন তেমন মনে হয় [যে তারা তাকে হত্যা করছে] তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল,

"আর যারা এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে, তাদের মন কোন (নিশ্চিত) জ্ঞান ছাড়াই সন্দেহে ভরা,

"কেবল অনুমানের উপর নির্ভরশীল, এটা নিশ্চিত যে তারা তাকে হত্যা করেনি।"

(কুর'আন, সুরা নিসা ৪:১৫৭)

এরপর সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাদেরকে দ্বিতীয়বারের মত শাস্তি দেন। [অর্থাৎ ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করার চেষ্টা করার পর]। সেনাপতি টাইটাসের (Titus) নেতৃত্বে রোমান বাহিনী ৭০ খৃস্টাব্দে জেরুজালেম অবরোধ করে। টাইটাস জেরুজালেম শহর ধ্বংস করে দেন, এর বাসিন্দাদের হত্যা করেন এবং পবিত্রভূমি থেকে অবশিষ্ট ইহুদীদের বহিষ্কার করেন। পবিত্র মসজিদখানি আবার ধ্বংস হয় এবং রোমান সৈন্যরা সেটাকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে, গলিত স্বর্ণ পিণ্ডের খোঁজে প্রতিটি পাথরকে এক এক করে আলগা করা হয়, ঠিক যেমনটি ঈসা (আঃ) সতর্কবাণী ও ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন: *"একটি পাথরও অপর পাথরের উপর লেগে থাকবে না; সব ভেঙ্গে ফেলা হবে।"* (দেখুন, কুর'আন, সুরা বনী ইসরাঈল ১৭:৪-৭):

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ
وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤﴾
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ۚ
وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴿٥﴾

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿٦﴾
إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ
كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴿٧﴾

"আমি বনী-ইসরাঈলকে কিতাবে পরিস্কার বলে দিয়েছি যে, তোমরা দুই বার 'ঐ ভূমিতে' ফাসাদ (দুর্নীতি ও ভয়ঙ্কর অত্যাচার) সৃষ্টি করবে

"এবং শক্তিমদমত্ত হয়ে অহঙ্কারী হয়ে উঠবে (এবং দুই বারই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে)!"

"অতঃপর যখন প্রতিশ্রুত সেই প্রথম সময়টি এল, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমার কঠোর যোদ্ধা বান্দাদেরকে। অতঃপর তারা প্রতিটি জনপদের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল।

"এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল।

"অতঃপর আমি তোমাদের জন্যে তাদের বিরুদ্ধে পালা ঘুরিয়ে দিলাম, তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও পুত্রসন্তান দ্বারা সাহায্য করলাম এবং তোমাদেরকে জনসংখ্যার দিক দিয়ে একটা বিরাট বাহিনীতে পরিণত করলাম।

"তোমরা যদি ভাল কর, তবে নিজেদেরই ভাল করবে এবং যদি মন্দ কর তাও নিজেদের জন্যেই।

"এরপর যখন (অবিচার অনাচারের) দ্বিতীয় সে সময়টি এল, তখন অন্য বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম, যাতে তোমাদের মুখমন্ডল বিকৃত করে দেয়, আর (সুলায়মান (আঃ) নির্মিত) মসজিদে ঢুকে পড়ে

"যেমন প্রথমবার (তাদের পূর্বসূরীরা) ঢুকেছিল, এবং যেখানেই জয়ী হয় সেখানেই ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।"

(কুর'আন, সুরা বনী ইসরাঈল ১৭:৪-৭)

سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٤٥﴾

"... শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে দেখাব পাপাচারীদের আবাসস্থল (কিভাবে সেগুলো ধ্বংসস্তুপের মত পরিত্যক্ত পড়ে আছে)।"

(কুর'আন, সুরা আ'রাফ ৭:১৪৫)

যে উপাসনালয়টি দুই দুইবার ধ্বংস করা হয়েছে, কুর'আন সেটাকে 'আল-মসজিদ' (অর্থাৎ মসজিদটি) বলে উল্লেখ করেছে। কিন্তু ঠিক তার আগে, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অলৌকিক যাত্রাকে (অর্থাৎ আল্-ইসরা ও মি'রাজকে), আল-মসজিদ আল্-হারাম (মক্কা) থেকে আল্-মসজিদ আল্-আক্সা (অর্থাৎ দূরবর্তী মসজিদ) পর্যন্ত যাত্রা বলে বর্ণনা করেছে:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى
الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١﴾

"পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত;

"যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি, যাতে আমি তাঁকে আমার কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল।"

(কুর'আন, সুরা বনী ইসরাঈল ১৭:১)

পবিত্র কুর'আনের আয়াতে উল্লেখিত 'মসজিদ' খানি, যা দুই দুইবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল, তা, জেরুজালেমে সুলায়মান (আঃ) কর্তৃক নির্মিত 'মসজিদ' ছাড়া আর কোনটি হতে পারে না। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজে এটা নিশ্চিত করেছেন। এটা হচ্ছে ঐ একই মসজিদ যা উপরের আয়াতে 'মসজিদ আল্-আক্সা' [বা দূরবর্তী মসজিদ] বলে বর্ণিত হয়েছে, যেখানে রাসূল (সাঃ)-কে ঐ রাত্রিকালীন অলৌকিক যাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কুর'আন ব্যাখ্যা করে যে, মহান আল্লাহ্ তা'আলার কিছু নিদর্শন দেখাতে তাঁকে [রাসূল (সাঃ)-কে] সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। ঐ সকল নিদর্শনের মধ্যে জেরুজালেমের পরিণতি অবশ্যই অন্যতম।

দ্বিতীয়বারের মত শাস্তিস্বরূপ 'পবিত্রভূমি' থেকে ইহুদীদেরকে বহিষ্কার করার পর, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এই অভিপ্রায় ঘোষণা করেন যে, তারা যদি ঈমান ও সদাচারের শর্ত ভঙ্গ করে 'পবিত্রভূমিকে' বার বার অপবিত্র করতে থাকে, তবে তিনিও তাদেরকে বার বার শায়েস্তা (এবং বহিষ্কার) করতে থাকবেন:

وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا ۘ

"...কিন্তু যদি পুনরায় তদ্রূপ কর (অর্থাৎ 'পবিত্রভূমির' উত্তরাধিকারের শর্ত লঙ্ঘন কর), আমিও পুনরায় তাই করব (অর্থাৎ তোমাদেরকে পুনঃপুনঃ বহিষ্কার করব)..."

(কুর'আন, সুরা বনী ইসরাঈল ১৭:৮)

উপরোক্ত সতর্কবাণীতে এবং কুর'আনের সুদৃঢ় ঘোষণায়, জেরুজালেমের শেষ অধ্যায় স্পষ্টভাবে লিখিত রয়েছে। সেই সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে, এবং নীচে বর্ণিত কোন ব্যাপারই তাকে প্রভাবিত করতে পারবে না:

- ফিলিস্তিনী জনগণের ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী প্রতিনিধি এবং ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী ইউরোপীয় ইহুদী, যারা বনী ইসরাঈলের তথাকথিত প্রতিনিধি, এই

দুই পক্ষের ভিতর ক্যাম্প ডেভিড বা অন্য যে কোন স্থানে যে কোন চুক্তিই বাস্তবায়িত হোক না কেন, অথবা

- ইহুদী রাষ্ট্রের চূড়ান্ত পৃষ্ঠপোষক এবং রক্ষাকর্তা হিসেবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের স্থলাভিষিক্ত মার্কিন সিনেট বা প্রতিনিধি পরিষদে যে প্রস্তাবই পাশ করা হোক না কেন, অথবা
- বিশ্ব সরকারের মর্যাদা দাবীকারী, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ বা সাধারণ পরিষদে যে প্রস্তাবই গৃহীত হোক না কেন।

ভয়ঙ্কর ধর্ম-বিমুখতা, অবক্ষয় ও নির্যাতন দ্বারা বর্তমানে দূষিত 'পবিত্রভূমির' পটভূমিতে জেরুজালেমের শেষ অধ্যায় এখন স্পষ্টতই দৃশ্যমান। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে, ইসরাঈল রাষ্ট্রের রাজনৈতিক 'শির্ক' এবং এর অর্থনীতির 'সুদ' বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা এসবের কিছু কিছু ব্যাখ্যা করেছি। এটা ইসরাঈলের নিয়তি যে, সে আল্লাহ্ প্রদত্ত ঐ একই শাস্তি লাভ করবে যা সে ইতিপূর্বে দুই বার ভোগ করেছে। প্রথম আল্লাহ্-প্রদত্ত শাস্তি এসেছিল ব্যাবিলনীয় বাহিনী রূপে, যা ইসরাঈলকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। দ্বিতীয়বার তা ছিল রোমান বাহিনী। তৃতীয় এবং শেষবার তা হবে মুসলিম বাহিনী, যা ঐ ইহুদী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে দেবে।

জেরুজালেমে তাঁর অলৌকিক যাত্রাকালে, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে যে সমস্ত ঐশ্বরিক 'নিদর্শন' দেখান হয়েছিল, জেরুজালেমের শেষ অধ্যায় সম্বন্ধে তাঁকে অবহিত করা ছিল তার মধ্যে অন্যতম। এই ব্যাপারটা মনে হয় Daniel Pipes-এর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

ঐ অলৌকিক যাত্রাকালে শেষ নবী (সাঃ) 'শেষ যুগ' অবলোকন করেছিলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সে যুগে তিনি 'পবিত্রভূমিতে' ইহুদীদের প্রত্যাবর্তন দেখেন। তিনি ভণ্ড ইসরাঈল রাষ্ট্রের জন্ম দেখেন এবং স্রষ্টা-বিমুখতা, অবক্ষয় ও ভয়ঙ্কর নির্যাতন পীড়িত 'পবিত্রভূমি'র রূপ দেখেন। তিনি মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন দেখেন এবং এক মুসলিম বাহিনী কর্তৃক ইসরাঈলের ধ্বংস দেখেন। আর প্রকৃত মসীহ্ যখন ফিরে আসবেন এবং 'পবিত্রভূমিতে' ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মের সত্য, সুবিচার ও সদাচার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন, তাও তিনি দেখেন [বা তাঁকে দেখানো হয়েছিল]।

সপ্তম অধ্যায়

জেরুজালেম থেকে মক্কার দিকে মুখ ফেরানো

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَـٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾

"তারা কি এই উদ্দেশ্যে ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ করবে না, যাতে তারা জ্ঞান আহরণকারী হৃদয় এবং শ্রবণ শক্তিসম্পন্ন কানের অধিকারী হতে পারে?
"বস্তুতঃ চোখ তো অন্ধ হয় না, কিন্তু বক্ষস্থিত অন্তরই অন্ধ হয়।"

(কুর'আন, সুরা হাজ্জ ২২:৪৬)

(তারা যদি পৃথিবীর উপর ভ্রমণ করে দেখে, তাহলে হয়ত তাদের মৃত হৃদয় পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে, আর ঐ সব হৃদয় ও মন যখন অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সজীব হয়ে উঠবে তখন তারা প্রজ্ঞা লাভ করতে পারবে, এবং তাদের কর্ণসমূহ একইভাবে শুনতে পারবে, অর্থাৎ অন্তর দিয়ে শুনতে পারবে। আসলে তাদের চোখসমূহ যে অন্ধ তা নয়, বরং তাদের বক্ষে অবস্থিত হৃদয়ই অন্ধ হয়ে গেছে)।

ইহুদীদের ধর্মীয় পণ্ডিতগণ তাদের ধর্ম-বিশ্বাসের সারবস্তু হিসাবে 'পবিত্রভূমি'-কে, জেরুজালেম শহর এবং সুলায়মান (আঃ) নির্মিত উপাসনালয় হিসাবে চিহ্নিত করেন। ঐ বিশ্বাসের পথ ধরেই তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে যতক্ষণ না ইহুদীরা এক মুক্ত 'পবিত্রভূমিতে' ফিরে যাবে, পবিত্র জেরুজালেমকে রাজধানী করে ইসরাঈল রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে, এবং সুলায়মান (আঃ)-এর উপাসনালয় পুনর্নির্মাণ করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইহুদী ধর্ম অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। যায়োনিযমের অবশ্য ঐ ভূমি, শহর বা উপাসনালয়ের সাথে কোন পবিত্র বন্ধন ছিল না। ঐসব বিষয়ের সাথে যায়োনিযমের সম্পর্ক হচ্ছে নিছক রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, ধর্মনিরপেক্ষ এবং জাতীয়তাবাদী। যেহেতু ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ সবসময়ই পরিবর্তনশীল ধর্মনিরপেক্ষ জগতের সাথে তাল মিলিয়ে চলার উদ্দেশ্যে পরিবর্তিত হতে থাকে, সেহেতু সেসব মূল্যবোধ সবসময়ই আপেক্ষিক, মৌলিক নয়। আর সেহেতু, 'পবিত্রভূমি' জেরুজালেম শহর এবং ঐ উপাসনালয়ের সাথে যায়োনিযম এবং ইউরো-ইহুদীদের সম্পৃক্ততা সব সময়ই প্রয়োজন অনুযায়ী, এবং সময়ের দাবী অনুযায়ী, পবির্তনশীল। কিন্তু ইহুদী ধর্মীয়

পণ্ডিতগণের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব নয়, যারা উপরে উল্লেখিত মৌলিক বিশ্বাসের প্রতি বিশ্বস্ত ও সংকল্পবদ্ধ।

অপরপক্ষে কুর'আন ঘোষণা করেছে যে, ধর্মের সারবস্তু নিহিত রয়েছে 'ঈমানের' (এবং সদাচারের) মাঝে; আল্লাহ্ তা'আলায় বিশ্বাস, তাঁর রাসূলগণে বা নবীগণে বিশ্বাস, পুনরুত্থান ও [শেষ] বিচারে বিশ্বাস, বেহেশ্ত ও দোজখে বিশ্বাস ইত্যাদি। আল্লাহ্ তা'আলা হচ্ছেন [একমাত্র] নিরঙ্কুশ সত্য। 'ঈমান'-এর আবাসস্থল হচ্ছে মানুষের হৃদয়। যখন 'ঈমান' অর্জিত হয়, তখন 'সত্য' হৃদয়ে প্রবেশ করে। আল্লাহ্ তা'আলা একটা দেশ, শহর বা উপাসনালয়ের চেয়ে অনেক বড়। "*আমার আকাশ মণ্ডলী এবং আমার ধরণী, আমাকে ধারণ করার জন্য অত্যন্ত ক্ষুদ্র [বা অপ্রতুল]। কিন্তু আমার মুমিন বান্দার হৃদয়, আমাকে ধারণ করতে পারে।*" (হাদীসে কুদসী)

যখন শেষ নবী (সাঃ) পৃথিবীতে আসলেন, ইহুদী পণ্ডিতগণ তাঁকে আনুষ্ঠানিক ভাবে নবী হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অক্ষমতা দেখান। ধর্মের 'বাহ্যিক রূপ'-এর প্রতি তাদের অতিরিক্ত আসক্তি এবং ধর্মের 'আভ্যন্তরীণ সারবস্তু'র সম্বন্ধে তাদের অপর্যাপ্ত মনোযোগই এর মূল কারণ ছিল। মুহাম্মদ (সাঃ) একজন আরব ছিলেন, অর্থাৎ ইহুদী ছিলেন না; তারা যুক্তি দেখাল যে, এজন্যই তিনি ইহুদীদের জন্য নবী হতে পারেন না। হিজাযী শহর ইয়াসরিবে [মদীনায়] ইহুদীদের মাঝে তার আগমনের পর, তিনি ইহুদীদের সাথে তাদের [প্রথা অনুযায়ী] নির্দিষ্ট দিনসমূহে রোযা রেখেছেন এবং 'তৌরাতের' নিয়ম অনুযায়ী রোযা রেখেছেন (সূর্যাস্ত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত)। তিনি তাঁর নামাযও আদায় করেছেন জেরুজালেমের দিকে মুখ করে। এভাবে সতের মাস অতিবাহিত হবার পরে পরিস্কার হয়ে উঠল যে, ইহুদীরা মুহাম্মদ (সাঃ)-কে আল্লাহ্ তা'আলার একজন নবী হিসেবে এবং কুর'আনকে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী হিসেবে মানতে অস্বীকার করেছে; শুধু তাই নয়, তারা মুসলিম সম্প্রদায়ের একতা ও ক্ষমতাকে ধ্বংস করার জন্য ষড়যন্ত্র করে চলেছে। তখন আর অপেক্ষা না করে, আল্লাহ্ তা'আলা রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জেরুজালেমের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে, মক্কার দিকে মুখ করে নামায পড়তে আদেশ দিলেন।

কিব্লার এই পরিবর্তন, ইহুদীদের অনেক সমালোচনাসূচক মন্তব্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেহেতু তারা বিশ্বাস করত যে জেরুজালেমের সাথে ধর্মের সারবস্তুর একটা যোগসূত্র রয়েছে, এই পরিবর্তনকে তারা তাদের জন্য অপমানসূচক বলে মনে করল। তাদের সমালোচনাকে অবজ্ঞা করে কুর'আন তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল:

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ

قُل لِّلَّـــهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾

"এখন নির্বোধেরা বলবে, কিসে মুসলমানদের ফিরিয়ে দিল তাদের ঐ কিবলা থেকে, যার উপর তারা ছিল?

"আপনি বলুন: পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই; তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে চালান।"

(কুর'আন, সুরা বাক্বারা ২:১৪২)

ধর্ম-বিশ্বাসের কেন্দ্র বিন্দুতে জেরুজালেম অবস্থিত, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের কাছে ইহুদীরা এমন ভাবে জিম্মি যে তারা মনে করে কিছুতেই এর পরিবর্তন ঘটবে না। কুর'আন ঘোষণা করে:

وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ۚ

"যদি আপনি আহ্‌লে-কিতাবদের কাছে সমুদয় নিদর্শন উপস্থাপন করেন, তবুও তারা আপনার কিবলা মেনে নেবে না...।"

(কুর'আন, সুরা বাক্বারা ২:১৪৫)

সবশেষে, কুর'আন এমন এক ঘোষণার মাধ্যমে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে যা এই মিথ্যা বিশ্বাসকে নির্মূল করে দেয় যে, ইব্রাহীম (আঃ) এর ধর্মের প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে জেরুজালেম শহর এবং সেই উপাসনালয়:

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَـــٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّـــهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ
أُولَـــٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَـــٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

"সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে,

"বরং বড় সৎকাজ হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহ্‌র উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর, কিতাবের উপর, এবং রাসূলগণের উপর;

"আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকীন, মুসাফির

"আর ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে; আর যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী

"এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণকারী,

"তারাই হল সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই পরহেযগার।"

(কুর'আন, সুরা বাক্বারা ২:১৭৭)

আর তাই মুসলিমদের জেরুজালেম থেকে মক্কার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার এই ঘটনা থেকে, ইসলামের বিরুদ্ধে, কারো কোন নেতিবাচক নিহিতার্থ আবিষ্কার করা উচিত নয়। শুধু এই ঘটনা থেকে এটুকুই বুঝতে হবে যে, যারা ধর্মের সারবস্তু কোন ভৌগোলিক অবস্থানে নিহিত বলে মনে করেন, কুর'আন এখানে তাদের শুধরে দেয়ার চেষ্টা করেছে। ইহুদীদের প্রতি কুর'আনের বাণী অত্যন্ত পরিস্কার। ইহুদীদের অবগত করা হল যে, যদিও মুহাম্মদ (সাঃ) একজন ইহুদী ছিলেন না, এবং যদিও তিনি আর জেরুজালেম মুখী হয়ে নামায পড়ছিলেন না, এবং যদিও তিনি জেরুজালেমকে মুক্ত করার কোন চেষ্টা কখনো করেননি, তবুও তিনি ইব্রাহীম (আঃ)-এর আল্লাহ্‌র একজন সত্যিকার নবী, আর তিনি যে ধর্ম প্রচার করে যাচ্ছিলেন তাও ইব্রাহীম (আঃ), মূসা (আঃ), দাউদ (আঃ), সুলায়মান (আঃ) এবং মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ)-এর সত্য ধর্ম! আর তাই একগুঁয়ে ইহুদীদের জন্য, যারা জেদ ধরেছিল যে, জেরুজালেমই হচ্ছে ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মের আধ্যাত্মিক প্রাণকেন্দ্র, কিব্‌লা পরিবর্তন ছিল একটা সতর্কবাণী ।

জেরুজালেমের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার ফলে যদি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ বর্ষিত না হয়, তবে এর নিহিতার্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, একজন 'সত্য' নবী জেরুজালেম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার পরও 'সত্য' নবীই থাকেন। জেরুজালেম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার জন্য, তিনি যে শুধু কোন শাস্তি পেলেন না তাই নয়, তিনি নিশ্চিতভাবে ইহুদীদের পরাজিতও করলেন, যারা জেদ সহকারে বলত যে তারা ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতার বাছাইকৃত জনগোষ্ঠী।

আর তাই এটা স্পষ্ট যে, কিব্‌লার পরিবর্তন থেকে, এমন কোন রাজনৈতিক অনুসিদ্ধান্তে পৌছানোর উপায় নেই যে, [ঐ ঘটনার পর] জেরুজালেমের সাথে ইসলাম ধর্মের আর কোন বন্ধন রইল না, বা জেরুজালেমের উপর ইসলামের আর কোন দাবী রইল না। বরং পক্ষান্তরে কুর'আন নিশ্চিত করে যে, মুহাম্মদ (সাঃ) এবং যারা তাঁকে অনুসরণ করে, তারাই হচ্ছে ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মের সত্যিকার অনুসারী:

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَـٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۗ
وَاللَّـهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾

"মানুষদের মধ্যে যারা ইব্রাহীমের অনুসরণ করেছিল তারা, আর এই নবী (অর্থাৎ মুহাম্মদ (সাঃ)) এবং যারা এ নবীর প্রতি ঈমান এনেছে তারা ইব্রাহীমের ঘনিষ্টতম:

"আর আল্লাহ্ হচ্ছেন মুমিনদের বন্ধু।"

(কুর'আন, সুরা আলে 'ইমরান ৩:৬৮)

কুর'আনের এই ঘোষণার নিহিতার্থ বেশ স্পষ্ট। যারা মুহাম্মদ (সাঃ)-কে বিশ্বস্ততার সাথে অনুসরণ করবে, 'পবিত্রভূমির' উত্তরাধিকার তাদেরই প্রাপ্য। এই সত্য নিশ্চিত করবে জেরুজালেমের শেষ অধ্যায়।

ইহুদীদের জন্য আল্লাহর করুণা লাভের শেষ সুযোগ

কিব্‌লা পরিবর্তনের ঘটনার মাঝে উপরে যা কিছু বর্ণিত হল তার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ আরও কিছু ইঙ্গিত রয়েছে।

যখন মূসা (আঃ) সিনাই পাহাড়ের উপর গেলেন, ইহুদীরা 'সোনার তৈরী গো-শাবক' পূজা করেছিল; এবং আল্লাহ্ যা 'হারাম' করেছিলেন, তাকে 'হালাল' করতে গিয়ে তৌরাত পরিবর্তন করে পুনরায় লিখেছিল; আর মরিয়ম তনয় 'মসীহ্'-কে কিভাবে হত্যা করেছিল, সে কথা গর্বভরে বর্ণনা করেছিল — তখন এসব ঘটনা, আল্লাহ্‌র সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকারের বারংবার ভঙ্গের জঘন্যতম উদাহরণ হয়ে দাঁড়ায়। এসব জঘন্য পাপপূর্ণ কাজের প্রতিক্রিয়া হিসেবে আল্লাহ্ এই ঘোষণা দেন যে তাদের জন্য 'একটা শেষ সুযোগ' রয়েছে, যার মাধ্যমে তারা, আল্লাহ্ তাদের জন্য 'সর্বকালের সবচেয়ে কঠোর যে শাস্তি' নির্ধারিত করে রেখেছেন, তা থেকে বাঁচতে পারে। সেই সুযোগ [তাদের সামনে এসে] ছিল আরব নবী মুহাম্মদ (সাঃ) [এর রূপ ধরে], যিনি ছিলেন সর্বশেষ নবী। তারা যদি তাঁকে গ্রহণ করত এবং তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করত, তাহলে তারা আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও করুণা লাভ করতে পারত। এই [ক্ষমার] অঙ্গীকার কুর'আনের নিম্নলিখিত অংশে নথিভুক্ত রয়েছে, যেখানে আল্লাহ্ ইহুদীদেরকে সম্বোধন করেছেন — যারা ইতোমধ্যেই তৌরাত এবং ইঞ্জীল দু'টোই হাতে পেয়েছে, অর্থাৎ ইঞ্জীল নাযিল হবার পরই এই কথা বলার ক্ষেত্র তৈরী হয়েছিল। তাদের জঘন্য পাপ এবং আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গের ঘটনা সমূহের প্রতি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আল্লাহ্ বলছেন:

قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۖ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ
فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ
يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ
فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ
أُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

"...তিনি বলেন: আমার শাস্তি নিয়ে, আমি যার সাথে ইচ্ছা সাক্ষাৎ করি, কিন্তু আমার করুণা সবার জন্য বিস্তৃত।

"সেটা (করুণা) আমি তাদের জন্য লিখে দেব যারা ভয় করে এবং যাকাত দান করে ও যারা আমাদের আয়াতসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করে।

"যারা এই রাসূলের আনুগত্য অবলম্বন করে, যিনি নিরক্ষর নবী, যাঁর কথা তাদের নিজস্ব (কিতাবসমূহ) তৌরাত ও ইঞ্জীলে উল্লেখিত দেখতে পায়,

"কারণ তিনি তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দেন ও মন্দ কাজে নিষেধ করেন; তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন এবং হারাম বস্তুসমূহ নিষিদ্ধ করেন;

"এবং তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দীত্ব অপসারণ করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল।

"সুতরাং, যারা তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তাঁকে সম্মান করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে, এবং তার কাছে যে নূর অবতীর্ণ হয়েছে তা অনুসরণ করেছে,

"তারাই সমৃদ্ধি লাভ করবে।"

(কুর'আন, সুরা আ'রাফ ৭:১৫৬-১৫৭)

এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, কুর'আনের (উপরোক্ত) অংশে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কথা বলা হয়েছে।

হিজরতের পরিণতিতে যখন রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনায় পৌঁছালেন, ইহুদীদের জন্য তখনও "শেষ সুযোগের দ্বার" উন্মুক্ত ছিল। তারা যদি তাঁকে গ্রহণ করত এবং তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করত, তাহলে তারা আল্লাহ্‌র করুণা লাভ করতে পারত। কিন্তু তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলে, সেই "শেষ সুযোগের দ্বার" যে রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্‌র শাস্তি শুরু হয়ে যাবে, এটাই তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হল। সমগ্র ইহুদী ইতিহাসে এটা ছিল এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। আকাশমণ্ডলী যখন এই নাটকীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিল, সময় তখন নিশ্চয়ই থমকে দাঁড়িয়েছিল।

রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন মদীনায় পৌঁছালেন, তখন তিনি বেশ কিছু পদক্ষেপ নিলেন যা, ইহুদীদের এবং তাদের র‍্যাবাইদের এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করার কথা যে তিনি

আসলে আল্লাহ্‌র সত্যিকার নবী ছিলেন; তারা যার আগমনের অপেক্ষায় ছিল, তিনি সেই নবীই ছিলেন। তাঁর মদীনায় অবস্থানের প্রথম ১৭ মাসব্যাপী তিনি জেরুজালেমের দিকে মুখ করে নামায পড়লেন। তিনি তা করলেন কেননা ইহুদীরা ঐ কিব্‌লার দিকে মুখ করে নামায পড়ত; অর্থাৎ যারা ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্ম অনুযায়ী এবাদত করত, তাদের জন্যে সেটাই ছিল কিব্‌লা। কিন্তু একজন আরব যখন মদীনায় দাঁড়িয়ে সেটা করবে, তখন তাকে কাবার দিকে, অর্থাৎ মক্কায় অবস্থিত আল্লাহ্‌র প্রধান গৃহ যা প্রতিটি আরবের শ্রদ্ধার বস্তু, সেদিকে পেছন ফিরে দাঁড়াতে হবে। তবু রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) তাই করলেন। তাঁর ঐ কাজই ইহুদীদেরকে এই নিশ্চয়তা দানের জন্য যথেষ্ট ছিল যে, তিনি আসলেই সত্যিকার নবী ছিলেন। কিন্তু তিনি তার চেয়েও বেশী কিছু করেছিলেন [যা থেকে ইহুদীরা আরও নিশ্চিত হতে পারত]। তিনি ইহুদীদের সাথে সাথে রোযাও রাখলেন, ঠিক ঐ সকল দিনে, যে সকল দিনে তারা রোযা রাখত, এবং তাও তৌরাতের নিয়ম অনুযায়ী (অর্থাৎ সূর্যাস্ত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত)। গোটা ইতিহাসে কোন আরব, ঐ ধরনের রোযা এর আগে আর কখনো রাখেনি। কিন্তু মদীনার সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় তখন ঐ নিয়মে রোযা রেখেছিল। এ ব্যাপারটাও ইহুদীদের নিশ্চয়তা দেয়ার কথা ছিল, যে মুহাম্মদ (সাঃ) আসলেই একজন সত্যিকার নবী। সবশেষে এমন একটা ঘটনা ঘটে, যা ইহুদীদের সকল সংশয় চিরতরে দূর করে দেয়ার কথা ছিল। ইহুদীরা, পরস্পরের সাথে বিবাহিত নয়, এমন নারী-পুরুষের মধ্যে যিনার (যৌন সম্পর্ক) দায়ে অভিযুক্ত দু'জনকে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে নিয়ে আসে। এদের নিয়ে কি করা হবে, তা জানতে চেয়ে তারা [আসলে] তাঁকে পরীক্ষা করতে চাইছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন তাদের নিয়মে এদের কি শাস্তি হয়? তারা উত্তর দিল যে তাদের নিয়মে এদের মুখে কালি মেখে তারপর তাদেরকে জনসমক্ষে প্রহার করার কথা। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে ঐ শাস্তি তারা তাদের 'কিতাবে' উল্লেখিত পেয়েছে কিনা। তিনি তাদের তখন তাদের 'কিতাব' নিয়ে এসে তা থেকে [ঐ নিয়ম সংক্রান্ত অংশ] পড়তে বললেন (তিনি নিজে যেহেতু পড়তে বা লিখতে জানতেন না)। তারা যখন তৌরাত থেকে [সংশ্লিষ্ট] অংশ পড়ে যাচ্ছিল, তখন তাদের প্রাক্তন র‍্যাবাই আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে সালাম, যিনি ইতোমধ্যে মুসলিম হয়ে গিয়েছিলেন, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পাঠক যখন তৌরাতের 'রজম' (পাথর বর্ষণে মৃত্যু) সংক্রান্ত অংশে পৌঁছে, তখন সে ঐ বাক্যটির উপরে তার আঙ্গুল রেখে, তা লুকাতে চেষ্টা করে। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে সালাম তখন তাকে থামতে এবং তার আঙ্গুল উঠাতে আদেশ করেন। তখন তাকে 'রজম' সংক্রান্ত বাক্যটি পড়তে হয়, যেখানে সেটাকে 'যিনার' শাস্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বাক্য পড়ে শোনানোর ঘটনাটি ইহুদীদের জন্য যথেষ্ট লজ্জাজনক একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। নিজেদের ধর্মীয় বিধানের সাথে প্রতারণা করে এবং সেই প্রতারণাকে লুকানোর চেষ্টা করে ইহুদীদের আসল চেহারা ধরে পড়ে যায়। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) তখন আদেশ দিলেন যে, ঐ দুই অভিযুক্তকে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হোক,

আর এর মাধ্যমে তিনি ইহুদী আইন প্রয়োগ করলেন, যা তারা নিজেরাই প্রয়োগ করছিল না। এই ঘটনা ইহুদীদেরকে পূর্ণভাবে নিশ্চিত করার কথা যে তিনি অবশ্যই একজন সত্য নবী ছিলেন।

নবী (সাঃ)-এর মদীনায় আগমনের পর যখন ১৭ মাস কেটে গেল, তখন এটা পরিস্কার হয়ে উঠল যে, ইহুদীরা যে কেবল তাঁকে একজন নবী হিসেবে বা কুর'আনকে আল্লাহ্‌র বাণী হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেছে তাই নয়, উপরন্তু তারা ইসলামকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে রত। এরকম একটা সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা কিব্‌লা পরিবর্তন করলেন (অর্থাৎ জেরুজালেম থেকে মুখ ফিরিয়ে মক্কার দিকে ঘুরে দাঁড়ানোর আদেশ দিলেন!)। এছাড়া 'যুদ্ধ' (ক্বিতাল) এবং 'রোযা' (সওম)-কে বাধ্যতামূলক করে তিনি ওহী পাঠালেন! তিনটি বিধানের সব ক'টিই নাযিল হয় আরবী 'শা'বান' মাসে। কিন্তু রোযার ঘোষণা দিতে গিয়ে, আল্লাহ্ তা'আলা রোযার নিয়মাবলীকে তৌরাত থেকে ভিন্ন করে দিলেন। নতুন নিয়ম অনুযায়ী 'ঊষা' থেকে 'সূর্যাস্ত' পর্যন্ত সিয়াম-সাধনা করা বাধ্যতামূলক হয়ে গেল। সেই সাথে রাতের সময় পানাহার ও যৌন সংসর্গে কোন বাধা থাকল না। সবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা 'যিনার' শাস্তির নিয়ম পরিবর্তন করে দেন। নতুন নিয়মে তা হল জনসমক্ষে বেত্রাঘাত!

ঐ সমস্ত নিয়মের পরিবর্তন সাধনের প্রথম নিহিতার্থ হচ্ছে এই যে, ইহুদীদের নিয়ম বা আইন তখন আর বহাল থাকল না। ঐ আইনের আর কোন প্রয়োগ-যোগ্যতা (operational validity) রইল না।

আরো কিছু কাল পরে, এর চেয়েও বেশী ভয়ঙ্কর আরেকটা তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে উঠল, যখন রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে একটি স্বপ্নে বা দিব্যদৃষ্টিতে দেখান হল যে, 'ইয়াজুজ-মাজুজ'-কে ছেড়ে দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। তিনি নাটকীয়ভাবে ভণ্ড-'মসীহ্' 'দাজ্জালের' মুক্ত হয়ে যাবার কথাও নিশ্চিত করলেন, যখন তিনি ওমর (রাঃ)-এর সাথে ইহুদী বালক ইব্‌নে সাইয়াদকে দেখতে গেলেন, যাকে ওমর (রাঃ) 'দাজ্জাল' বলে সন্দেহ করেছিলেন। 'দাজ্জালকে' যে তখন ইতোমধ্যেই পৃথিবীতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, এ বিষয়টা তখনই পরিস্কার করে দেয়া হল যখন ওমর (রাঃ) ইব্‌নে সাইয়াদের শিরচ্ছেদ করার জন্য রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অনুমতি চাইলেন এবং রাসূল (সাঃ) অনুমতি না দিয়ে বললেন: *"সে যদি দাজ্জাল হয় তাহলে তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না, আর সে যদি দাজ্জাল না হয়, তবে তাকে হত্যা করাটা পাপ হবে।"*

তখন যদি 'দাজ্জাল' এবং 'ইয়াজুজ-মাজুজ' মুক্ত হয়ে থাকে, তবে এর নিহিতার্থ হবে এই যে, 'শেষ যুগ' বা 'ফিত্‌নার যুগ', রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জীবদ্দশায়ই 'কিব্‌লা' পরিবর্তনের পর পর শুরু হয়ে গিয়েছিল। **আল্লাহ্‌র ক্ষমা লাভ করার শেষ**

সুযোগের দ্বার তখন ইহুদীদের জন্য চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় এবং এখন সবচেয়ে কঠোর ঐশ্বরিক শাস্তি শুরু হবার পালা (দ্বাদশ অধ্যায়ের ৭নং উপ-শিরোনাম দেখুন)।

আর কখনই ইহুদীরা 'পবিত্রভূমির' উত্তরাধিকারের যোগ্যতা লাভ করবে না। অবশ্য যখন চারিদিকে 'ইয়াজুজ-মাজুজ' ছড়িয়ে পড়েছে এবং 'ইয়াজুজ-মাজুজের' বিশ্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী পৃথিবী নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, তখন তাদের শেষবারের মত সেখানে ফিরে আসার কথা এবং সেখানকার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার কথা। কিন্তু তা হবে এক বিশাল ঐশ্বরিক পরিকল্পনার অংশ বিশেষ, যার মাধ্যমে ইহুদীদের উপর সর্বকালের কঠোরতম ঐশ্বরিক শাস্তি নেমে আসবে।

অষ্টম অধ্যায়

সত্য-মসীহ্ ঈসা, এবং ভণ্ড-মসীহ্ দাজ্জাল

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ
وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾

"আমি ঘুরিয়ে দিব তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে, যেমন তারা এর প্রতি প্রথমবার বিশ্বাস স্থাপন করেনি
"এবং আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদ্ভ্রান্ত ছেড়ে দিব।"
(কুর'আন, সুরা আন'আম ৬:১১০)

{অর্থাৎ, আমরা এই বাণীর পূর্ববর্তী প্রত্যাখ্যানের পরিণতি স্বরূপ — যার মধ্যে কুমারী মরিয়মের পুত্র মসীহ্কে প্রত্যাখ্যান করা ছিল অন্যতম — তাদের ইহুদী হৃদয় ও চোখকে বিভ্রান্ত করে রাখব}।

ঈসা মসীহ্ (আঃ)

আল্লাহ্ তা'আলার নবীগণ বনী ইসরাঈলকে এক ঐশ্বরিক অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবহিত করেছিলেন যে, আল্লাহ্ তাদের কাছে এমন একজন নবী পাঠাবেন, যিনি 'মসীহ্' বলে পরিচিত হবেন এবং যিনি 'রাজা দাউদ' (আঃ)-এর সিংহাসন থেকে পৃথিবীর উপর শাসন করবেন। এই তথ্য আসলে, সুলায়মান (আঃ)-এর সময় স্বর্ণযুগের প্রত্যাবর্তনের ভবিষ্যতবাণী ছিল।

বাইবেলে নবী নাথন রাজা দাউদ (আঃ)-কে 'মসীহ্' সম্বন্ধে বলেন এবং তাকে 'দাউদের পুত্র' বলে অভিহিত করেন:

"আর এমন হবে যে, তোমার সময় যখন শেষ হয়ে আসবে এবং তোমাকে যখন তোমার পূর্ব-পুরুষদের কাছে চলে যেতে হবে, তখন আমি তোমার বংশধরদের ভিতর থেকে, তোমার পরে এমন একজনকে বেছে নেব যে তোমার পুত্রদের একজন হবে এবং আমি তার রাজত্ব কায়েম করব। সে আমার জন্য একখানা গৃহ তৈরী করবে, এবং আমি তার সিংহাসনকে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত করব। আমি তার পিতা হব আর সে আমার পুত্র হবে: এবং আমি তার উপর থেকে আমার দয়া প্রত্যাহার করে নেব না, যেমনটা তোমার পূর্বে যে ছিল তার বেলায় আমি প্রত্যাহার করেছিলাম: কিন্তু আমি তাকে

আমার গৃহে এবং আমার রাজত্বে চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত করব, এবং তার সিংহাসনও চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে।"

(বাইবেলের পুরাতন নিয়ম, ১ খান্দাননামা ১৭:১১-১৫)

বহু বছর পরে ইসাইয়া (Isaiah) এর সাথে নিম্নলিখিত বক্তব্য যোগ করেন:

"আমাদের মাঝে যখন এক সন্তান জন্ম নেবে, আমাদেরকে যখন এক পুত্র দান করা হবে: যাঁর কাঁধে শাসনভার ন্যস্ত হবে (অর্থাৎ তিনি পৃথিবী শাসন করবেন): এবং তার নাম হবে "চমৎকার", "পরামর্শদাতা", শক্তিশালী বিধাতা, চিরস্থায়ী পিতা, শান্তির রাজপুত্র।

"দাউদ (আঃ)-এর সিংহাসনের উপর এবং রাজত্বের উপর তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হবে, এবং সেখানে তার শাসনকালের ও শান্তির কোন শেষ থাকবে না (অর্থাৎ তিনি চিরকালের জন্য পৃথিবী শাসন করবেন)। সকলের প্রভুর একান্ত ইচ্ছা বলেই এটা সংঘটিত হবে।"

(বাইবেলের পুরাতন নিয়ম, ইসাইয়া ৯:৬-৭)

'মসীহ্' সম্পর্কে ইয়ারমিয়া (Jeremiah) বলেন: *"... তিনি হবেন দাউদ (আঃ)-এর বংশে একটা ন্যায়বান চারা।"*

(বাইবেলের পুরাতন নিয়ম, ইয়ারমিয়া ২৩:৫)

ইসাইয়া তাঁর সম্বন্ধে আরো লিখেছেন:

"চেয়ে দেখ আমার দাস, যার মাঝে আমারই আত্মা উদ্ভাসিত: আমি তার ভিতর আমার 'রূহ্' (spirit) ভরে দিয়েছি: সে অ-ইহুদীদের বিচার করবে।

"সে কাঁদবে না বা চিৎকার করবে না বা রাস্তায় তার কণ্ঠস্বর শোনাবে না।

"একটা ক্ষত গাছের ডগা সে ভাঙ্গবে না, এবং জলন্ত শণকে সে নিভিয়ে দিবে না: সে কেবল সত্যের উপর ভিত্তি করে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করবে।

"সে বিফল হবে না বা তাকে নিরাশও করা যাবে না, যতক্ষণ না সে ভূ-পৃষ্ঠে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করবে: এবং দ্বীপপুঞ্জ সমূহ তার আইনের অপেক্ষায় থাকবে।"

(বাইবেলের পুরাতন নিয়ম, ইসাইয়া ৪২:১-৪)

"অ-ইহুদীদের জন্য আমি তোমাকে এক আলো স্বরূপ পাঠাব, যেন তোমার মধ্য দিয়ে সারা দুনিয়ার লোক নাজাত পায়।"

(বাইবেলের পুরাতন নিয়ম, ইসাইয়া ৪৯:৬)

আর রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) ঘোষণা করেছেন যে তিনি অর্থাৎ 'মসীহ্' হবেন 'হাকিমুন আদিল' (পৃথিবীর এক সুবিচারক শাসনকর্তা):

"আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বলেন: যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ যে, মরিয়মের পুত্র শীঘ্রই তোমাদের মাঝে একজন সুবিচারক

হিসেবে আবির্ভূত হবেন। তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন এবং শুকরদের হত্যা করবেন এবং জিযিয়া কর (ইসলামের রাজ্যে ইহুদী ও খৃস্টানদের উপর আরোপিত এক ধরনের কর) অবলুপ্ত করবেন। তখন অর্থের প্রাচূর্য্য বিরাজ করবে এবং কেউ দান-খয়রাত গ্রহণ করবে না।"

(সহীহ্ বুখারী)

মসীহ্র দু'টো পরস্পর বিরোধী জীবন বর্ণনা

এই অঙ্গীকারকৃত মসীহ্র [আগমনের] সংবাদ লাভ করে ইহুদীরা খুবই আনন্দিত হয়েছিল। কিন্তু তারা এ ব্যাপারটাতে একটু বিভ্রান্ত হয়েছিল যে, তাঁর সম্বন্ধে দুই ধরনের বর্ণনা ছিল, যা থেকে তাঁর এবং তাঁর মিশনের দু'টো পরস্পর বিরোধী চিত্র ফুটে উঠেছিল। প্রথম চিত্রটি ছিল এক বিজয়ী রাজার, যিনি 'আল্লাহ্র বাছাইকৃত জনগোষ্ঠীকে' (যা তখনকার জন্য ছিল ইহুদী জনগোষ্ঠী) 'পবিত্রভূমিতে' পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন এবং সারা পৃথিবীকে শান্তি সহকারে শাসন করবেন। দ্বিতীয় চিত্রটি ছিল এক মসীহ্র, যিনি বিনয়ী ও কষ্ট পীড়িত। আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী এই দুটি চিত্রই ইসাইয়ার বর্ণনায় পরিস্কারভাবে ফুটে উঠেছে যিনি মসীহ্কে 'প্রভুর দাস', সমৃদ্ধশালী, এবং উচ্চ আসন লাভকারী বলে বর্ণনা করেছেন:

"লক্ষ্য কর, আমার দাস প্রজ্ঞার সাথে আচরণ করবে, সে উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে এবং প্রশংসিত হবে এবং তার অবস্থান অনেক উঁচুতে থাকবে।"

(বাইবেলের পুরাতন নিয়ম, ইসাইয়া ৫২:১৩)

কিন্তু তারপর তিনি একই বর্ণনার ধারাবাহিকতায় ঐ দাসকে [অর্থাৎ মসীহ্কে] এমন একজন বলে বর্ণনা করেন যাঁকে এমন ভাবে অপদস্থ করা হবে যে, তাঁকে মানুষ বলেই মনে হবে না, যার চেহারা মলিন ও নোংরা হবে, আর তাই তিনি এমন একজন হবেন যিনি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হবেন আবার নিগৃহীতও হবেন:

"তাঁর চেহারা ও আকার এত বিশ্রী করে দেওয়া হবে যে, তা আর কোন মানুষের মত থাকবে না; সেইজন্য অনেকে তাঁকে দেখে হতভম্ব হবে।"

(বাইবেলের পুরাতন নিয়ম, ইসাইয়া ৫২:১৪)

সাধারণ কল্পনার বাইরে হলেও, ইসাইয়া ভবিষ্যত বাণী করেন যে ঐ 'দাসকে' মুখে এবং পিঠে, উভয়স্থলে আঘাত করা হবে, এবং তাঁর মুখে থুথু ছিটিয়ে তাকে অপমানিত করা হবে (ইসাইয়া ৫০:৪-১১)। ঈসা (আঃ)-এর বেলায় ঠিক এমনটাই ঘটেছিল। নিচে Hal Lindsey বলে একজন খৃস্টানের বর্ণনা দেওয়া হল যিনি বলেছেন যে, ঈসা (আঃ)-এর নিগৃহীত হবার ঘটনা, ইসাইয়া ৫২:১৩ এবং ৫২:১২ এর ভবিষ্যত বাণীকেই প্রমাণিত করে:

"এটা সবার জানা যে, যীশুর সাথে, তার বিরুদ্ধে পরিচালিত ছয়টি অবৈধ বিচারকার্য পরিচালনা কালে এমন ব্যবহারই করা হয়েছিল। Sanhedrin (ইহুদীদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় আদালত) কর্তৃক অভিযুক্ত হবার পর, হেরডের উপাসনাগারের পাহারাদার অফিসারগণ তার মুখে থুথু ছিটিয়ে ছিল। তারপর তারা তাঁর চোখ বেঁধে তাঁর মুখে আঘাত করে। একটা ধারালো কন্টক নির্মিত মুকুট তাঁর মাথায় জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয় এবং একটা রোমান চাবুক দ্বারা তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে চাবকানো হয়। ওটা ছিল কয়েকটা চামড়ার টুকরা দ্বারা গঠিত এক পৈশাচিক চাবুক, যার সাথে, অধিকতর ব্যথা দেয়ার জন্য, হাড় বা ধারালো ধাতবখণ্ড সংযুক্ত করে দেয়া হয়।"

(Hal Lindsey: "The Messiah"
Harvest House Publishers, Oregon, 1982, pp. 108-9)

ইসাইয়া তাঁর বর্ণনায়, ইহুদীদেরকে 'প্রভুর দাসের' নিপীড়নকারী জনগোষ্ঠী হিসেবে সনাক্ত করেছেন। তিনি 'দাস-মসীহ্'কে *"অবহেলিত ব্যক্তি, এবং তাঁর 'জাতি' কর্তৃক ঘৃণিত ব্যক্তি"* বলে বর্ণনা করেন, (ইসাইয়া ৪৯:৭)। Hal Lindsey বলেন যে, ঐ বর্ণনায় 'জাতি' হচ্ছে এক বচন, বহু-বচন নয়, এবং তিনি ঐ অংশের অসৎ [উদ্দেশ্য প্রণোদিত] ভাষান্তরের প্রতিবাদ করেন এভাবে:

"এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক (এবং অসৎ) যে, Revised Standard Version of the Bible এবং Jewish Soncino Commentaries এই অংশের ভাষান্তর করেছে: "তাকে, যাকে 'জাতিসমূহ' ঘৃণা করত" বলে। অনুবাদে 'জাতিসমূহ' বলে বহুবচন ব্যবহার করে এমন একটা ভাব দেখান হয়েছে যে, অ-ইহুদী [Gentiles] জনগোষ্ঠীসমূহই (যাদের সবসময় 'জাতিসমূহ' বলে উল্লেখ করা হয়) বুঝি ঐ 'দাসকে' অবহেলা ও ঘৃণা করে থাকবে। এখানে আরেকটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যে, ঐ 'দাস' হচ্ছে ইসরাঈল এবং তাকে [ঐ রাষ্ট্রকে] অইহুদীরা ঘৃণা করে। ইহুদী ইতিহাসের জন্য এই [ঘৃণা লাভ করার] ব্যাপারটা সত্য হলেও, এই অধ্যায়ের মাধ্যমে তা সত্যায়িত করার উপায় নেই, কেননা, হিব্রুতে 'জাতি' বুঝাতে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে 'goi', এবং এটা হচ্ছে একবচন এবং সৎভাবে অনুবাদ করলে এর অর্থ দাঁড়ায় 'জাতি', যা এই প্রেক্ষিতে কেবল ইসরাঈলকে বুঝানো হয়েছে।" (Lindsey, p. 109).

পক্ষান্তরে King James version of the Bible, এই অংশের সঠিক অনুবাদ করেছে এভাবে:

"লোকে যাঁকে তুচ্ছ করছে ও ঘৃণার চোখে দেখছে, যিনি শাসনকর্তাদের গোলাম, তাঁকে ইসরাঈলের খোদা ও ত্রাণকর্তা এই কথা বলছেন, 'বাদশাহ্‌রা তোমাকে দেখে উঠে দাঁড়াবে, আর রাজপুরুষেরা মাটিতে উবুড় হয়ে তোমাকে সম্মান দেখাবে, কারণ মাবুদ তোমাকে বেছে নিয়েছেন; ইসরাঈলের খোদা বিশ্বস্ত'।"

(বাইবেলের পুরাতন নিয়ম, ইসাইয়া ৪৯:৭)

দাউদ (আঃ) ও সুলায়মান (আঃ) কর্তৃক প্রথমে যে শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আরো একজন দ্বারা সেই শাসনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ভবিষ্যতবাণী তৌরাতের প্রথম পুস্তক "পয়দায়েশের" (Genesis) মত প্রাচীন যুগের বর্ণনায়ও উল্লেখিত রয়েছে। সেখানে তাঁকে শীলো (Shiloh) বলে বর্ণনা করা হয়েছে:

"(তার পুত্র) জুডার কাছ থেকে 'রাজদণ্ড' যেন হারিয়ে না যায়, 'শাসন দণ্ড' যেন তার দু'পায়ের মধ্যবর্তী পরিসর থেকে সরে না যায়, যতক্ষণ না শীলো আসে এবং জনগোষ্ঠীসমূহ তার অনুগত হয়।"

(তৌরাত, পয়দায়েশ ৪৯:১০)

এই ভবিষ্যতবাণী, কোন্ গোত্র থেকে মসীহ্ আবির্ভূত হবেন কেবল সেটাই নির্দেশ করে নাই, বরং ভবিষ্যতের রাজারা যে জুডার বংশধর হবেন তাও নির্ধারিত করেছে। শীলোকে 'মসীহ্র' এক ব্যক্তিগত উপাধি হিসেবে র‍্যাবাইদের ব্যাখ্যা প্রাচীন কাল থেকে সনাক্ত করে এসেছে এবং এটাও ভবিষ্যতবাণী করেছে যে, তিনি জুডা গোত্র থেকে উদ্ভূত হবেন।

জটিল বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় তখনই যখন কোন এক অজ্ঞাত লিপিকার, ইসাইয়ার পুস্তকের ঘোষণাকে বদলে ফেলেন, এবং লেখেন যে: মসীহ্ যে শুধু একটি শিশু হিসেবে জন্ম নেবেন (সুতরাং একজন মানুষ হবেন) এবং এক পর্যায়ে পৃথিবী শাসন করবেন তাই নয়, বরং তিনি শক্তিশালী বিধাতাও হবেন। ইসাইয়ার বিকৃত পুস্তক তাই মসীহ্কে একাধারে মানুষ এবং বিধাতা দু'ভাবেই চিত্রিত করে:

"আমাদের মাঝে যখন এক সন্তান জন্ম নেবে, আমাদেরকে যখন এক পুত্র দান করা হবে: যাঁর কাঁধে শাসনভার ন্যস্ত হবে: এবং তার নাম হবে 'চমৎকার', 'পরামর্শদাতা', 'শক্তিশালী বিধাতা', 'চিরস্থায়ী পিতা', 'শান্তির রাজপুত্র'।"

(বাইবেলের পুরাতন নিয়ম, ইসাইয়া ৯:৬)

এখন থেকে দুই হাজার বছর আগে আল্লাহ্ তা'আলা তার অঙ্গীকার পূরণ করেছেন, এবং বনী ইসরাঈলের মাঝে মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ) অর্থাৎ মসীহ্কে প্রেরণ করেছেন; তিনি দেখেছেন তারা ধর্মের 'বাহ্যিক' দিকটা আঁকড়ে রয়েছে অথচ দুঃখজনকভাবে 'অন্তর্নিহিত' সারবস্তুকে অবজ্ঞা করে চলেছে। এমনকি বাহ্যিক চেহারাটাও তারা বিকৃত করে ফেলেছে, যেহেতু তারা তা [ধর্মগ্রন্থ] বদলে ফেলেছে এবং নিজেদের সুবিধা মত তা পুনরায় লিপিবদ্ধ করেছে। ঈসা (আঃ) যখন তাদেরকে নিশ্চিত করলেন যে, তিনিই হচ্ছেন সেই প্রতিশ্রুত 'মসীহ্', এবং যখন তিনি নির্ভয়ে ধর্মের 'আভ্যন্তরীণ' সারবস্তু প্রচার করতে লাগলেন এবং [ধর্মের] বাহ্যিক রূপের বিকৃতির নিন্দা করলেন, তখন কিছু কিছু ইহুদী তাঁকে গ্রহণ করল এবং তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করল,

কিন্তু বেশীর ভাগই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল। তারা এখনো, আজ পর্যন্ত তাকে 'মসীহ্' হিসেবে [মানতে] অস্বীকার করে চলেছে। কুর'আন ঘোষণা করে যে, তারা তাঁকে (ক্রুশবিদ্ধ করে) হত্যা করেছে বলে (তখন) গর্ববোধ করত:

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّـهِ

"তারা (গর্বভরে) বলল যে: আমরা মরিয়মের পুত্র, আল্লাহ্র রাসূল ঈসা মসীহ্কে হত্যা করেছি... ।"

(কুর'আন, সুরা নিসা ৪:১৫৭)

তারা যখন তাঁকে নিজেদের চোখের সামনে ক্রুশের উপর 'মৃত্যু' বরণ করতে দেখল, তখন তারা স্থির নিশ্চিত হয়ে গেল যে তিনি একজন ভণ্ড ছিলেন। তারা নিশ্চিত হয়ে গেল যে তিনি 'মসীহ্' হতে পারেন না, কারণ খোদ তৌরাতে একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, ঝুলন্ত অবস্থায় যার মৃত্যু হয়, সে আল্লাহ্ তা'আলার অভিশাপ প্রাপ্ত (তৌরাত, দ্বিতীয় বিবরণ ২১:২৩)। দ্বিতীয়ত আরো যে কারণে তিনি 'মসীহ্' হতে পারেন না, তা হচ্ছে অবিশ্বাসী রোমানদের দখল থেকে পবিত্রভূমিকে মুক্ত না করেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, আর তাছাড়া, তিনি দাউদ (আঃ)-এর সিংহাসন (অর্থাৎ জেরুজালেম) থেকে পৃথিবীর উপর শাসনও করেননি।

আর তাই তারা মসীহ্র আগমনের অপেক্ষা করে রইল। প্রতিটি ইহুদী, যে ঈসা (আঃ)-কে 'মসীহ্' বলে মানতে অস্বীকার করল এবং তারপর থেকে মসীহ্র আগমনের অপেক্ষায় পথ চেয়ে রইল, প্রকারান্তরে সে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করার প্রচেষ্টার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে রইল। এটা এজন্য যে তাদের বিশ্বাস মতে, তাঁর যে মৃত্যু হয়েছে, তার সাথে তিনি যে 'মসীহ্' বলে নিজেকে দাবী করেছিলেন, ইহুদীদের তরফ থেকে সে দাবীর প্রত্যাখ্যান জড়িয়ে রয়েছে।

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, এ ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে গিয়ে ইহুদীরা ধোঁকা খেয়েছে যে ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করা হয়েছিল বা ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল:

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٧﴾

"... কিন্তু তারা তাকে হত্যা করেনি বা ক্রুশবিদ্ধও করেনি, কিন্তু তাদের কাছে যেন তেমন মনে হয় [যে তারা তাকে হত্যা করছে] তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, আর

যারা এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে, তাদের মন কোন (নিশ্চিত) জ্ঞান ছাড়াই সন্দেহে ভরা,

"কেবল অনুমানের উপর নির্ভরশীল, এটা নিশ্চিত যে তারা তাকে হত্যা করেনি।"

(কুর'আন, সুরা নিসা ৪:১৫৭)

বেশ, তাহলে ঈসা (আঃ)-এর কি হয়েছিল? পবিত্র কুর'আন সত্যিকার ঘটনা ব্যাখ্যা করেছে, অর্থাৎ পাঁচটি ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য দিয়েছে:

প্রথমত পবিত্র কুর'আন ঘোষণা করেছে যে ইহুদীরা ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করেনি:

وَمَا قَتَلُوهُ

"... কিন্তু তারা তাকে হত্যা করেনি..."

(কুর'আন, সুরা নিসা ৪:১৫৭)

দ্বিতীয়ত পবিত্র কুর'আন ঘোষণা করে যে, তারা তাকে ক্রুশবিদ্ধ করেনি:

وَمَا صَلَبُوهُ

"... তারা তাকে ক্রুশবিদ্ধও করেনি..."

(কুর'আন, সুরা নিসা ৪:১৫৭)

তৃতীয়ত পবিত্র কুর'আন ঘোষণা করে যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁকে ফিরিয়ে নেন (অর্থাৎ তাঁর আত্মা হরণ করেন)। এই কথা কুর'আনে দুই জায়গায় রয়েছে:

إِذْ قَالَ اللَّـهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

"আর লক্ষ্য কর, আল্লাহ্ বললেন: 'হে ঈসা, আমি তোমাকে ফিরিয়ে নেব (অর্থাৎ আমি তোমার আত্মা সংহার করব, এখানে "ওয়াফাত" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে), এবং তোমাকে আমার কাছে উঠিয়ে নেব এবং কাফেরদের (মিথ্যাচারের) হাত থেকে তোমাকে পবিত্র করে দেব...."

(কুর'আন, সুরা আলে 'ইমরান ৩:৫৫)

وَإِذْ قَالَ اللَّـهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَـٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّـهِ ۖ
قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۚ

إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ
إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾
مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّـهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ
وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ
وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾

"এবং লক্ষ্য কর (বিচারের দিন) আল্লাহ্ বলবেন, হে মরিয়মের পুত্র ঈসা!

"তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে: 'আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে আমাকে এবং আমার মাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর'?

"সে বলবে: 'আপনি পবিত্র, আমার জন্যে শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোন অধিকার আমার নেই।

"আমি সেরকম কিছু বলে থাকলে আপনি নিশ্চয় তা জানতেন। আমার মনে যা আছে তা আপনি জানেন, কিন্তু আপনার মনে যা আছে তা আমি জানিনা।

"নিশ্চয় আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত।

"আমি তাদেরকে কিছুই বলিনি, শুধু সে কথাই বলেছি যা আপনি বলতে আদেশ করেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহ্র দাসত্ব অবলম্বন কর যিনি আমার আর তোমাদের পালনকর্তা;

"আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম, অতঃপর যখন আপনি আমাকে [আপনার কাছে] ফিরিয়ে নিলেন (অর্থাৎ আমার আত্মা সংহার করলেন, এখানে আবারো 'ওয়াফাত' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে), তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন,

"আর আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ পরিজ্ঞাত।"

(কুর'আন, সুরা মায়িদাহ্ ৫:১১৬-১১৭)

আল্লাহ্ তা'আলা যদি ঈসা (আঃ)-এর আত্মা হরণ করতেন এবং তা পুনরায় ফিরিয়ে না দিতেন তবে তা মৃত্যু [মউত্] বলেই গণ্য হত। কিন্তু কুর'আন জোর দিয়ে বলে যে তাঁকে হত্যা (এবং ক্রুশবিদ্ধ) করা হয়নি:

وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٧﴾

"...এটা নিশ্চিত যে তারা তাকে হত্যা করেনি..."

(কুর'আন, সুরা নিসা ৪:১৫৭)

বেশ, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আত্মা হরণ করার পর তা কি করলেন? এটা কি সম্ভব যে তিনি পুনরায় ঐ আত্মা তার শরীরে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন? এমন একটা ব্যাপার ঘটা কি সম্ভব?

পবিত্র কুর'আন এটা নিশ্চিত করে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কিছু আত্মাকে শরীর থেকে হরণ করার পর পুনরায় ফিরিয়ে দিয়ে থাকেন:

اللَّـــهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ
فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾

"মৃত্যুর সময় আল্লাহ্ আত্মা ফিরিয়ে নেন; আর ফিরিয়ে নেন ঘুমের মাঝে (তাদের আত্মা সমূহ) যারা এখনো মারা যায় নি (অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় যাদের আত্মা হরণ করা হয় না, তারা ঘুমন্ত অবস্থায় এই আত্মাহরণের অভিজ্ঞতা লাভ করে)।

"তখন যাদের বেলায় তিনি মৃত্যুর (মউত্) আদেশ অনুমোদন করেছেন, তিনি [তাদের আত্মাকে] রেখে দেন (অর্থাৎ তার আত্মাকে দেহে ফিরতে দেয়া হয় না); কিন্তু অন্যদের তিনি (তাদের শরীরে) ফিরিয়ে দেন একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য।

"অবশ্যই এর মাঝে চিন্তাশীলদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।"

(কুর'আন, সুরা যুমার ৩৯:৪২)

ঈসা (আঃ)-এর বেলায় কি এমন কিছু ঘটেছিল? এর উত্তর পাওয়া যাবে পবিত্র কুর'আনের পরবর্তী দু'টো বর্ণনায়।

চতুর্থত কুর'আন বলে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ব্যাপারটা এমনভাবে ঘটতে দিয়েছেন যাতে 'মনে হবে' যে, ঈসা (আঃ)-কে বুঝি হত্যা করা হল। এটা সম্ভব হয়েছিল হয় 'একটা বস্তুকে' 'অপর বস্তু' দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে, অথবা 'একজন ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তি' দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে (তাশ্‌বিহ্)। এভাবে যারা, ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করছিলেন, তারা নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, ঈসা (আঃ) সত্যিই মৃত্যু (মউত্) বরণ করেছিলেন:

وَلَـــٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ

"... কিন্তু তাদের কাছে এমনটা যেন প্রতীয়মান হয় তার ব্যবস্থা করা হয়..."
(ইউসুফ আলী)

"... কিন্তু এটা কেবল তাদের মনে হয়েছিল যে (যেন এভাবেই ঘটেছে)..."
(মুহম্মদ আসাদ)

"... কিন্তু তাদের কাছে এমনটা মনে হয়েছিল..."

(মার্মাডিউক পিকথল্)
(কুর'আন, সুরা নিসা ৪:১৫৭)

বেশ, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তার আত্মা হরণ করার পর তা [সেই আত্মা] কি করলেন? — আমাদের পক্ষে এখন এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এই প্রশ্নের একটা সম্ভাব্য উত্তর হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা, 'একটা বস্তুকে, অপর বস্তু দ্বারা প্রতিস্থাপিত করেছেন (তাশ্‌বিহ্)':

- সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ঈসা (আঃ)-এর আত্মা এমন সময়ে হরণ করেছিলেন যখন তিনি তখনও ক্রুশের উপর অবস্থান করছিলেন;
- যারা ঐ ঘটনা অবলোকন করছিল, আল্লাহ্ তা'আলা এভাবে তাদের আশ্বস্ত করেন যে ঈসা (আঃ) ইতোমধ্যে মৃত;
- যখন তাঁকে ক্রুশ থেকে নামিয়ে ফেলা হয় এবং যখন আশেপাশে দেখার মত কেউ ছিল না, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা (আঃ)-এর আত্মা [তার শরীরে] ফিরিয়ে দেন। তারপর তাঁকে উপরে উঠিয়ে নেয়া হয়, যেখান থেকে তিনি একদিন [পুনরায় পৃথিবীতে] নেমে আসবেন।

প্রতিষ্ঠিত খৃস্টান বিশ্বাসের সাথে কুর'আনের [আয়াতের] উপরোক্ত ব্যাখ্যার একমাত্র পার্থক্য এই যে, ক্রুশের ঘটনা আর ঈসা (আঃ)-এর ঊর্ধ্বগমনের ঘটনার মধ্যবর্তী সময়টাতে খৃস্টানগণ ঈসা (আঃ)-কে মৃত বলে ধারণা করেন। (কুর'আনের উপরোক্ত ব্যাখ্যায় অবশ্য তাঁকে মৃত বলে চিহ্নিত করা হয় না, মূলত এজন্য যে তার আত্মাকে আবার তার শরীরে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল।

কুর'আনের আয়াতের উপরোক্ত ব্যাখ্যার ব্যাপারে যারা আপত্তি তোলেন, তারা যুক্তি দেখান যে ঈসা (আঃ)-কে কখনো ক্রুশে উঠানোই হয়নি। "তারা তাকে ক্রুশবিদ্ধ করেনি" — কুর'আনের এই বক্তব্যের ব্যাখ্যায় তারা বলেন যে এর নিহিতার্থ হচ্ছে: তাঁকে কখনো ক্রুশে ওঠানোই হয়নি। "ক্রুশবিদ্ধ করণ" (যে অর্থে কুর'আন এই শব্দটি ব্যবহার করে) — তাদের মতে এর মানে হচ্ছে ক্রুশে চড়ানো, ক্রুশের উপরে মৃত্যু হোক আর নাই হোক। কিন্তু "ক্রুশবিদ্ধ করণের" আসল অর্থ হল ক্রুশের উপর মৃত্যু। কুর'আনের বিখ্যাত তফসীরকারক ইব্‌নে কাসির এই মত ব্যক্ত করেছেন সুরা মায়িদাহ্‌র ৩৬নং আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে।

উপরোক্ত ব্যাখ্যার বিকল্প ব্যাখ্যা হচ্ছে: আল্লাহ্ তা'আলা "একজন মানুষ দ্বারা অপর একজনকে প্রতিস্থাপিত করেছিলেন (তাশ্‌বিহ)"। অর্থাৎ ঈসা (আঃ)-এর স্থলে অন্য কাউকে ক্রুশে ওঠানো হয়েছিল এবং ঐ ব্যক্তিকে ঈসা (আঃ)-এর পরিবর্তে

"ক্রুশবিদ্ধ" করা হয়েছিল। এটা হচ্ছে 'প্রতিস্থাপনের' তত্ত্ব। এটা হচ্ছে একটা মত, এবং সকল মতের মতই এ ব্যাপারে বলতে হবে যে, 'আল্লাহু আ'লম' (আল্লাহ্ই সবচেয়ে ভালো জানেন!)। ইসলামের অনেক বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিগণই 'প্রতিস্থাপনের' তত্ত্বের স্বপক্ষে। যারা এই ব্যাখ্যার বিরোধিতা করেন, তারা এই যুক্তি দেখান যে, এই ব্যাখ্যা আল্লাহ্ তা'আলার উপর এক অবিচারের দোষ চাপিয়ে দেয়, কেননা এই ব্যাখ্যা মতে তিনি [অর্থাৎ আল্লাহ্] একজন নির্দোষ মানুষকে (ঈসা (আঃ)-এর উপর যে সব অভিযোগ আনা হয় সে সব থেকে মুক্ত একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে ঈসা (আঃ)-এর পরিবর্তে ক্রুশবিদ্ধ করার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা বার বার ঘোষণা করেছেন যে, কোন আত্মাই, অন্য কোন আত্মার বোঝা বহন করবে না (আন'আম ৬:১৬৪; বনী ইসরাঈল ১৭:১৫; ফাতির ৩৫:১৮; যুমার ৩৯:৭; নজ্ম ৫৩:৩৮)।

পঞ্চমত কুর'আনে এ ব্যাপারে একটা বক্তব্য রয়েছে যে আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা (আঃ)-কে তার নিজের কাছে উঠিয়ে নেন:

بَل رَّفَعَهُ اللَّـــهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّـــهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾

"না, আল্লাহ্ তাকে তাঁর নিজের কাছে উঠিয়ে নিলেন; আর আল্লাহ তাঁর ক্ষমতায় মহান, বিজ্ঞ।"

(কুর'আন, সুরা নিসা ৪:১৫৮)

إِذْ قَالَ اللَّـــهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

"আর লক্ষ্য কর, আল্লাহ্ বললেন: 'হে ঈসা, আমি তোমাকে ফিরিয়ে নেব (অর্থাৎ আমি তোমার আত্মা সংহার করব), এবং তোমাকে আমার কাছে উঠিয়ে নেব এবং কাফেরদের (মিথ্যাচারের) হাত থেকে তোমাকে পবিত্র করে দেব...."

(কুর'আন, সুরা আলে 'ইমরান ৩:৫৫)

এরপর কুর'আন আরো ব্যাখ্যা করে যে, প্রতিটি আত্মাযুক্ত-প্রাণীকেই (নফ্স) মৃত্যুর (মউত্) স্বাদ গ্রহণ করতে হবে:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ
فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

"প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে।

"তারপর যাকে দোযখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তার কার্যসিদ্ধি ঘটবে।

"আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কোন সম্পদ নয়।"

(কুর'আন, সুরা আলে 'ইমরান ৩:১৮৫)

যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, প্রতিটি আত্মাযুক্ত-প্রাণীকেই (নফ্স) মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে, এর অর্থ হচ্ছে এই যে, ঈসা (আঃ)-কেও অবশ্যই মৃত্যুর (মউত্) স্বাদ গ্রহণ করতে হবে, যদি তাঁর আত্মা থেকে থাকে। এখানে তাহলে প্রশ্ন এসে যাচ্ছে: ঈসা (আঃ)-এর কি আত্মা ছিল? তিনি কি মানুষ ছিলেন? আর আমরা যেহেতু জানি যে তিনি মরিয়মের পুত্র ছিলেন, আমরা অবশ্যই এটাও জানতে চাইব যে, মরিয়ম কি একজন মানুষ ছিলেন?

কুর'আন সুদৃঢ় ঘোষণার মাধ্যমে ঈসা (আঃ) ও মরিয়ম, দুজনের 'মানবত্ব' সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে:

مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۖ
كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ۗ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٧٥﴾

"মরিয়মের পুত্র 'মসীহ্' রাসূল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল অতিক্রান্ত হয়েছেন, এবং তাঁর মা দৃঢ় চরিত্রের এবং সত্যাশ্রয়ি নারী ছিলেন।

"তাঁরা দু'জনেই খাদ্য ভক্ষণ করতেন। দেখুন, আমি তাদের জন্যে কিরূপ যুক্তি-প্রমাণ বর্ণনা করি, (অর্থাৎ তাদের কাছে, যারা আল্লাহ্কে তিন জনের একজন হিসেবে দাবী করে, ঈসাকে বিধাতা হিসেবে দাবী করে এবং মরিয়মকে বিধাতা হিসেবে দাবী ক'রে আল্লাহ্র বিরোধিতা করে)। আবার দেখুন, তারা উল্টা কোন দিকে যাচ্ছে।"

(কুর'আন, সুরা মায়িদাহ্ ৫:৭৫)

মাত্র একটি চমকপ্রদ ঘোষণার মাধ্যমে: "তারা দু'জনেই খাদ্য ভক্ষণ করতেন", কুর'আন ঈসা (আঃ) বা [তাঁর মা] মরিয়মের মানুষ ছাড়া অন্য কিছু হবার ধারণাকে নাকচ করে দেয়।

কুর'আন আরও ঘোষণা করে যে ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র বান্দা ও দাস ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّـهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ
إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّـهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ
فَآمِنُوا بِاللَّـهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ

إِنَّمَا اللَّـــهُ إِلَـــٰهٌ وَاحِدٌ ۖ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۘ
لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّـــهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾

"হে আহলে-কিতাবগণ (অর্থাৎ খৃস্টান ও ইহুদীগণ); তোমরা ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না, বা আল্লাহ্‌র ব্যাপারেও সত্য ছাড়া কিছুই বলো না।

"মরিয়মের পুত্র ঈসা মসীহ্ আল্লাহ্‌র একজন রাসূল (তার চেয়ে বেশী কিছু নন) এবং তাঁর [আল্লাহ্‌র] বাণী, যা তিনি প্রেরণ করেছেন মরিয়মের নিকট এবং আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আগত রূহ্।

"সুতরাং আল্লাহ্‌য় এবং তাঁর রাসূলগণে বিশ্বাস স্থাপন কর। আল্লাহ তিনের এক, একথা পরিহার কর, তোমাদের মঙ্গল হবে।

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ একক উপাস্য। সকল পবিত্রতা তাঁরই। তাঁর একজন পুত্র থাকবে, এটা তাঁর যোগ্য বিষয় নয়।

"আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। আর কর্মবিধানে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।"

(কুর'আন, সুরা নিসা ৪:১৭১)

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ

"অবশ্যই সে {ঈসা (আঃ)} তো এক বান্দাই বটে..."

(কুর'আন, সুরা যুখরুফ ৪৩:৫৯)

এভাবে, কুর'আনের দৃষ্টিভঙ্গিতে, এটা স্পষ্টতই প্রদর্শিত হয় যে ঈসা (আঃ) একজন মানুষ ছিলেন। আর তাই ঈসা (আঃ)-এর উপর বিশ্বজনীন মৃত্যুর নিয়মও প্রযোজ্য। তাকেও মৃত্যুর (মউত্) স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।

ঈসা (আঃ) প্রত্যাবর্তন করবেন

কুর'আন জোর দিয়ে ঘোষণা করে যে ঈসা (আঃ) মৃত্যুবরণ করেননি (অর্থাৎ তাকে হত্যা করা হয়নি বা ক্রুশবিদ্ধও করা হয়নি)। কুর'আন আরো উল্লেখ করে যে, তাকে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে উঠিয়ে নেয়া হয়। আর কুর'আন যেহেতু ঘোষণা করে যে {ঈসা (আঃ)-সহ} প্রতিটি আত্মাকেই মৃত্যুর (মউত্) স্বাদ গ্রহণ করতে হবে, তাহলে বুঝা যায় যে, ঈসা (আঃ)-কে পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে এবং অন্য যে কোন মানুষের মতই মৃত্যুর (মউত্) অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে। তাঁকে অন্য প্রতিটি মানুষের মতই [শেষ পর্যন্ত] মাটিতে প্রত্যাবর্তন করতে হবে (অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর নশ্বর দেহের অবশিষ্টাংশকে মাটিতে ফিরে যেতে হবে, যা থেকে আদতে তা [দেহ] তৈরী হয়েছিল)।

মৃত্যুর পরে সমাহিত হওয়ার মাধ্যমেই সাধারণত একাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। পবিত্র কুর'আন ঘোষণা করে:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿٥٥﴾

"এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে তৈরী করেছি, এবং এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব, এবং পুনরায় এ থেকেই আমি তোমাদেরকে উত্থিত করব।"

(কুর'আন, সুরা তা-হা ২০:৫৫)

কিন্তু ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু (মউত্) সম্বন্ধে বলতে গিয়ে, কুর'আন এক সাড়া জাগানো সতর্কবাণীও উচ্চারণ করেছে। সেই সতর্কবাণী হল এই যে, ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুবরণ করার আগে ইহুদী ও খৃস্টান সবাই তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য হবে, {অর্থাৎ কুর'আন যেভাবে ঈসা (আঃ)-কে 'মসীহ্' এবং আল্লাহ্‌র নবী হিসেবে চিহ্নিত করেছে সেভাবে}। সুতরাং এই আয়াত পরিস্কারভাবে ঐ ঐশ্বরিক পরিকল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত করে যে, ঈসা (আঃ) একদিন [এই পৃথিবীতে] ফিরে আসবেন এবং তাঁর মৃত্যুর পূর্বে এই ঘটনা ঘটবে:

وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۖ
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿١٥٩﴾

"এবং আহ্‌লে কিতাবের মধ্যে এমন কেউ নেই {অর্থাৎ এমন একজন ইহুদী নেই, যে ঈসা (আঃ)-কে 'মসীহ্' এবং আল্লাহ্‌র নবী হিসেবে অস্বীকার করে, এবং এমন একজন খৃস্টান নেই যে জেদ ধরে যে, ঈসা (আঃ)-কে বিধাতা এবং বিধাতার পুত্র হিসেবে উপাসনা করতে হবে} যে তাঁর উপর {ঈসা (আঃ)এর উপর} তাঁর মৃত্যুর {অর্থাৎ ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর} পূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য হবে না।

"এবং শেষ বিচারের দিনে তিনি {ঈসা (আঃ)} তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবেন।"

(কুর'আন, সুরা নিসা ৪:১৫৯)

সুতরাং ঐদিনে প্রত্যেক ইহুদীকে মেনে নিতে হবে যে ঈসা (আঃ)-ই হচ্ছেন সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, আর প্রত্যেক খৃস্টানকে, 'ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌র পুত্র এবং ঐশ্বরিক ত্রয়ীর তৃতীয় ব্যক্তিত্ব', এই বিশ্বাস পরিত্যাগ করতে হবে।

কারো পক্ষে সর্বোচ্চ যেটুকু গুরুত্ব আরোপ করা সম্ভব, সেটুকু গুরুত্ব সহকারেই রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) ঘোষণা করেছেন যে ঈসা (আঃ) আবার [পৃথিবীতে] ফিরে আসবেন:

"আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত: আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বলেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তাঁর শপথ, শীঘ্রই তোমাদের মাঝে এক সুবিচারক শাসক হিসেবে মরিয়মের পুত্র আবির্ভূত হবেন। তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন ও শুকরদের হত্যা করবেন এবং জিযিয়া কর (ইসলামের ভূমিতে ইহুদী ও খৃস্টানদের উপর আরোপিত এক বিশেষ ধরনের কর) অবলুপ্ত করবেন। তখন অর্থের প্রাচূর্য্য থাকবে এবং কেউ দান গ্রহণ করবে না।"

(সহীহ্ বুখারী)

আসলে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, কিয়ামতের দশটি প্রধান আলামতের মধ্যে, ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন হচ্ছে অন্যতম প্রধান আলামত।

হুযায়ফা ইব্‌নে উসায়েদ গিফারী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত:

আমরা আলোচনায় ব্যস্ত থাকা অবস্থায়, হঠাৎ করে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমাদের কাছে আসলেন। তিনি বললেন: তোমরা কি নিয়ে আলোচনা করছ? সাহাবীগণ বললেন: আমরা 'শেষ সময়' নিয়ে আলাপ করছি? তখন তিনি বললেন: দশটি আলামত যতক্ষণ না তোমরা দেখতে পাও, ততক্ষণ তা [শেষ সময় বা ক্বিয়ামত] আসবে না এবং (এর সাথে সংশ্লিষ্ট হিসাবে) তিনি ধোঁয়া, দাজ্জাল, [মাটির] জানোয়ার, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ)-এর অবতীর্ণ হওয়া, ইয়াজুজ-মাজুজ, এবং তিনটি স্থানে — পূর্বের কোন এক স্থানে, পশ্চিমের কোন এক স্থানে এবং আরবদেশে — ভূমি ধ্বসের কথা উল্লেখ করেন, যার শেষে ইয়েমেন থেকে আগুন ছড়াতে থাকবে, ফলে মানুষ তাড়া খেয়ে তাদের মিলনস্থলে গিয়ে জড়ো হবে।

(সহীহ্ মুসলিম)

তাহলে দশটি আলামত হচ্ছে নিম্নরূপ:

- 'ভণ্ড-মসীহ্' দাজ্জালের মুক্তি লাভ।
- ইয়াজুজ-মাজুজের মুক্তি লাভ।
- প্রকৃত মসীহ্ (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন।
- দুখান (বা ধোঁয়া) দৃশ্যমান হওয়া।
- ভূমির জানোয়ারের উদ্ভব (অর্থাৎ 'পবিত্রভূমি' থেকে উদ্ভূত এক জীব)।
- পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়।
- পূর্বের কোন স্থানে ভূমি ধ্বস বা মাটি সরে যাওয়া।
- পশ্চিমের কোন স্থানে অপর একটি ভূমি ধ্বস।
- আরবভূমিতে তৃতীয় একটি ভূমি ধ্বস।
- ইয়েমেন থেকে এক আগুনের [অগ্নিকাণ্ডের] উৎপত্তি হবে যার ফলে মানুষ পালিয়ে গিয়ে তাদের সম্মেলন স্থলে জড়ো হবে।

(দ্রষ্টব্য যে, উপরোক্ত তালিকায় আলামতগুলি কোন্‌টার পরে কোন্‌টা ঘটবে তার সঠিক নির্দেশনা নেই)।

ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তনকে কুর'আন শেষ সময়ের 'সকল আলামতের সেরা আলামত' বলে আখ্যায়িত করেছে:

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ

"আর নিশ্চিত ভাবেই তিনি {ঈসা (আঃ)} হলেন ক্বিয়ামতের আলামত।"
(কুর'আন, সুরা যুখরুফ ৪৩:৬১)

ঈসা (আঃ) নিজেই, তার প্রত্যাবর্তনের সময় বুঝার জন্য আলামতের একটি তালিকা দিয়ে গেছেন:

- নিজেদের 'মসীহ্' বলে দাবী করবে এমন ব্যক্তিদের আবির্ভাব ঘটবে, কিন্তু তারা হবে ভণ্ড।
- চারিদিকে যুদ্ধ এবং যুদ্ধের গুজব ছড়িয়ে থাকবে।
- পৃথিবীব্যাপী অভূতপূর্ব দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে।
- মহামারীতে পৃথিবী ছেয়ে যাবে।
- অরাজকতা ও মানুষের প্রতি অমানবিক আচরণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে।
- ভূমিকম্পের তীব্রতা ও সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

এভাবে আমরা আসমানী কিতাবসমূহে [তৌরাত ও ইঞ্জীলে] 'মসীহ্‌র' দু'টো পরস্পর বিরোধী চিত্রের ব্যাখ্যা পাচ্ছি — প্রথমটি হচ্ছে নরম-সরম ও বিনীত 'মসীহ্' যিনি প্রচণ্ড দুর্ভোগ পোহাবেন, আর অন্যটি হচ্ছে শক্তিধর দিগ্‌বিজয়ী 'মসীহ্'। যখন ঈসা (আঃ) প্রত্যাবর্তন করবেন, তখন তিনি তাঁর দ্বিতীয় রূপে নিজেকে প্রকাশ করবেন।

কিন্তু রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর বর্ণনায় আরও জানিয়েছেন যে, 'শেষ যুগে', ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তনের আগে, আল্লাহ্ তা'আলা ভণ্ড-মসীহ্, অর্থাৎ আল্-মসীহ্ আদ্-দাজ্জালকে পৃথিবীতে ছেড়ে দেবেন।

দাজ্জাল তাহলে কে?

'পবিত্রভূমি'র শাসক হিসেবে সেখানে ফিরে যাওয়া, এবং রাজা-নবী দাউদ (আঃ) ও সুলায়মান (আঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "ইসরাঈল রাষ্ট্র" পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারা, সেই সাথে সুলায়মান (আঃ) কর্তৃক নির্মিত উপাসনালয় পুনর্নির্মাণ করতে পারা এবং ঐ

উপাসনালয়ে ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতার উপাসনা করতে পারাই হচ্ছে ২০০০ বছরেরও বেশী সময় ধরে ইহুদীদের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন। ঐ ধরনের স্বপ্নকে অবশ্যই মহৎ মনে করা উচিত। একটা জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় স্বপ্ন যদি ঐরকম হয়ে থাকে, তাহলে স্বভাবতই আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে বিশেষ উৎকর্ষতা লাভ করার যোগ্যতা তাদের রয়েছে। তারা এমন জনগোষ্ঠী হবার কথা যারা, পরকালকে দুনিয়ার [ইহকালের] চেয়ে অধিকতর শ্রেয় বলে মূল্যায়ন করে, এবং যাদের আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি সবকিছুর আপাত চেহারা ভেদ ক'রে, অন্তর্নিহিত সত্যকে উপলব্ধি করে। অতএব, অন্তত পক্ষে, তাদের এটুকু অনুধাবন করতে পারা উচিত যে, ঐরকম মহৎ স্বপ্ন, নিশ্চিত ভাবে ধর্ম-বিমুখ রাষ্ট্র ইসরাঈল সৃষ্টির মাধ্যমে এবং 'পবিত্রভূমিতে' রক্ত রঞ্জিত ৫০ বছরেরও বেশী সময় ধরে ত্রাস ও নিপীড়নের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। এ সম্ভাবনাও খুব ক্ষীণ যে, এই কর্মকাণ্ডের জন্য ভয়ঙ্কর পরিণতি ভোগ না করে, তারা আরো ৫০ বছর এভাবেই উৎপীড়ন চালিয়ে যাবে।

আবার, ইসরাঈলী ইহুদীরা সবাই বিশ্বাস করত যে, যতক্ষণ না তাদের ঐ বিশেষ নবী আবির্ভূত হচ্ছেন, যাকে 'মসীহ্' বলে ডাকা হবে, ততক্ষণ তাদের ঐ সর্ববৃহৎ স্বপ্নটি বাস্তবায়িত করা যাবে না বা তা বাস্তবায়িত হবার নয়। তিনি *যখন পৃথিবীতে রাজা হিসেবে সিংহাসনে অভিষিক্ত হবেন, তখন, সময়ের শেষ অধ্যায়ে তিনি পরিত্রাণ বয়ে আনবেন*। আসমানী কিতাবের অন্যত্র (১ ঈনক ১৩:৩২-৩৫, ১৪:৯, ২৮:২৯, ৪৫:৩, ১০৫:২) মসীহ্র রাজত্বের পুনরুল্লেখ রয়েছে। অবশ্য ইউরোপীয়-ইহুদীরা, যারা যায়োনিস্ট আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেছে, তারা অন্যদের মত 'মসীহ্' সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ বাণীর সাথে কোন পবিত্র সম্পর্কের কথা খুব সামান্যই অনুভব করে।

আল্লাহ্ তা'আলা এটা নির্ধারণ করেছেন যে, প্রতারণার মাধ্যমে 'ভণ্ড-মসীহ্' (দাজ্জাল) ইহুদীদের কাছে এমন এক পরিকল্পনা তুলে ধরবে যাকে তারা, তাদের 'পবিত্রভূমিতে' প্রত্যাবর্তন, ইসরাঈল রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, তাদের জন্য একজন রাজার নিযুক্তি, (*আমাদের জন্য এমন একজন রাজা/শাসক নিযুক্ত কর, যাতে আমরা আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করতে পারি* — কুর'আন, সুরা বাক্বারা ২:২৪৬) এবং [সুলায়মান (আঃ)-এর] উপাসনালয়ের পুনর্নির্মাণ, এক কথায়, তাদের সবচেয়ে বড় স্বপ্নের বাস্তবায়ন মনে করে আলিঙ্গন করবে। আসলে ইসরাঈলের এই ভণ্ড রাষ্ট্র তাদেরকে ব্যাপকভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে প্রতারিত করেছে, এটাই তাদের চিরাচরিত আধ্যাত্মিক অন্ধত্বের সাক্ষ্য:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّـهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ۗ

وَاللَّـــهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾

"কিন্তু যারা (অন্যান্য বিষয়ের সাথে এই কুর'আন এবং এই শেষ নবীকে) বিশ্বাস করে না তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকার সদৃশ, পিপাসার্ত ব্যক্তি যাকে পানি মনে করে;

"সে যখন তার কাছে যায় তখন কিছুই পায় না, এবং (সেখানে উপস্থিত) পায় আল্লাহ্‌কে; অতঃপর আল্লাহ্ তার হিসাব চুকিয়ে দেবেন;

"এবং আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।"

(কুর'আন, সুরা নূর ২৪:৩৯)

আজকের ইসরাঈল রাষ্ট্র ঠিক ঐ মানুষটির অবস্থায় রয়েছে, যে পিপাসার্ত এবং মরীচিকাকে পানি মনে করে ভুল করে।

إِنَّ هَـــٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾
وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

"বনী ইসরাঈল যে সকল বিষয়ে মতবিরোধ করে, অবশ্যই এই কুর'আন তার অধিকাংশ তাদের কাছে বর্ণনা করে।

"এবং নিশ্চিতই এটা [অর্থাৎ কুর'আন] মুমিনদের জন্য হেদায়েত ও রহমত।"

(কুর'আন, সুরা নম্‌ল ২৭:৭৬-৭৭)

আজ 'আপাতদৃষ্টিতে' মনে হবে যে ইহুদীদের 'সবচেয়ে বড় স্বপ্ন' বুঝি প্রায় পুরোপুরি বাস্তবায়িত হতে চলেছে। ইসরাঈলী ইহুদীরা 'পবিত্রভূমিতে' ফিরে এসেছে অথবা, পৃথিবীর যেখানেই তারা থাকুক না কেন, ইচ্ছা করলেই তারা সেখানে ফিরে আসতে পারে। ১৯৪৮ সালে ইসরাঈল রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং আজ তা এক বাস্তবতা। ঐ স্বপ্ন পুরোপুরি বাস্তবায়িত হতে এখন আর যেটুকু বাকী রয়ে গেছে তা হচ্ছে একজন রাজার নিয়োগ এবং মসজিদ আল-আক্‌সার ধ্বংস সাধন, যেন তার স্থলে [তাদের] ঐ উপাসনালয় পুনর্নির্মাণ করা যায়:

*"তোমাদের মাবুদ যে **দেশটা** তোমাদের দিতে যাচ্ছেন সেখানে গিয়ে তা দখল করে যখন তোমরা সেখানে বাস করতে থাকবে এবং বলবে, 'আমাদের আশেপাশের জাতিগুলোর মত এস, আমরা আমাদের জন্য একজনকে বাদশাহ্ হিসাবে বেছে নিই,' তখন তোমাদের মাবুদ যাকে ঠিক করে দেবেন তাকেই তোমরা তোমাদের বাদশাহ্ করবে {এখানে ঐ বিশ্বাস নিহিত রয়েছে যে, ঐ রাজা দাউদ (আঃ)-এর বংশোদ্ভূত হবেন}।"*

(তৌরাত, দ্বিতীয় বিবরণ ১৭:১৪-১৫)

উপরন্তু ইসরাঈলকে পৃথিবীর 'নিয়ন্তা রাষ্ট্র' হতে হবে এবং ইসরাঈলের রাজাকে [বা শাসনকর্তাকে] জেরুজালেম থেকে পৃথিবীর উপর 'শাসন' করতে হবে।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, এসবের কোন কিছুই 'মসীহ্' ছাড়া বাস্তবায়িত হবার কথা নয়। 'দৃশ্যত' এটাই মনে হচ্ছে — 'বাস্তব সত্য' তাহলে কি?

ইসলামের দৃষ্টি থেকে দেখলে, এসবের আসল স্বরূপ এই যে, ভণ্ড-মসীহ্ দাজ্জাল ইহুদীদেরকে ধোঁকা দিয়ে এই কথা বিশ্বাস করাতে পেরেছে যে, বিধাতার দয়া তাদের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে। অথচ 'বাস্তবতা' এই যে, তাদের আধ্যাত্মিক অন্ধত্ব তাদেরকে ঐশ্বরিক ফাঁদে পতিত করেছে, যা থেকে এখন আর মুক্তি লাভের কোন উপায় নেই। তারা পৃথিবীতে অত্যাচার ও অবিচারের নিন্দা করে, অথচ অন্যদের প্রতি তারা যে অত্যাচার ও অবিচার করে চলেছে, সেটাকে যথাযথ মনে করে। 'বিধাতার' সাথে তাদের যে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, অন্যদের তা নেই, এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে তারা এসব করছে। যেহেতু তারা বিশ্বাস করে যে 'পবিত্রভূমি' তাদের, অতএব তারা এটাও বিশ্বাস করে যে, যারা সেখানে শতশত বৎসর যাবত বসবাস করছে, তাদের কাছ থেকে সেটাকে মুক্ত করার অধিকারও তাদের রয়েছে। 'লক্ষ্য' অর্জন করতে পারলে যে কোন 'পন্থাই' শুদ্ধ । আসল কথা এই যে, 'দাজ্জাল' কর্তৃক তারা বিপথগামী ও ব্যাপকভাবে প্রতারিত হয়েছে।

ভণ্ড-মসীহ্ 'দাজ্জাল' হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার এক বিশেষ *সৃষ্টি* যে মসীহ্র রূপ ধারণ করবে এবং ইহুদীদেরকে প্রতারণার মাধ্যমে বিশ্বাস করাবে যে সে-ই আসল 'মসীহ্'। মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ দাজ্জালকে ভয়ঙ্কর ক্ষমতা, বহুমুখী প্রতিভা এবং প্রতারণা ও ধূর্ততার বিশাল ক্ষমতা দান করেছেন। খৃস্টানরা তাকে খৃস্ট-বিরোধী [বা Anti-christ] বলে জানে। আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক সৃষ্ট দুষ্টপ্রাণী 'দাজ্জাল', একদিন মানব রূপে পৃথিবীতে দৃশ্যমান হবে। যখন সে দেখা দেবে তখন সে হবে একজন ইহুদী, কোঁকড়া চুলের অধিকারী এক সুঠাম দেহী তরুণ। মদীনা নিবাসী ইব্নে সাইয়াদ নামক এক ইহুদী বালককে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) দাজ্জাল বলে সন্দেহ করেছিলেন। তাঁর এই কাজের মাধ্যমেই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, 'দাজ্জালকে ইতোমধ্যেই পৃথিবীতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে' এবং একদিন সে পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করবে:

- একজন মানুষ হিসেবে।
- একজন ইহুদী হিসেবে।
- একজন তরুণ হিসেবে।

আসল মসীহ্, সুলায়মান (আঃ)-এর মতই, দউদ (আঃ)-এর সিংহাসন অর্থাৎ জেরুজালেম থেকে পৃথিবীর উপর শাসন করবেন। সেটা করার জন্য, তাঁকে প্রথমে নিম্নলিখিত কার্যগুলি সমাধা করতে হবে:

- যারা ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতার উপাসনা করে না, তাদের শাসন থেকে পবিত্রভূমিকে মুক্ত করা,
- আল্লাহ্ যাদেরকে *বিশেষভাবে সম্মানিত* করেছেন, সেই chosen people-দেরকে (এই অঙ্গীকার ঘোষণাকালে তারা ছিল ইহুদী) পবিত্রভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে আসা,
- দাউদ (আঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসরাঈল রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, এবং
- ইসরাঈলকে পৃথিবীর "নিয়ন্তা রাষ্ট্রে" পরিণত করা।

কেবলমাত্র তখনই [অর্থাৎ উপরের শর্তগুলো পূরণ হলে] আসল মসীহ্র পক্ষে দাউদ (আঃ)-এর সিংহাসন, অর্থাৎ জেরুজালেম থেকে পৃথিবীর উপর শাসন করা সম্ভব হবে।

'ভণ্ড-মসীহ্ দাজ্জাল'-কে যদি সার্থকভাবে আসল 'মসীহ্র' অভিনয় করতে হয়, তাহলে তাকে উপরের শর্তগুলো অবশ্যই পূরণ করতে হবে।

উপরের বক্তব্যের ফলশ্রুতিতে এখন প্রশ্ন উঠবে: 'ভণ্ড-মসীহ্ দাজ্জাল' বা 'খৃস্ট-বিরোধী'-ই যদি ইহুদীদের দারুণভাবে প্রতারিত হবার কারণ হয়ে থাকে এবং আরো অনেক কিছুর জন্য দায়ী হয়ে থাকে, আর তাকে যদি এরই ভিতর পৃথিবীতে ছেড়ে দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে সে এখন কোথায়? আমাদের নবী (সাঃ) এই 'ভণ্ড-মসীহ্ দাজ্জাল' সম্পর্কে যা বলে গেছেন তা সকল ধাঁধাঁর সেরা ধাঁধাঁ মনে হতে পারে; তিনি বলেছেন:

قَالَ أَرْبَعُوْنَ يَوْماً، يَوْمَ كَسَنَةٍ، وَيَوْمَ كَشَهْرٍ، وَيَوْمَ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ

"আন্-নাউওয়াস ইবনে সাম'আন (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত: আমরা বললাম, [হে] আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ), সে কতদিন পৃথিবীতে থাকবে? তিনি বললেন: চল্লিশ দিন; একদিন এক বছরের মত, একদিন এক মাসের মত, একদিন এক সপ্তাহের মত, আর বাকী দিনগুলি হবে তোমাদের দিনের মত...।"

(সহীহ্ মুসলিম এবং সুনান তিরমিযী)

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীতে তার জীবনের শেষ অংশে, '*দাজ্জালের দিন আমাদের দিনের মত হবে*'। সুতরাং জীবনের শেষ প্রান্তে পৃথিবীতে তার অবস্থান আমাদের অবস্থানের মত হবে — অর্থাৎ 'মসীহ্র' রূপ ধারণ করে তার ব্রত সমাপন করার

জন্য তখন সে আমাদের মত বাহ্যিক জগতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ্ তা'আলার অঙ্গীকার ছিল এই যে, 'মসীহ্' দাউদ (আঃ)-এর সিংহাসন থেকে, অর্থাৎ এমন এক জেরুজালেম থেকে, পৃথিবীর উপর শাসন করবেন যা হবে ইসরাঈল রাষ্ট্রের প্রাণকেন্দ্র। আর তাই এটা পরিস্কার যে, পৃথিবীতে তার জীবনের শেষ পর্যায়ে 'দাজ্জাল' সশরীরে জেরুজালেমে অবস্থান করবে, এবং তখন, যেহেতু 'তার দিন আমাদের দিনের মত হবে', আমাদের জন্য তাকে দেখাটা সম্ভব হবে। ঐ সময় আমরা তাকে একজন ইহুদী, একজন তরুণ, সুঠাম শরীরের অধিকারী, কোঁকড়া চুলধারী ইত্যাদি হিসেবে দেখতে পাব। তাকে অবশ্য পৃথিবীর 'শাসকও' হতে হবে, অতএব সে জেরুজালেম থেকে পৃথিবীর উপর 'শাসন' করবে। ইতিহাসের সমাপ্তিলগ্নে জেরুজালেম যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার জন্য নির্ধারিত হয়ে রয়েছে, সে সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর এখানেই নিহিত।

তার আগে পর্যন্ত সে আমাদের আশেপাশে থাকবে, অনেকটা যেমন ফেরেশতারা বা জ্বিনেরা সবসময় আমাদের আশেপাশে থাকা সত্ত্বেও 'আমাদের' পৃথিবীতে দৃষ্টিগোচর নয়, কারণ তাদের দিন আমাদের দিনের মত নয়। দাজ্জাল সর্বদাই আমাদের ঈমানের পরীক্ষা করার জন্য আমাদেরকে আক্রমণ করবে। সে তার প্রতারণার জাল বুনতে থাকবে, কিন্তু আমরা আমাদের স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়-বলে তাকে অনুধাবন করতে পারব না, কেননা, 'তার দিন' 'আমাদের দিনের' মত হবে না। আল্লাহ্ 'দাজ্জালকে' পৃথিবীতে এমন একটা দিনে মুক্ত করে দেবেন [বা ছেড়ে দেবেন] যা আমাদের জন্য এক বছরের মত হবে, তারপরে আরেকটা দিন আমাদের জন্য এক মাসের মত হবে, তারপরে আরেকটা দিন আমাদের জন্য এক সপ্তাহের মত হবে — এ সময় সে পৃথিবীর কোথায় অবস্থান করবে? আমরা জানি যে সে পৃথিবীতে থাকবে, কিন্তু পৃথিবীর কোথায় থাকবে?

সৌভাগ্যবশত আমাদের কাছে প্রথম প্রশ্নটির একটা উত্তর আছে, আর ঐ উত্তর, পর্যায়ক্রমে, অন্য দু'টো প্রশ্নের উত্তর পাবার সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়। "তামীম আদ্-দারীর হাদীস" বলে খ্যাত হাদীসে প্রথম প্রশ্নটির উত্তর নিহিত রয়েছে। তামীম আদ্-দারী একজন খৃস্টান ছিলেন যিনি মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আসেন এবং তাঁর কাছে নিজের এমন অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন যা 'দাজ্জাল' সংক্রান্ত। এটা স্পষ্ট নয় যে তিনি ঘটনাটা স্বপ্নে দেখেছিলেন না সেটা তাঁর অন্তর্দৃষ্টি উদ্ভূত কোন দৃশ্য না সেটা তাঁর বাস্তব জীবনের একটা অভিজ্ঞতা ছিল। একদা রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) নামায শেষে লোকজনকে মসজিদে অপেক্ষা করতে বলেন, যেন তিনি তাদেরকে তামীম আদ্-দারীর 'দাজ্জাল' সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে পারেন। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, তামীম আদ্-দারী তাঁর কাছে যা বর্ণনা করেছেন, তা রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজে 'দাজ্জাল' সম্বন্ধে যা বলে আসছিলেন সেটাকে

নিশ্চিত করে। হাদীসখানি আদ্-দাহহাক্ ইব্নে ক্বায়েস-এর বোন ফাতিমা বিন্তে ক্বায়েস (রাঃ) দ্বারা বর্ণিত:

"আমীর ইব্নে শারাহিল আশ্-শা'বী বলেন: ফাতিমা বিনতে ক্বায়েস ছিলেন সর্বাগ্রে হিজরতকারী মহিলাদের একজন। আমি তাঁকে একখানি হাদীস বর্ণনা করতে বললাম যা তিনি সরাসরি আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)-এর কাছ থেকে শুনেছেন এবং তাদের মাঝখানে কোন বাড়তি মাধ্যম ছিল না [অর্থাৎ তৃতীয় কোন ব্যক্তির মাধ্যমে শোনা নয়]। তিনি বললেন: বেশ, তুমি যদি তাই চাও তবে আমি তাই করব। তখন [আমীর] বললেন: তাই করুন, আমার কাছে হাদীসখানি বর্ণনা করুন। তিনি [ফাতিমা] বললেন: আমি মুগিরাহ্র ছেলেকে বিয়ে করলাম, আর সে তখন ছিল ক্বোরাইশদের মধ্যে ঐ সময়ের বিশিষ্ট একজন তরুণ, কিন্তু সে প্রথম জিহাদে শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করল {আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)-এর পাশে যুদ্ধ করতে করতে}। আমি যখন বিধবা হলাম, তখন আব্দুর রহমান ইব্নে আওফ্, আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)-এর সাহাবীদের একজন, আমাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)-ও আমাকে ঐ ধরনের এক প্রস্তাব পাঠালেন তাঁর মুক্তি দেয়া ক্রীতদাস উসামা ইব্নে যায়েদ-এর জন্য। আমি জানতাম যে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) (উসামা সম্বন্ধে) বলেছিলেন: যে আমাকে ভালোবাসে, তার উচিত উসামাকেও ভালোবাসা। যখন আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) আমার সাথে (এ ব্যাপারে) আলাপ করলেন, আমি বললাম: আমার সমস্ত দায়-দায়িত্ব আপনার হাতে অর্পিত। আপনার যার সাথে ইচ্ছা, তার সাথেই আমার বিবাহের ব্যবস্থা করতে পারেন। তিনি বললেন: "সে ক্ষেত্রে তোমার এখন উম্মে শারিকের ঘরে গিয়ে থাকা ভালো হবে।" উম্মে শারিক্ ছিলেন আনসারদের ভিতর একজন ধনাঢ্য মহিলা। তিনি আল্লাহ্র রাস্তায় মুক্ত হস্তে ব্যয় করতেন এবং অতিথিদের প্রাণখুলে আপ্যায়ন করতেন। আমি বললাম: "বেশ, আমি আপনার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করব।" (কিন্তু তখন) তিনি (ব্যাপারটা নিয়ে আরেকবার ভেবে দেখে) বললেন: "না, তা কর না কারণ উম্মে শারিক হচ্ছেন এমন এক মহিলা যার কাছে অনেক অতিথি আসেন, এবং আমি চাই না তোমার মাথা বা পা উন্মুক্ত থাকুক আর তা আগন্তুকদের দৃষ্টিগোচর হোক, যা তুমি অপছন্দ কর। তুমি তার চেয়ে বরং তোমার জ্ঞাতি ভাই আব্দুল্লাহ্ ইব্নে আমর ইব্নে উম্মে মাখতুমের ঘরে অবস্থান গ্রহণ কর।" তিনি ছিলেন ক্বোরাইশ বংশের বনী ফিহ্র শাখার একজন, (আর ফাতিমা নিজে যে গোত্রভূত ছিলেন), তিনি ঐ গোত্রেরই একজন ছিলেন। সুতরাং আমি ঐ ঘরে বসবাস করতে গেলাম, এবং যখন আমার অপেক্ষার সময় [ইদ্দত] শেষ হল, তখন একজন ঘোষককে ঘোষণা করতে শুনলাম যে জামাত দাঁড়াতে যাচ্ছে, [যেখানে] জামাতে নামায হয়ে থাকে। সুতরাং আমি মসজিদের দিকে পা বাড়ালাম এবং সেখানে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)-এর সাথে নামায আদায় করলাম, এবং আমি মেয়েদের এমন এক কাতারে ছিলাম যা পুরুষদের কাতারের নিকটবর্তী ছিল। আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) নামায শেষ করে হাসিমুখে মিম্বরে বসলেন এবং বললেন: "প্রতিটি মুসল্লি যেন নিজ নিজ জায়গায় বসে থাকে।" তারপর তিনি বললেন: "তোমরা কি জান আমি তোমাদের কেন একত্রিত হতে বলেছি?" তারা [মুসল্লিরা] বলল: "আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই সবচেয়ে ভালো জানেন।" তিনি বললেন: "আল্লাহ্র কসম্। আমি তোমাদের নসীহত করতে বা কোন সতর্কবাণী শোনাতে ডাকিনি। আমি তোমাদের এজন্য থেকে যেতে বলেছি যে, তামীম দারী নামে

এক খৃস্টান এসেছিল এবং ইসলাম গ্রহণ করেছিল; সে আমাকে এমন কিছু বলল যা, আমি তোমাদেরকে 'দাজ্জাল' সম্বন্ধে যা বলে আসছিলাম, তার সাথে মিলে যায়। সে আমাকে বলল যে, বনী লখ্‌ম ও বনী জুযামের ত্রিশজন মানুষের সাথে সে এক জাহাজে যাত্রা করেছিল এবং তারা এক মাস ধরে সমুদ্রের ঢেউয়ের বাড়ি খেতে থাকে। তারপর সেই ঢেউগুলি তাদেরকে সমুদ্রের মাঝে অবস্থিত চরে (অর্থাৎ একটা দ্বীপে) সূর্যাস্তের সময় নিয়ে পৌঁছাল। তারা তখন একটা ছোট ডিঙ্গিতে উঠে ঐ দ্বীপে গিয়ে অবতরণ করল। সেখানে ঘন ও লম্বা কেশাবৃত একটা জন্তু ছিল (যে কারণে) তারা তার চেহারা ও পশ্চাদভাগ সনাক্ত করতে পারছিল না। তারা বলল: "ওহে হতভাগা! তুমি কে?" তখন সে বলল: "আমি হচ্ছি আল্‌-জাস্‌সাসাহ্‌।" তারা বলল, "আল্‌-জাস্‌সাসাহ্‌ কি?" সে বলল, হে মানুষরা, ঐ আশ্রমে যে ব্যক্তি রয়েছে তার কাছে যাও কেননা সে তোমাদের ব্যাপারে জানতে খুবই আগ্রহী। সে (বর্ণনাকারী) বলল, সে যখন আমাদেরকে একজন ব্যক্তির কথা বলল, তখন আমরা ভয় পেয়ে গেলাম যে, সে হয়ত বা শয়তান। তখন আমরা দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলাম যতক্ষণ না আমরা ঐ আশ্রমে পৌঁছলাম এবং সেখানে একজন সুঠাম দেহী ব্যক্তিকে তার গলার সঙ্গে হাত বাঁধা অবস্থায় এবং পায়ে বেড়ি পরা অবস্থায় দেখতে পেলাম। আমরা বললাম: ওহে হতভাগা! তুমি কে? সে বলল: তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে আমি কে, কিন্তু [আগে] বল তোমরা কারা? আমরা বললাম: আমরা আরববাসী আর আমরা একটা নৌকায় [জাহাজে] চড়েছিলাম, কিন্তু, [সমুদ্রের] ঢেউ আমাদের এক মাস ধরে ভোগাতে থাকে এবং আমাদের এই দ্বীপের কাছে এনে ফেলে। আমরা ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে এই দ্বীপে অবতরণ করি। এখানে এক ঘন কেশধারী জানোয়ারের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে, যার কেশের ঘনত্বের জন্য তার চেহারা ও পশ্চাদদেশের ভিতর পার্থক্য করা যাচ্ছিল না। আমরা বললাম: ধিক্‌ তোমাকে, তুমি কে? সে বলল: আমি আল্‌-জাস্‌সাসাহ্‌। আমরা বললাম: আল্‌-জাস্‌সাসাহ্‌ বলতে কি বুঝায়? সে বলল: তোমরা ঐ আশ্রমের ভিতের অবস্থানরত ব্যক্তির কাছে যাও কেননা সে তোমাদের সম্বন্ধে জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তাই আমরা ত্রস্তপদে তোমার কাছে ছুটে এসেছি এই আশঙ্কাসহ যে সে হয়ত বা 'শয়তান'। সে (ঐ শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যক্তি) বলল: আমাকে বায়সানের খেজুর বাগান সম্বন্ধে বল। আমরা বললাম: তুমি ওগুলো সম্বন্ধে কি জানতে চাও? সে বলল: আমি জানতে চাই ঐ বাগানে এখনো ফল ধরে কিনা? আমরা বললাম: হ্যাঁ [ফল ধরে]। তারপর সে বলল: আমার মনে হয় ওগুলোতে আর ফল আসবে না। সে [আবার] বলল: আমাকে তাবারিয়া হ্রদ সম্বন্ধে বল? আমরা বললাম: তুমি সেটা সম্বন্ধে কি জানতে চাও? সে বলল: এখনো তাতে পানি আছে? তারা বলল: সেটাতে এখন প্রচুর পানি রয়েছে। তখন সে বলল: আমার মনে হয় ওটা শীঘ্রই শুকিয়ে যাবে। তারপর সে বলল: আমাকে যুঘারের ঝর্ণাধারা সম্বন্ধে বল। তারা বলল: তুমি সেটা সম্বন্ধে কি জানতে চাও? সে (ঐ শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যক্তি) বলল: সেটাতে কি এখনো পানি আছে এবং তা কি সেচ কাজে ব্যবহৃত হয়? আমরা তাকে বললাম: হ্যাঁ ওতে প্রচুর পানি রয়েছে এবং (মদীনার) বাসিন্দারা (তাদের জমিতে) এর সাহায্যে সেচ দেয়। সে বলল: আমাকে ঐ নিরক্ষর নবী সম্বন্ধে বল, তিনি কি করেছেন? আমরা বললাম: তিনি মক্কা ত্যাগ করেছেন এবং ইয়াসরিবে (মদীনায়) বসতি স্থাপন করেছেন। সে বলল: আর আরবরা কি তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে? আমরা বললাম: হ্যাঁ। সে বলল: তিনি তাদের সাথে কেমন আচরণ করেন? আমরা তাকে জানালাম যে, তিনি

তার আশেপাশে যারা আছে [তাদের বিরোধিতা] কাটিয়ে উঠেছেন এবং তারা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছে। তখন সে আমাদের বলল: তাই যদি হয়, তবে তারা যেন তাঁর প্রতি আনুগত্য দেখায়, সেটাই তাদের জন্য অপেক্ষাকৃত শ্রেয়। আমি তোমাদেরকে আমার নিজের সম্বন্ধে বলব। আমি 'দাজ্জাল' এবং শীঘ্রই আমাকে এই স্থান ত্যাগ করার অনুমতি দেয়া হবে। সুতরাং আমি এই স্থান ত্যাগ করব এবং পৃথিবীতে বিচরণ করব, এবং চল্লিশ রাতের ভিতরে, হেন কোন নগরী নেই যেখানে আমি অবতরণ না করব, কেবল মক্কা ও তায়বা (অর্থাৎ মদীনা) ছাড়া। এই দু'টো (স্থান) আমার জন্য নিষিদ্ধ (এলাকা) এবং আমি এ দু'য়ের কোনটাতেই প্রবেশের চেষ্টা করব না। তরবারী হাতে একজন ফেরেশতা আমার মুখোমুখি হবেন এবং আমার পথ রোধ করবেন এবং সেখানে যাওয়ার প্রতিটি রাস্তা পাহারা দেয়ার জন্য ফেরেশতাগণ থাকবেন। তখন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তার হাতের লাঠি দিয়ে মিম্বরে আঘাত করে বললেন: 'তাইবা' মানে মদীনা। আমি কি তোমাদের (দাজ্জাল সম্বন্ধে) এরকম একটা বর্ণনা শুনাইনি? মানুষজন বললো: হ্যাঁ এবং তামীম দারী বর্ণিত এই বর্ণনা আমার পছন্দ হয়েছিল কেননা আমি তোমাদের তার (দাজ্জালের) ব্যাপারে মদীনা ও মক্কা সংক্রান্ত যে বর্ণনা দিয়েছিলাম, তার সাথে এই বর্ণনা মিলে যায়। লক্ষ্য কর সে (দাজ্জাল) সিরিয়ার সমুদ্রে (ভূমধ্যসাগরে) রয়েছে। না, ইয়েমেন সাগরে (আরব সাগর) রয়েছে। না, তার বিপরীতে, সে পূর্ব দিকে রয়েছে, সে পূর্ব দিকে রয়েছে, সে পূর্বদিকে রয়েছে এবং তিনি পূর্বদিকে তার হাত দিয়ে নির্দেশ করে দেখান। আমি (ফাতিমা বিন্‌তে ক্বায়েস) বললাম: আমি এটা {অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)-এর কাছ থেকে পাওয়া এই বর্ণনা} আমার মনে সংরক্ষণ করলাম।

(সহীহ্ মুসলিম)

এই হাদীস থেকে এটা খুবই স্পষ্ট যে, যখন 'দাজ্জালকে' পৃথিবীতে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল, তখন তার ভৌগোলিক অবস্থান ছিল ঐ দ্বীপে, এবং ঐ দ্বীপ থেকেই, 'পবিত্রভূমিকে' অ-ইহুদী শাসন থেকে মুক্ত করে নিজেকে 'মসীহ্' বলে জাহির করার তার যে প্রয়াস তার সূচনা হবার কথা। সে দ্বীপটা তাহলে কোন দ্বীপ ছিল?

ব্রিটেন সেই দ্বীপ

আমাদের মতে, হাদীসে বর্ণিত ঐ দ্বীপটি ছিল ব্রিটেন। আমাদের এই দাবীর সপক্ষে যে প্রমাণাদি রয়েছে তা সত্যিই অভাবনীয়। ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখা যাক। ১৯১৭ সালে ব্রিটেনের "দ্বীপের" সরকার, ব্যালফর ঘোষণা (Balfour Declaration)[১] জারি করে, যেটাতে অবাক হয়ে চেয়ে থাকা পৃথিবীর সামনে তারা পবিত্রভূমি'তে 'ইহুদীদের জাতীয় বাসস্থান' স্থাপনকে সমর্থন করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। তারপরে

[১] আর্থার জেম্‌স ব্যালফর (১৮৪৮-১৯৩০), ব্রিটিশ কূটনীতিক, ১৯১৭ সালে প্রধানমন্ত্রী ডেভিড লয়েড জর্জের মন্ত্রীসভায় পররাষ্ট্র-সচিব ছিলেন। এর আগে ১৯০২ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত তিনি নিজে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ সরকার যুক্তরাষ্ট্রে যে মিশন পাঠিয়েছিল, তিনিই তার নেতৃত্ব দেন।

১৯১৭-৮ সালে যে বাহিনী তুর্কী বাহিনীকে পরাভূত করে এবং 'পবিত্রভূমিকে' মুসলিম শাসনমুক্ত করে, তা ছিল জেনারেল অ্যালেনবীর নেতৃত্বে এক ব্রিটিশ বাহিনী। 'লীগ অব নেশন'-এর প্রদত্ত সনদ বলে ১৯১৯ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত ব্রিটেন 'পবিত্রভূমি'-র উপর শাসন করে। এই সময়টাতে বিশাল সংখ্যক ইউরোপীয় ইহুদীদের 'পবিত্রভূমিতে' প্রত্যাবর্তনের ঘটনা গোটা পৃথিবী প্রত্যক্ষ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য ইহুদীদের প্রতি জার্মানদের প্রচণ্ড [জাতিগত] ঘৃণা, আর পরবর্তীতে হিটলারের উত্থানের মিলিত ফলস্বরূপ ইহুদীদের উপর পাইকারী হারে দমন-নির্যাতন এমন ভাবে বৃদ্ধি পায়, যার ফলে ইউরোপ থেকে 'পবিত্রভূমিতে' ইহুদীদের প্রত্যাবাসন নাটকীয়ভাবে বেড়ে যায়। (প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মান ইহুদীরা ব্রিটেনের সাথে এই সমঝোতা করে যে, তারা যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধে ব্রিটেনের পক্ষে টেনে আনবে, যদি ব্রিটেন তার পরিবর্তে যুদ্ধে জয়লাভ করার পর পবিত্রভূমিকে তাদের কাছে হস্তান্তরের অঙ্গীকার করে তাহলে)। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৮ সালে শিশু ইসরাঈলের জন্মলাভ প্রক্রিয়ায় ব্রিটেন 'ধাত্রী' রূপে কাজ করে, অর্থাৎ ইসরাঈল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণার ব্যাপারে ব্রিটেন সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। উপরন্তু আমরা এটাও ভেবে দেখতে পারি যে, মধ্যযুগে আরব বিশ্ব থেকে ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে ব্রিটেনের দ্বীপের [দ্বীপপুঞ্জের] দূরত্ব প্রায় এক মাসের যাত্রাপথ [সমুদ্রপথে]। এটাও লক্ষ্য করা জরুরি যে, ব্রিটিশরা গুপ্তচরবৃত্তিতে পারদর্শিতা লাভ করেছে। শারলক হোম্‌স এবং জেমস্ বন্ডের চলচ্চিত্রসমূহ আদতে Lawrence of Arabia-র গল্পরূপের সমতূল্য।

ব্রিটেনকে আমরা যেভাবে ঐ হাদীসে উল্লেখিত দ্বীপ বলে সনাক্ত করেছি, তার সাথে এখনো কেউ কেউ দ্বিমত পোষণ করবেন, এটা খুবই সম্ভব। আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে ঐসব ব্যক্তিদের অনুগ্রহপূর্বক আমাদের ভুল ধরিয়ে দিতে আহ্বান জানাব। তা করতে গিয়ে তাদের অবশ্যই হাদিসের ঐ দ্বীপটি যে কোন্ দ্বীপ তা সনাক্ত করতে হবে এবং তাদের দাবীর সপক্ষে এবং আমাদের দাবীর বিপক্ষে যুক্তি প্রদান করতে হবে।

আর তাই আমরা এই ধারণায় উপনীত হয়েছি যে, ঐ হাদীস আমাদের অবগত করেছে যে, যখন 'দাজ্জালকে' পৃথিবীতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এবং যখন সে 'এক বছরের মত একটা দিনে' নিজেকে 'মসীহ্' বলে জাহির করার মিশন শুরু করেছিল, তখন ব্রিটেনের দ্বীপ থেকে সে তা শুরু করেছিল। আমরা আরো লক্ষ্য করেছি যে ঐ সময়টাতে ব্রিটেন পৃথিবীর 'নিয়ন্তা রাষ্ট্রের' ভূমিকা পালন করছিল। দ্বিতীয়ত আমরা এও লক্ষ্য করেছি যে 'নিয়ন্তা রাষ্ট্র' থাকা অবস্থায় ব্রিটেন পৃথিবীর টাকা পয়সার উপর তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। Bank of England এর মাধ্যমে এই কার্য সমাধা করা হয়। বাস্তবিকই তখনকার দিনে লন্ডন ছিল পৃথিবীর অর্থনৈতিক রাজধানী।

কিন্তু তারপরে আমরা লক্ষ্য করলাম যে, সময়ের ধারায় এমন একটা ক্ষণ এল যখন এক আজব ও রহস্যজনকভাবে পৃথিবীর 'নিয়ন্তা রাষ্ট্র' হিসাবে ব্রিটেনের

ভূমিকার অবসান ঘটলো এবং যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনের স্থলাভিষিক্ত হলো। এই পালাবদলের প্রক্রিয়া আপাত দৃষ্টিতে শুরু হয়েছিল একটি যুদ্ধের মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। আর এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় আর একটি যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। আমাদের মতে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানের সময়টা ছিল এমন একটা সময় যখন 'দাজ্জাল' 'একটি বছরের মত একটি দিন' থেকে 'একটি মাসের মত একটি দিন'-এর পর্বে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা যেন তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি সহকারে এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণ করি। কেননা 'দাজ্জাল' যে ক্ষণটিতে 'একটি মাসের মত এক দিন' থেকে 'একটি সপ্তাহের মত এক দিনে' নিজের অবস্থান নেবে, সেই ক্ষণটিকে সনাক্ত করার ব্যাপারে এই পর্যবেক্ষণ থেকে বিভিন্ন সূত্র পাওয়া যাবে।

১৯১৪ সালের গ্রীষ্মকালে বসনীয়ার সারায়েভো শহরে এক সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর Arch Duke Franz Ferdinand-এর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। যদিও একজন সার্বিয়া-বাসী ঐ ঘটনার জন্য সরাসরিভাবে দায়ী, কিন্তু তার পদচিহ্ন অনুসরণ করলে ঘটনার পরিকল্পনার উৎস রাশিয়ায় গিয়ে পৌঁছায়। ঐ হত্যাকান্ডের পরিকল্পনা যে করেছিল, সে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন পদচিহ্ন রেখে গিয়েছিল যা রাশিয়ায় গিয়ে পৌঁছায়, এবং সে চেয়েছিল অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী যেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ঐ হত্যাকাণ্ডের পেছনে সত্যিকার লক্ষ্য রাশিয়া ছিল না, বরং তা ছিল রাশিয়ার এক মিত্র, ব্রিটেন। অপর লক্ষ্যটি ছিল ওসমানিয়া ইসলামি সাম্রাজ্য, যার ধ্বংস সাধন করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, আর সেই ধ্বংসকার্য ব্রিটেনকে সমাধা করতে হয়েছিল। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী যখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, ব্রিটেন ও ফ্রান্স তড়িঘড়ি করে রাশিয়ার সমর্থনে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। আর অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর পক্ষে অবস্থান নিয়ে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার মাধ্যমে জার্মানী তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল। উক্ত হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পেছনে মূল পরিকল্পনা ছিল ব্রিটেনকে যুদ্ধে জড়িয়ে তার অর্থনীতিকে দুর্বল করে দেয়া, যার সুবাদে পৃথিবীর 'নিয়ন্তা রাষ্ট্র' হিসাবে ব্রিটেনের মর্যাদার অবসান ঘটবে এবং অপর একটি রাষ্ট্র ['নিয়ন্তা রাষ্ট্র' হিসাবে] তার স্থলাভিষিক্ত হবে। ঐ সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের হোতারা এমনই শয়তানসুলভ ধূর্ত ছিল যে [ঐ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে] একই সাথে তারা ওসমানিয়া ইসলামি সাম্রাজ্যকে আক্রমণ করতে সক্ষম হল। ঐ রাজ্য তখনও 'পবিত্রভূমির' মুক্তি, 'পবিত্রভূমিতে' ইহুদীদের প্রত্যাবর্তন, এবং ইসরাঈল রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে পর্যাপ্ত অন্তরায় সৃষ্টি করছিল। সেই বাধা অতিক্রম করার সম্ভাব্য উপায় ছিল যুদ্ধ। আর তাই একটা সুচারু ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনার মাধ্যমে ওসমানিয়া মুসলিম সাম্রাজ্যকে জার্মানীর পক্ষ হয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য করা হয়। ঘটনার ধারাবাহিকতায় তারপর ব্রিটেনকে যে কেবল ওসমানিয়া ইসলামি রাষ্ট্র আক্রমণ

করতে বা ধ্বংস করতে ব্যবহার করা হল তাই নয়, বরং ইসলামি খেলাফত ধ্বংসের কাজেও তাকে ব্যবহার করা হল। (The Caliphate, the Hijaz and the Saudi-Wahhabi Nation-State নামক আমাদের গ্রন্থটি দেখুন)।

কিন্তু ১৯১৪ থেকে ১৯১৬ পর্যন্ত ব্রিটেনের জন্য যুদ্ধটা ছিল এক বিপর্যয়। প্রথমত জার্মান সাবমেরিন ব্রিটেনের কাছ থেকে সমুদ্রের নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নেয়। দ্বিতীয়ত জার্মানী ফ্রান্স দখল করে এবং প্যারিসে এক জার্মানপন্থী সরকার অধিষ্ঠিত করে। তৃতীয়ত রাশিয়ান সৈন্যরা দলত্যাগ করে পিছু হটে যাচ্ছিল। আর সবশেষে ১৯১৬ সালের দিকে ব্রিটেন এমন করুণ অবস্থায় উপনীত হল যে সে অনেকটা একা হয়ে পড়ল এবং দুর্ভিক্ষের হুমকির সম্মুখীন হল। তারপর ১৯১৬ সালে নাটকীয় পরিবর্তন হল। ইহুদীরা ব্রিটিশ সরকারের সাথে যোগযোগ করল এবং যুদ্ধ শেষে ইহুদীদের কাছে পবিত্রভূমি হস্তান্তরের অঙ্গীকারের বিনিময়ে ব্রিটেনের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধে নামানোর টোপ দিল। ব্রিটেন এই টোপ গিলল। ইহুদীরা তখন যুক্তরাষ্ট্রে তাদের বিশাল প্রচারযন্ত্রকে কাজে লাগাল এবং ১৯১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রকে ব্রিটেনের পক্ষে যুদ্ধে নামাতে সফল না হওয়া পর্যন্ত প্রভাব বিস্তারের সকল উপায় ব্যবহার করতে থাকল। এক বৎসর পরে ব্যালফর ঘোষণা (Balfour Declaration) জারি করে ব্রিটেন তার করণীয়টুকু করল। ১৯১৬ সাল আরব উপদ্বীপে ব্রিটিশ গুপ্তচরদের সফল কর্মকাণ্ডের সমাপনীর জন্যও বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে রইল।

ব্রিটেন দুটো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন করতে সফল হল; কৌশলগতভাবে দুটোই ওসমানিয়া মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য প্রচণ্ড আঘাত হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্রথমটি ছিল ব্রিটেন ও আবদুল আজিজ ইব্নে সউদের (যিনি তখন রিয়াদের শাসনকর্তা ছিলেন) ভিতর স্বাক্ষরিত Treaty of Mutual Assistance and Benevolent Neutrality নামক চুক্তি। ব্রিটেন যার জন্য ব্রিটিশ ট্রেজারী থেকে আবদুল আজিজ ইব্নে সউদকে মাসে পাঁচ হাজার পাউন্ড মাসোহারা দানের সামান্য মূল্য পরিশোধ করতে লাগল। দ্বিতীয় ব্যাপারটি ছিল মক্কা এবং হিজাজের ওসমানিয়া নিয়োগকৃত শরীফ হোসেনকে প্রভাবিত করে ওসমানিয়া খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করানো। এক্ষেত্রে ব্রিটেনকে সত্তর লক্ষ পাউন্ডের রাজকীয় মূল্য পরিশোধ করতে হয় (The Caliphate, the Hijaz and the Saudi-Wahhabi Nation-State গ্রন্থটি দেখুন)।

আর তাই ১৯১৬ সাল যুদ্ধের গতি পরিবর্তন করে দিল এবং পরিণতিতে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ইহুদীদের জন্য বিজয় এনে দিল। জার্মানী পরাজিত হল, কিন্তু তার চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ওসমানিয়া ইসলামি রাষ্ট্রকে ভেঙ্গে দেয়া হল আর তার স্থলে ধর্মনিরপেক্ষ তুরস্ক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটল। আর বাস্তবিকই তুরস্কের ধর্মনিরপেক্ষ নেতৃত্ব তড়িঘড়ি করে সেই ব্রিটেনের সাথেই An Offensive and

Defensive Alliance নামক চুক্তিতে আবদ্ধ হল, যে ব্রিটেন কিনা ওসমানিয়া ইসলামি রাষ্ট্রের বিলুপ্তিতে প্রধান ভূমিকা রেখেছিল। কিন্তু যুদ্ধে ব্রিটেন এমনভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল যে 'নিয়ন্তা রাষ্ট্র' হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনকে প্রতিস্থাপন করল। এই ব্যাপারটা নিশ্চিত হয় কিছুটা দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে এবং বাকিটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে। উদাহরণ স্বরূপ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মার্কিন সেনাপতি ডোওয়াইট আইযেনহাওয়ার ছিলেন মিত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। তারপর ১৯৪৪ সালে নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আহুত Bretton Woods কনফারেন্সে দেয়া বাণী ব্রিটেনের হ্রাসকৃত মর্যাদাকে নিশ্চিত করে, যখন মার্কিন ডলারকে পাউন্ড-স্টার্লিং এর স্থলে নতুন আন্তর্জাতিক মুদ্রা হিসাবে নির্বাচিত করা হয়। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আই-এম-এফ এবং বিশ্বব্যাংক পৃথিবীর প্রধান অর্থনৈতিক সংস্থা হিসাবে Bank of England-এর স্থলাভিষিক্ত হল। আর লন্ডনের পরিবর্তে ওয়াশিংটন পৃথিবীর অর্থনৈতিক রাজধানীর অবস্থান গ্রহণ করল এবং সেই সুবাদে পৃথিবীর অর্থভাণ্ডারের নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল। Marshall Plan এর মাধ্যমে যুদ্ধ শেষে যুক্তরাষ্ট্রেকে ব্রিটিশ এবং ইউরোপীয় অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করতে হয়। ১৯৫৬ সালে সুয়েজ সংকটের সময় এবং তারপর ১৯৬৩ সালে কিউবার মিসাইল সংকটের সময়, পৃথিবীর নতুন 'নিয়ন্তা রাষ্ট্র' হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র নিজের ভূমিকাকে সফলভাবে প্রদর্শন করে। ঠিক যেভাবে তখনকার 'নিয়ন্তা রাষ্ট্র' ব্রিটেন 'পবিত্রভূমির' ব্যাপারে মোহাবিষ্ট ছিল (উদাহরণ স্বরূপ ব্যালফর ঘোষণা) আর ব্রিটিশ জনগণ ঐ অবাক করা মোহের কারণ ব্যাখ্যা করতে নিজেরাই অপারগ ছিল, একইভাবে নতুন 'নিয়ন্তা রাষ্ট্র' যুক্তরাষ্ট্র, 'পবিত্রভূমির' ব্যাপারে অদ্ভূতভাবে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ল, আর এক্ষেত্রেও আমেরিকান জনগণ নিজেরাই [তাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের] সেই মোহের কারণ ব্যাখ্যা করতে অপারগ। উদাহরণস্বরূপ ১৯৪৮ সালে ইসরাঈল রাষ্ট্র যখন তার স্বাধীনতা ঘোষণা করল, তখন যুক্তরাষ্ট্র ছিল পৃথিবীর প্রথম দেশ যে ঐ নতুন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। সেই থেকে আজ অবধি ইসরাঈলের সকল সুদিন ও দুর্দিনে যুক্তরাষ্ট্রই তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। যুক্তরাষ্ট্র ইসরাঈলকে বিশাল অঙ্কের অর্থ, অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তা প্রদান করে এসেছে। বাকী সারা বিশ্বকে যুক্তরাষ্ট্র যে সমষ্টিগত অনুদান দিয়ে থাকে, কেবল ইসরাঈলকে দেওয়া অনুদান তার চেয়ে বেশী। কিছু মার্কিন অনুদান সরকারী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইসরাঈলে পৌঁছায়, কিন্তু উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অনুদান যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ইহুদীদের মাধ্যমে ইসরাঈলে পৌঁছায়। সামরিক অনুদানের ব্যাপারে বলতে গেলে বলতে হয় যে, এর আংশিক সিংহদ্বার দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে আর আংশিক গিয়েছে চোরাপথে (গোপন মার্কিন পারমাণবিক তথ্য ইসরাঈলের কাছে পাচার করেছিলেন যে জনাথন পোলার্ড তার ব্যাপারটাই এই পর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য)। যার ফলশ্রুতিতে পারমাণবিক এবং তাপ-পারমাণবিক ক্ষমতা আহরণ করে ইসরাঈল পৃথিবীর পারমাণবিক শক্তিসমূহের সাথে সমান তালে নিজের অবস্থানকে উন্নীত করেছে।

আমেরিকার উপর সেপ্টেম্বর ১১-এর আক্রমণের ঠিক আগে ইসরাঈল ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেকার উদ্ভট, অস্বাভাবিক, রহস্যময় ও ব্যাখ্যাতীত সম্পর্ক আরো খোলাখুলিভাবে প্রদর্শিত হলো। The Durban World Conference on Racism and Racial Discrimination, ফিলিস্তিনী জনগণের নিপীড়নের জন্য ইসরাঈলকে কঠোর সমালোচনা করে। বিশ্বব্যাপী নিন্দায় তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে ইসরাঈল ঐ কনফারেন্স থেকে ওয়াক আউট করে। কেবল আরেকটি দেশ ইসরাঈলের সাথে ঐ ওয়াক আউটে যোগদান করে তার সাথে সংহতি প্রকাশ করেছিল। সে দেশটি ছিল যুক্তরাষ্ট্র!

আমাদের অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, দাজ্জাল তার জীবনের 'একমাসের মত একদিন' পর্যায়ে ভৌগোলিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত। আমরা এখানে, এই গ্রন্থে যুক্তি দেখাব যে, বর্তমানে আমরা এমন এক সময়ে উপনীত হয়েছি, যখন দাজ্জাল পৃথিবীতে তার জীবনের ঐ পর্যায়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, যখন তার 'একদিন হবে এক সপ্তাহের মত', যে সময়টাতে দেখা যাবে যে 'নিয়ন্তা রাষ্ট্র' হিসাবে ইসরাঈল যুক্তরাষ্ট্রের স্থলাভিষিক্ত হবে। সত্যি বলতে কি আমরা যুক্তরাষ্ট্রের উপর ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলাকে 'নিয়ন্তা রাষ্ট্রের' পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সূচনা হিসাবে চিহ্নিত করেছি। (দেখুন পরিশিষ্ট দুই: 'আমেরিকার উপর সেপ্টেম্বর ১১-র আক্রমণের প্রেক্ষিতে মুসলিম প্রতিক্রিয়া')।

কুর'আন নিজের ব্যাপারে ঘোষণা করেছে যে, '*সে সবকিছু ব্যাখ্যা করে*' (কুর'আন, সুরা নাহ্‌ল ১৬:৮৯); সেই সুবাদে মানবতার ধর্মীয় ইতিহাসে সংঘটিত সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনাবলী, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক ধ্বংস হয়ে যাওয়ার প্রায় দুই হাজার বৎসর পর 'পবিত্রভূমিতে' ইসরাঈল রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা দিতে সে নিশ্চয় সক্ষম ।

কুর'আনের ভিতরে ঐ ব্যাখ্যা খুঁজে বের করার চেষ্টা করার পিছনে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, আল্লাহ্ প্রদত্ত ঐ দিক নির্দেশনার প্রতি মনোযোগ দেয়া, যা সারা বিশ্বের মুসলিম জনগণকে 'পবিত্রভূমিতে' বিকাশমান আজব ঘটনাবলীর ব্যাপারে সঠিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে সহায়তা করবে।

ঐশ্বরিক ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে যা সবচেয়ে সতর্কতামূলক এবং যা ইতোমধ্যেই বাস্তবরূপ লাভ করেছে, অর্থাৎ ঐ ভবিষ্যদ্বাণী যে আল্লাহ্ তা'আলা 'শেষ সময়' ইহুদী জনগণকে 'পবিত্রভূমিতে' ফিরিয়ে আনবেন — তা পরীক্ষা করার দিকে মনোযোগ দেয়ার আগে মির্জা গোলাম আহমদের বিষয়টা একটু খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। সে ছিল 'মসীহ্‌র' প্রত্যাবর্তনের ভবিষ্যদ্বাণীকে বিকৃত করার ক্ষেত্রে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মিথ্যাচারের হোতা।

নবম অধ্যায়

মির্জা গোলাম আহমদ : এক 'ভণ্ড-মসীহ্'

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত: আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বলেন, "যাঁর হাতে আমার আত্মা তাঁর শপথ, নিশ্চিতভাবে মরিয়মের পুত্র {ঈসা (আঃ)} শীঘ্রই তোমাদের ভিতর অবতীর্ণ হবেন এবং মানবকুলের সঠিক বিচার করবেন (একজন সুশাসক হিসাবে); তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন এবং শুকরদের হত্যা করবেন, আর তখন কোন জিযিয়া কর থাকবে না। অর্থের এমন প্রাচূর্য থাকবে যে কেউ তা গ্রহণ করতে চাইবে না, এবং আল্লাহ্‌র কাছে (প্রার্থনার) একটি সেজদা সারা পৃথিবী এবং তাতে যা কিছু আছে তার চেয়ে শ্রেয় হবে।" আবু হুরায়রা (রাঃ) আরো বলেন, তোমরা চাইলে (পবিত্র কিতাবের এই আয়াত) পড়তে পার:

"আর আহলে কিতাবের (ইহুদী ও খৃস্টান) মাঝে এমন কেউ নেই যে ঈসা (আঃ)-এর উপর তাঁর মৃত্যুর পূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য হবে না। এবং শেষ বিচারের দিনে তিনি [ঈসা (আঃ)] তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবেন।"

(কুর'আন, সুরা নিসা ৪:১৫৯)
(সহীহ বুখারী)

মির্জা গোলাম আহমদ ছিল একজন পাঞ্জাবী মুসলিম, যে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে কাদিয়ান শহরে বসবাস করত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ প্রায় শুরু হতে যাচ্ছে এরকম একটা সময়ে সে মৃত্যুবরণ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে পৃথিবীর এক 'নিয়ন্তা রাষ্ট্রের' (ব্রিটেন) কাছ থেকে, অপর 'নিয়ন্তা রাষ্ট্রের' (যুক্তরাষ্ট্র) কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর দেখার জন্য সে বেঁচে থাকে নি। না সে ১৯৪৮ সালের ইসরাঈল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং 'পবিত্রভূমিতে' ইহুদীদের প্রত্যাবর্তন দেখে যেতে পেরেছিল। আমরা যা দেখতে চলেছি, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অপর নিয়ন্তা রাষ্ট্র, অর্থাৎ ইহুদীরাষ্ট্র ইসরাঈলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর, তাও দেখার জন্য সে বেঁচে থাকেনি। এই গ্রন্থে আশা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে অথবা আরও কম সময়ে সেই হস্তান্তরটি ঘটতে যাচ্ছে।

'মসীহ্‌র' প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী সংশ্লিষ্ট কয়েকটি দাবী করে মির্জা পৃথিবীকে চমকিয়ে দিয়েছিল। সে ভারতে আহমদীয়া আন্দোলনের গোড়া পত্তন করে, এবং তা শীঘ্রই পশ্চিমা জগতে প্রচারকার্য এবং ইউরোপীয়দের আহমদীয়ায় পরিণত করার এক অভাবনীয় অভিযান শুরু করে। ঐ আন্দোলন এলাইজা মোহাম্মদের নেতৃত্বে

পরিচালিত Nation of Islam এর আফ্রিকান-আমেরিকান মুসলিমদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দানের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করে। যার ফলশ্রুতিতে 'মসীহ্‌র' প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে মির্জা বেশীর ভাগ আফ্রিকান-আমেরিকান মুসলিমদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে, বিশেষত, যারা আজ ইমাম ওয়ারিসুদ্দীন মোহাম্মদ অথবা লুই ফারাখানের নেতৃত্বাধীন। সেজন্যই মির্জার দাবীসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য এই গ্রন্থের একটা অধ্যায় উৎসর্গ করাটা আমাদের জন্য জরুরি হয়ে পড়েছে।

ইতিহাসের এই শেষ পর্বে আজ যখন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বিকাশমান তখন মির্জা গোলাম আহমাদের অনুসারীদের কাছে এবং যারা তার শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, তাদের কাছে এ ব্যাপারটা উত্তরোত্তর আরো বেশী পরিস্কার হয়ে যাওয়া উচিত যে, তার নিম্নলিখিত দাবীসমূহ মিথ্যা ছিল:

- সে ছিল ইমাম আল-মাহদী; 'মসীহ্‌র' প্রত্যাবর্তনের সময় তার মুসলিমদের নেতা হওয়ার কথা;
- 'মসীহ্‌র' প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী তার মাঝে পূর্ণতা লাভ করেছিল;
- মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুওয়াতের আওতায় তাকে আল্লাহর তরফ থেকে নবী হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

কুর'আন এবং হাদীসকে ব্যবহার করে মির্জার মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনাবলী, বিশেষত 'পবিত্রভূমিতে' ইহুদী জনগণের প্রত্যাবর্তন ও ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাখ্যা চেয়ে, এতদ্বারা আহমদীদেরকে যে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, আমরা আশা করব যে তারা তাতে সাড়া দেবে। যদি তারা সেটা করে তবে আমরা নিশ্চিত যে তারা 'ভণ্ড-মসীহ্ দাজ্জাল', 'ইয়াজুজ-মাজুজ', ইমাম মাহদী এবং 'মসীহ্‌র' (মরিয়ম-পুত্র ঈসা) প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে নতুন ধারণা লাভ করবে, এমন ধারণা যা মির্জা গোলাম আহমদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তাদের পূর্ববর্তী ধারণার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এই গ্রন্থখানি আহ্‌মদীদের সাহায্যার্থে লেখা হয়েছে, কারণ তারা মানবকুলের ধর্মীয় ইতিহাসে সংঘটিত সবচেয়ে আজব ঘটনা অর্থাৎ 'পবিত্রভূমিতে' ইহুদীদের প্রত্যাবর্তনের ঘটনার কুরআনিক ব্যাখ্যা লাভ করতে চায়। আহমদীয়া আন্দোলনের কোন সদস্যের পক্ষে এই গ্রন্থের মৌলিক যুক্তি ও সিদ্ধান্ত বুঝা ও গ্রহণ করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না সে মির্জা গোলাম আহমদের দাবীসমূহ, অর্থাৎ সে [নিজেই] 'মসীহ্' ছিল যে কিনা একদিন ফিরে আসবে, সে ইমাম মাহদী ছিল, এবং আল্লাহ্ নিযুক্ত একজন নবী ছিল, এর সব কয়টি প্রত্যাখ্যান করবে। *'এবং আল্লাহ্ যাকে খুশি তাকে তাঁর আলোর দিকে পরিচালিত করেন!'*

শুধুমাত্র ইহুদীরা কেন, দাজ্জাল প্রতারিত করেছে এমন অনেক ধার্মিক মুসলমানকে, যাদের ঈমান মজবুত করার প্রচেষ্টা সত্যিই বিস্ময়কর। সমস্ত আন্তরিকতার সাথে তাঁরা আহমদীয়া আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং তাঁরা নিশ্চিন্ত ছিলেন যে পৃথিবীতে ইসলামের একমাত্র সঠিক অভিব্যক্তিকে তাঁরা জীবনে ধারণ করেছেন। আসলে দাজ্জাল তাঁদের জন্য যে ফাঁদ পেতে রেখেছিল তাঁরা সে ফাঁদে আটকা পড়ে যান। তাঁরা প্রতারিত হলেন কিভাবে?

আহ্মদীয়া আন্দোলন বিশ্বাস করে যে 'মসীহ্র' প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী, ব্যক্তি মির্জা গোলাম আহমাদের মাঝে বাস্তবতা লাভ করেছিল। এই দাবী যে মিথ্যা তার পক্ষে বেশ কয়েকটা যুক্তি রয়েছে। প্রথমত 'মসীহ্র' প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত হাদীস এটা পরিস্কার করে দেয় যে, যে 'মসীহ্' ফিরে আসবেন তিনি হচ্ছেন 'মরিয়মের পুত্র'। কিন্তু মির্জা গোলাম আহমদ ছিলেন এক পাঞ্জাবী মহিলার পুত্র। দ্বিতীয়ত 'মসীহ্' সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী যদি মির্জার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয়ে থাকত, তাহলে মির্জা নিজের আয়ুষ্কালেই দাজ্জালকে হত্যা করতেন, কারণ এটাই ছিল 'মসীহ্র' করণীয় কাজ। এ বিষয়ের উপর রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) একথাই বলে গেছেন। আমরা এখানে পাঠকের সুবিধার জন্য গোটা হাদীসটাই তুলে দিচ্ছি যা আন্-নাউওয়াস ইব্নে সাম'আন হতে বর্ণিত:

"আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) একদিন সকালে দাজ্জালের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি কখনো তাকে অনুল্লেখযোগ্য বলে বর্ণনা করেন এবং কখনো (তার ফিতনাকে) খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বর্ণনা করেন (এবং আমরা অনুভব করি) যে বুঝিবা সে খেজুরবাগানের মাঝে রয়েছে। বিকালে আমরা যখন তাঁর (পবিত্র নবীর) কাছে গেলাম এবং তিনি আমাদের চেহারায় ভয়ের চিহ্ন দেখতে পেলেন তখন তিনি বললেন: তোমাদের কি হয়েছে? আমরা বললাম: হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ), আজ সকালে আপনি দাজ্জালের কথা বলেছিলেন, কখনো তাকে অনুল্লেখযোগ্য এবং কখনো তাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যার ফলে আমরা ভাবতে শুরু করেছিলাম যে সে কাছের ঐ খেজুর বাগানের কোথাও রয়েছে। তখন তিনি বললেন: দাজ্জাল ছাড়া আরও অনেক কিছু নিয়ে আমি তোমাদের ব্যাপারে চিন্তিত। আমি তোমাদের মাঝে থাকাকালীন সে যদি নিজেকে প্রকাশ করে, আমি তোমাদের হয়ে তার মোকাবেলা করব, কিন্তু আমি না থাকা অবস্থায় যদি সে বেরিয়ে আসে, প্রতিটি মানুষকে নিজে থেকেই তার মোকাবেলা করতে হবে, আর আল্লাহ্ আমার পক্ষ হয়ে প্রতিটি মুসলিমের হেফাজত করবেন (তার অমঙ্গল থেকে নিরাপত্তা দেবেন)। সে (দাজ্জাল) কোঁকড়া চুলের একজন যুবক হবে এবং তার একচোখ কানা থাকবে। আমি তাকে আল-উয্যা ইব্নে কাতানের সাথে তুলনা করি। তোমাদের ভিতরে যে তাকে দেখার জন্য বেঁচে থাকবে তার উচিত হবে তার [দাজ্জাল] উদ্দেশ্যে সুরা কাহাফের শুরুর আয়াতগুলি পড়া। তাকে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থানে দেখা যাবে এবং সে ডানে বাঁয়ে দুষ্কর্ম ছড়াতে থাকবে। হে আল্লাহ্র বান্দা! লেগে থাকো (সত্যের পথে)। আমরা বললাম: হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ), সে কতদিন পৃথিবীতে থাকবে? তিনি বললেন: চল্লিশ দিনের জন্য, এক বছরের মত একদিন, এক মাসের মত একদিন, এক

সপ্তাহের মত একদিন, আর বাকী দিনগুলি হবে তোমাদের দিনগুলির মত। আমরা বললাম: হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ), যেদিনটি এক বৎসরের সমান হবে, একদিনের নামায কি সেই দিনটির জন্য যথেষ্ট হবে? তখন তিনি বললেন: না, তবে তোমরা আনুমানিক হিসাব করে নিবে (এবং তারপর নামায আদায় করতে হবে)। আমরা বললাম: হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ), সে পৃথিবীতে কত দ্রুত হেঁটে বেড়াবে? তখন তিনি বললেন: মেঘ যেভাবে বাতাসে ভেসে বেড়ায় সেরকম। সে মানুষের কাছে আসবে এবং তাদের আমন্ত্রণ জানাবে (একটি ভুল ধর্মের পথে); তারা তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তার আমন্ত্রণে সাড়া দিবে। সে তখন আকাশের উদ্দেশ্যে এক আদেশ জারী করবে: পৃথিবীতে বৃষ্টিপাত হবে এবং ফসল ফলবে। তারপর বিকালে বিচরণরত পশুরা তাদের কাছে উঁচু কুঁজ নিয়ে দুগ্ধপূর্ণ স্তন নিয়ে এবং মাংসল পার্শ্বদেশ নিয়ে ফিরে আসবে। সে তখন আরেক জনগোষ্ঠীর কাছে আসবে এবং তাদের আমন্ত্রণ জানাবে, কিন্তু তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং সে তাদের কাছ থেকে চলে যাবে; তারা খরাপীড়িত হবে এবং তাদের সম্পদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। সে তখন মরুভূমি দিয়ে হেঁটে যাবে এবং মরুভূমিকে বলবে: তোমার সম্পদরাজি নিয়ে এস। সম্পদরাজি বেরিয়ে আসবে এবং তার সামনে মৌমাছির পালের মত জড়ো হবে। (এখানে তেল আবিষ্কার এবং পৃথিবীর আরো বহুবিধ ঐশ্বর্যের কথা বলা হয়েছে)। সে তখন তারুণ্যে ভরা একজনকে ডেকে নেবে, তাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করবে, কেটে টুকরো টুকরো করবে এবং টুকরোগুলোকে এমন দূরত্বে রাখবে যে দূরত্ব সাধারণত তীরন্দাজ ও তার লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে হয়ে থাকে। তারপর সে ঐ যুবককে নাম ধরে ডাকবে এবং সেই যুবক হাসিতে উদ্ভাসিত মুখে সামনে এসে দাঁড়াবে। ঠিক এই সময়টাতে আল্লাহ মরিয়মের পুত্র ঈসাকে পাঠাবেন। দামেশকের পূর্ব দিকে সাদা মিনারের উপর তিনি অবতীর্ণ হবেন, তাঁর পরণে থাকবে হালকা জাফরানী রঙের দুই টুকরো পরিধেয় আর তিনি দুজন ফেরেশতার ডানায় ভর করে থাকবেন। তিনি মাথা ঝুঁকালে তাঁর মাথা থেকে স্বেদবিন্দু ঝরে পড়বে এবং যখন তিনি মাথা উঠাবেন তখন তা মুক্তার মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। প্রতিটি অবিশ্বাসী, যে তাঁর শরীরের গন্ধ পাবে মৃত্যুবরণ করবে, এবং তিনি যতদূর দেখতে পারবেন, ততদূর পর্যন্ত তাঁর নিঃশ্বাস ছড়িয়ে পড়বে। ***তারপর তিনি তার (দাজ্জাল) সন্ধান করবেন যতক্ষণ না তিনি তাকে লুদের সিংহদ্বারে ধরতে পারবেন এবং তাকে হত্যা করবেন।*** *তারপর একটা জনসমষ্টি যাদের আল্লাহ্‌ সুরক্ষা করেছিলেন, তারা মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ)-এর নিকট আসবে, আর তিনি তখন তাদের মুখমণ্ডল মুছে দেবেন আর বেহেশতে তাদের অবস্থান সম্বন্ধে তাদের অবহিত করবেন। এমত অবস্থায় আল্লাহ্‌ ঈসা (আঃ)-এর কাছে নিম্নবর্ণিত ওহী পাঠাবেন: আমি আমার বান্দাদের ভিতর থেকে এমন একদল তৈরী করেছি, যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কেউ টিকে থাকতে পারবে না। তুমি এদের নিয়ে নিরাপদে তূর-এ চলে যাও। এবং তখন আল্লাহ্‌ ইয়াজুজ-মাজুজকে প্রেরণ করবেন যারা প্রতিটি উচ্চভূমি থেকে নেমে আসবে। তাদের প্রথমজন টাইবেরিয়াস হ্রদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তা থেকে পানি পান করবে। আর শেষ জন যখন সেই হ্রদের পাশ দিয়ে যাবে তখন সে বলবে: এখানে একদা পানি ছিল। ঈসা (আঃ) এবং তাঁর সাথীগণ তারপর এখানে (তূর-এ) অবরুদ্ধ হয়ে পড়বেন এবং তাঁদের অবস্থা এমন শোচনীয় হবে যে, তাঁদের কাছে একটি ষাঁড়ের মাথা একশত দীনারের চেয়ে বেশী প্রিয় হবে। আল্লাহর রাসূল ঈসা (আঃ) এবং তাঁর সাথীগণ আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করবেন, যিনি তাদের কাছে*

পতঙ্গ পাঠাবেন (সেগুলো ইয়াজুজ-মাজুজদের ঘাড়ে আক্রমণ করবে) এবং সকালে তারা একযোগে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ্‌র রাসূল ঈসা (আঃ) এবং তাঁর সাথীগণ তখন মাটিতে নেমে আসবেন এবং তাঁরা তখন পৃথিবীকে এক সমতলভূমি হিসাবে দেখতে পাবেন, যেখানে এমন কোন স্থান থাকবে না যাতে পচনজনিত গন্ধ নেই। আল্লাহ্‌র রাসূল ঈসা (আঃ) এবং তাঁর সাথীগণ তারপরে আল্লাহ্‌র কাছে সবিনয় প্রার্থনা করবেন, তখন আল্লাহ্ একঝাঁক পাখি প্রেরণ করবেন, যাদের গলা হবে বুখ্‌তী উটের গলার মত বিশাল এবং তারা তাদের [মৃত দেহগুলি] বয়ে নিয়ে যাবে এবং আল্লাহ্ যেখানে চান সেখানে গিয়ে ফেলবে। তারপর আল্লাহ্ বৃষ্টিদান করবেন যা কোন কাদা দিয়ে তৈরী ইটের ঘর বা উটের পশমের তাঁবু আটকে রাখতে পারবে না, এবং সেই বৃষ্টি পৃথিবীকে ধুয়ে-মুছে আয়নার মত করে দেবে। তারপর পৃথিবীকে বলা হবে পুনরায় ফল উৎপাদন করতে এবং তার নিয়ামতসমূহ পুনঃস্থাপন করতে এবং, তার ফলে, সেখানে এত বড় ডালিম উৎপন্ন হবে যে একদল মানুষ একটি ফল থেকে খেতে পারবে এবং তার খোসার নিচে আশ্রয় নিতে পারবে। একটি দুধেল গাভী এত দুধ দেবে যে, একটি সম্পূর্ণ দল তা থেকে পান করতে পারবে। দুধেল উট এমন (বিশাল পরিমাণ) দুধ দেবে যে একটি গোটা গোত্র সে দুধ পান করতে পারবে এবং একটি দুধেল ভেড়া এমন দুধ দেবে যে, একটি গোটা পরিবার তা থেকে পান করতে পারবে। ঐ সময় আল্লাহ্ প্রশান্তিময় বায়ু প্রবাহিত করবেন যা মানুষকে স্বস্তি দান করবে, এমনকি তাদের বগলেও। তিনি [আল্লাহ্] প্রতিটি মুসলিমের জীবন হরণ করবেন এবং কেবলমাত্র দুষ্ট লোকেরা বেঁচে থাকবে যারা গর্দভকুলের মত ব্যভিচারে লিপ্ত হবে এবং তাদের উপর শেষ প্রহর নেমে আসবে।"

(সহীহ মুসলিম)

হাদীসখানিতে পরিস্কার যে, আসল 'মসীহ্' ঈসা (আঃ) ভণ্ড 'মসীহ্' দাজ্জালকে হত্যা করবেন: *"তারপর তিনি তার (দাজ্জাল) সন্ধান করবেন যতক্ষণ না তিনি তাকে লুদের সিংহদ্বারে ধরতে পারবেন এবং তাকে হত্যা করবেন।"* মির্জা গোলাম আহমদ যদি এই হাদীসের ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর শর্ত পূরণ করত, তাহলে তাকে দাজ্জালকে হত্যা করতে হত। সেক্ষেত্রে মির্জার মৃত্যুর পরে ভণ্ড 'মসীহ্' দাজ্জাল তার মিশন অব্যাহত রাখার আর কোন সম্ভাবনাই থাকত না। অথচ, যায়োনিস্ট আন্দোলনের সূচনার প্রায় পরপরই মির্জার মৃত্যু হয়েছে এবং সে দাজ্জালের বিশাল বিজয় অর্থাৎ ভণ্ড 'ইসরাঈল' রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং 'পবিত্রভূমিতে' ইহুদীদের প্রত্যাবর্তন দেখে যাওয়ার জন্য বেঁচে থাকে নি। মানবকুলের সমগ্র ধর্মীয় ইতিহাসে এমন অবাক ঘটনা আর একটিও নেই, যার তুলনা ভণ্ড 'মসীহ্' দাজ্জালের কৃতিত্বের সাথে করা যায় (পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখুন)।

তৃতীয়ত এ ব্যাপারে এক পাহাড় পরিমাণ প্রমাণ রয়েছে (যারা দুই চক্ষু দিয়ে দেখেন তাদের চোখে তা ধরা পড়বে) যে, আমরা এখনও ভণ্ড 'মসীহ্' দাজ্জালের যুগেই বসবাস করছি। উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বলা যেতে পারে:

- রাসূল (সাঃ)-এর ঐ ভবিষ্যদ্বাণী, যাতে তিনি দাজ্জাল সম্বন্ধে ঘোষণা করেছিলেন যে, সে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার পরিবর্তে তাকে উপাসনা করাতে সচেষ্ট হবে, আজকের দিনের বস্তুবাদের মধ্যে নিহিত দর্শনগত শির্ক সেটাকে বাস্তবায়িত করেছে। বস্তুবাদের আক্রমণের সূত্রপাত হয় ব্রিটেনের দিক থেকে। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত তামীম দারীর হাদীস পরিস্কারভাবে এই ইঙ্গিত দিয়েছিল যে, যখন দাজ্জালকে মুক্তি দেওয়া হবে তখন সে একটি দ্বীপে থাকবে এবং সেই দ্বীপ থেকেই সে মানবকুলের উপর এবং ইহুদীদের উপর তার আক্রমণের সূচনা করবে। আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে ঐ দ্বীপ ব্রিটেন ছাড়া আর কোন দ্বীপ হতে পারে না।
- আধুনিক পশ্চিমা জ্ঞানতত্ত্বের দর্শনগত শির্ক 'অন্তদৃর্ষ্টিসম্পন্ন আধ্যাত্মিক জ্ঞানের' অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, এবং এই ব্যাপারটা রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাবধানবাণীতে স্পষ্ট রয়েছে যেখানে তিনি বলেছেন যে, ভণ্ড 'মসীহ্' দাজ্জাল 'একচোখ দিয়ে দেখে' কিন্তু 'তোমাদের প্রভু একচোখ বিশিষ্ট নন'। আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা এই একচক্ষু বিশিষ্ট জ্ঞানতত্ত্বকে অবলম্বন করেছে। এবং তারপর তা আধুনিক পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে বাকী মানবকুলের কাছে সঞ্চারিত করেছে। আবারও, জ্ঞানতত্ত্বভিত্তিক এই আক্রমণের নেতৃত্ব দেয় ব্রিটেন।
- রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণীতে যে ঘোষণা করেছিলেন যে, 'ভণ্ড-মসীহ্' দাজ্জালের লক্ষ্য হবে মানবকুলকে দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার পরিবর্তে তার নিজের উপাসনা করানো, আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কাঠামোতে নিহিত বিশ্বজনীন রাজনৈতিক শির্ক সেই ভবিষ্যদ্বাণীকে বাস্তবায়িত করেছে। আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা, আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে, যা ঘোষণা করে যে রাষ্ট্র হচ্ছে সার্বভৌম, রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সর্বময়, এবং রাষ্ট্রের আইন হচ্ছে সর্বোচ্চ আইন। আল্লাহ্ কোনকিছুকে 'হারাম' ঘোষণা করে থাকলেও রাষ্ট্র তাকে 'হালাল' বানাতে পারে, অর্থাৎ সেটাকে বৈধ করতে পারে। এটাই হল নির্ভেজাল শির্ক, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে মুসলিমরাও ব্যাপারটা অনুধাবন করতে পারছেন না। আবারও, আক্রমণের এই ধারার নেতৃত্বও দিয়েছিল ব্রিটেন। গোটা বিশ্বই এখন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং ধর্মনিরপেক্ষ জাতিসংঘ এই ব্যবস্থার নেতৃত্বে রয়েছে। কিন্তু মির্জা গোলাম আহমদ যখন মৃত্যুবরণ করে তখনও এই ব্যাপারটা ঘটেনি।
- [পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া] বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব, যা পৃথিবীকে আকাশ ও মহাশূন্য ভ্রমণ, টেলিফোন ও অন্যান্য আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি এনে দিয়েছে, যা এগুলির দৃশ্যত উপকারী দিকগুলির সাথে মারাত্মক ক্ষতিকর দিকগুলিকে বেশ প্রতারণার সাথে একাকার করে দিয়েছে। ঐ অসম্পূর্ণ বিপ্লবের জন্য এখনও এমন সব আশ্চর্য ও অবাক করা কার্যকলাপ সমাধা করা বাকী রয়েছে, যার উদ্দেশ্য

হচ্ছে মানবকুলকে প্রচণ্ড ধোঁকার মাধ্যমে প্রতারিত করা। ঐ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের সাথে দাজ্জাল সম্পৃক্ত এবং এই সম্পৃক্ততা ঐ হাদীসে সনাক্ত করা যায়, যেখানে ঘোষণা করা হয়েছে যে, দাজ্জাল এমন এক গাধার পিঠে চড়ে বেড়াবে যা মেঘের চেয়েও দ্রুতগতিতে ভ্রমণ করতে সক্ষম এবং যার কর্ণদ্বয়ের বিস্তৃতি হবে বিশাল। (বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে) এখানে আধুনিক বিমান ও জঙ্গিবিমানের কথা বলা হয়েছে।

- আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করে ফেরেশতাদের কাছে ঘোষণা করলেন যে, তিনি পৃথিবীতে এমন কাউকে প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছেন, যে তাঁর খলিফা হিসাবে কাজ করবে (অর্থাৎ যে তাঁর পক্ষ হয়ে তাঁর অধীনস্থ পদে কাজ করবে)। ইসলামি খিলাফত ঠিক এভাবেই কাজ করত। তা আল্লাহ্কে সার্বভৌম ও সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী হিসাবে স্বীকৃতি দিত এবং আল্লাহ্র আইনকে সর্বোচ্চ আইনের মর্যাদা দিত। মির্জার মৃত্যুর পরে পশ্চিমা সভ্যতা তা [খিলাফত] ধ্বংস করে দেয় এবং শিরকের উপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র তার স্থলাভিষিক্ত হয়। খিলাফতের প্রাণকেন্দ্র, তুরস্কে নতুন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে গ্রাস করার পূর্বে, এই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ধারণা ইসলামের আরব প্রাণকেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবেই গোটা ইসলামি বিশ্ব সমষ্টিগতভাবে শিরকে পতিত হয়, এটা ছিল দাজ্জালের কাজ। কিন্তু তা মির্জার মৃত্যুর পর সংঘটিত হয়।
- সারা পৃথিবীর অর্থনীতি রিবা [সুদ] দ্বারা অধিকৃত হবার মধ্য দিয়ে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ঐ ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়েছে যাতে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, ভণ্ড 'মসীহ্' দাজ্জালের যুগ হবে বিশ্বজনীন রিবার [সুদভিত্তিক] অর্থনীতির যুগ। রাসূল (সাঃ) আরো ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, এমন একটি সময় আসবে যখন মানবকুলের মধ্যে এমন একটি ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না যে সুদ খাচ্ছে না। আর যদি এমন কেউ থাকে যে দাবী করে যে, সে সুদ খায় না, তবুও "তার উপর সুদের ধূলার আবরণ অবশ্যই থাকবে।" ঐ ভবিষ্যদ্বাণী এখন বাস্তবরূপ লাভ করেছে। সুদ এখন গোটা বিশ্বের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু মির্জা গোলাম আহমদ যখন মৃত্যুবরণ করে তখনও এমনটা হয়ে উঠেনি।
- আধুনিক নারীবাদী বিপ্লব এবং নারীমুক্তির জন্য সংগ্রাম রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ঐ ভবিষ্যদ্বাণীকে বাস্তবায়িত করেছে যেখানে তিনি বলেছিলেন যে, নারীরা হবে – 'ভণ্ড-মসীহ্' দাজ্জালের কবলে চলে আসা শেষ জনসমষ্টি'।

  "দাজ্জালের দলে সবশেষে ভিড়বে নারীরা; অবস্থা এমন হবে যে পুরুষ তার মা, মেয়ে, বোন এবং খালাকে বেঁধে রাখতে বাধ্য হবে, যাতে তারা বের হয়ে তার (দাজ্জাল) কাছে না যেতে পারে।"

(কানযুল 'উম্মাল, ৭ম খণ্ড, হাদীস নং ২১১৬)

"যারা তাকে (দাজ্জাল) অনুসরণ করবে তাদের বেশীর ভাগই হবে ইহুদী ও নারী।"
(কানযুল 'উম্মাল, ৭ম খণ্ড, হাদীস নং ২১১৪)

ব্রিটিশ নারীরা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়। মির্জা গোলাম আহমাদের মৃত্যুর পরে অতি সম্প্রতি বিংশ শতাব্দীতেই নারীবাদী বিপ্লব সফলভাবে মুসলিম বিশ্বে অনুপ্রবেশ করেছে।

- 'ভণ্ড-মসীহ্' দাজ্জালের সময়টায় বিশ্ব জুড়ে যে আবহাওয়াগত পরিবর্তনের কথা রাসূল (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, আজ পরিবেশ দূষণের মধ্য দিয়ে তা ঘটে চলেছে। পৃথিবীতে ব্যাপারটা এখন ঘটছে, এমনকি আমরা যখন এই গ্রন্থটি লিখে চলেছি তখনও। অবশ্যই তা মির্জার মৃত্যুর অনেকদিন পরের কথা।
- আধুনিক যুগে যা চোখে পড়ে তার সাথে বাস্তবের কোন মিল নেই। বেহেশতের রাস্তাকে দোজখের রাস্তা বলে দৃশ্যত মনে হয় এবং দোজখের রাস্তাকে একইভাবে বেহেশতের পথ বলে মনে হয়। এই ধরনের ধোঁকা এটাই প্রতীয়মান করে যে দাজ্জাল এখনও কর্মরত। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলে গেছেন যে, দাজ্জাল ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটাবে [অর্থাৎ সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য হিসাবে দেখাবে]!
- অ-ইহুদী (অর্থাৎ মুসলিম) শাসন থেকে পবিত্রভূমির 'মুক্তি', পবিত্রভূমিতে ইহুদীদের প্রত্যাবর্তন এবং ইসরাঈল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এ সবকিছুই ব্রিটেন নামক এক খৃস্টান 'দ্বীপের' সক্রিয় সম্পৃক্ততায় অর্জিত হয়েছে যা আরব উপদ্বীপ থেকে সমুদ্রপথে প্রায় একমাস যাত্রার দূরত্বে অবস্থিত (ঠিক যেমনটি তামীম আল-দারী বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে)। এ সবকিছুই মির্জার মৃত্যুর পরে অর্জিত হয়েছে। এসব ঘটনাবলী এ ব্যাপারে অনিবার্য প্রমাণ উপস্থাপন করে যে মির্জার মৃত্যুর অনেক পরেও ব্রিটেনের দ্বীপ থেকে ইহুদীদের লক্ষ্য করে দাজ্জাল কর্মরত ছিল।
- এটাও সম্ভব যে শীঘ্রই পৃথিবীর 'নিয়ন্তা রাষ্ট্র' হিসাবে ইসরাঈল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থান দখল করে নেবে এবং সোলায়মান (আঃ)-এর স্বর্ণযুগের প্রত্যাবর্তনের দাবী করবে। এটা এখনও ঘটেনি, কিন্তু যখন তা ঘটবে তখন সেটা হবে দাজ্জালের 'মসীহ্' হিসাবে নিজেকে জাহির করার যে প্রচেষ্টা, তারই সাফল্যের পরিচায়ক। এসব শীঘ্রই ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু মির্জা প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছে।

উপরোক্ত সবই হচ্ছে 'ভণ্ড-মসীহ্' দাজ্জালের কার্যকলাপ, এবং *সে এখনও অতি অবশ্যই বেঁচে আছে*, কিন্তু মির্জা ইতোমধ্যেই মৃত। সত্যি বলতে কি উপরে বর্ণিত সবই মির্জা গোলাম আহমদের মৃত্যুর অনেক পরে পৃথিবীতে পরিপূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করেছে এবং বিশ্বজনীন বিষয় হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। যদি মির্জা 'ভণ্ড-মসীহ্' দাজ্জালকে

হত্যা করেই থাকত, তাহলে মির্জার অনুসারীরা উপরোক্ত সবকিছুকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবে? মির্জা গোলাম আহমাদের দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন অনুসারীগণ হয়ত এখন আজকের পৃথিবীর বাস্তবতাকে অনুধাবন করতে পারবে এবং এটাও বুঝতে সক্ষম হবে যে, যা কিছু সত্য তা মির্জা গোলাম আহমদের দাবীর চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। *আমীন*!

দশম অধ্যায়

কুর'আন ও হাদীসে ইয়াজুজ-মাজুজ

قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾

"তারা বলল: 'হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ-মাজুজ দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করে রেখেছে।

"আপনি বললে আমরা আপনার জন্যে কি কিছু কর ধার্য করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মাঝে একটি প্রাচীর গড়ে দেবেন?' "

(কুর'আন, সুরা কাহাফ ১৮:৯৪)

আমাদের স্মরণীয় গুরু ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান আনসারী (রহঃ) জ্ঞান আহরণের ব্যাপারে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছিলেন, বিশেষত সত্য সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে। তিনি শিখিয়েছিলেন, কোন বিষয়ের একটা অংশকে যেন সেই 'গোটা' বিষয় থেকে পৃথক করে শিক্ষার চেষ্টা না করা হয়। দ্বিতীয়ত একটা বিষয় সংক্রান্ত জ্ঞান আহরণের শর্ত এই যে, জ্ঞানের সূত্রগুলিকে যেন একটা সমগ্র হিসাবে বিন্যস্ত করা হয়। কিন্তু যতক্ষণ না কেউ বিভিন্ন অংশকে একত্রে ধরে রাখার, অর্থাৎ 'একত্রীকরণের মূলনীতি'-কে সনাক্ত করতে পারছে, ততক্ষণ তা সম্ভব নয়। তিনি ঐ একত্রীকরণের মূলনীতিকে 'অর্থপ্রকাশের পদ্ধতি' বলে উল্লেখ করেছেন। ইয়াজুজ-মাজুজের বিষয়ে গবেষণা করার চেষ্টা করলে আমাদের ঐ 'অর্থপ্রকাশের পদ্ধতি' বের করতে হবে।

ইয়াজুজ-মাজুজের বিষয়টা এমন একটা বিষয়, যে বিষয়ে বড় বড় পণ্ডিতগণও লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারেন, যদি না গবেষণার এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

সহীহ্ মুসলিমের একটি মাত্র হাদীসে এমন ইঙ্গিত রয়েছে যে, পৃথিবী ইয়াজুজ-মাজুজের অভিজ্ঞতা ততক্ষণ লাভ করবে না যতক্ষণ না ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন ঘটবে:

"এমনই এক অবস্থায় আল্লাহ ঈসার কাছে ওহী পাঠাবেন: আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এমন এক জনসমষ্টি তৈরী করেছি যাদের বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধ করতে সক্ষম নয়; তুমি এদের নিয়ে নিরাপদে তূর-এ চলে যাও, এবং তারপর আল্লাহ্ ইয়াজুজ-মাজুজদেরকে প্রেরণ করবেন এবং তারা প্রতিটি উঁচুস্থান থেকে দলে দলে নেমে আসবে।"

(সহীহ মুসলিম)

তথাপি, কুর'আন এবং সহীহ্ বুখারীর অন্তত আটখানা হাদীস থেকে যে সাদামাটা তথ্য ফুটে ওঠে, তা এর বিরুদ্ধে যায়, কারণ সেগুলি থেকে বুঝা যায় যে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জীবদ্দশায়ই ইয়াজুজ-মাজুজের মুক্তি ঘটেছে, ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তনের বহু পূর্বেই।

কুর'আনে ইয়াজুজ-মাজুজের কথা মাত্র দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব আমাদের প্রথম চেষ্টা হবে, একত্রীকরণের সেই মূলনীতিটি আবিষ্কার করা যা ইয়াজুজ-মাজুজ সংক্রান্ত ঐ দুটি কুরআনিক বক্তব্যের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে পারে।

ইয়াজুজ-মাজুজকে প্রথমবার উল্লেখ করা হয়েছে সুরা কাহাফে এবং দ্বিতীয়বার উল্লেখ করা হয়েছে সুরা আম্বিয়ায়। প্রথম উল্লেখটি এমন:

قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾

"তারা বলল: 'হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ-মাজুজ এ দেশে ফাসাদ (দুর্নীতি, ভীষণ নিপীড়ন এবং শয়তানী) সৃষ্টি করে রেখেছে।

"আপনি বললে আমরা আপনার জন্যে কি কিছু কর ধার্য করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মাঝে একটি প্রাচীর গড়ে দেবেন (যাতে আমরা তাদের কাছ থেকে নিরাপদে থাকতে পারি)?'"

(কুর'আন, সুরা কাহাফ ১৮:৯৪)

এভাবে তাদের সম্বন্ধে কুর'আনের প্রথম বক্তব্যে বলা হয়েছে যে, তারা অতি অবশ্যই ফাসাদ সৃষ্টিকারী। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) ব্যাখ্যা করেছেন যে, ইয়াজুজ আসলে এক মানব সম্প্রদায়, যারা বংশানুক্রমে আদম (আঃ) থেকে আগত। একই কথা মাজুজের বেলায়ও প্রযোজ্য। হাদীসখানি কুর'আনের পরিপূরক হিসাবে কাজ ক'রে সতর্ক করে দেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই মানব সম্প্রদায়গুলোকে ফাসাদ সৃষ্টির ব্যাপারে এমন ক্ষমতার অধিকারী করে দিয়েছেন যা দুনিয়ার নিরিখে অপ্রতিরোধ্য:

"এমন অবস্থায় আল্লাহ ঈসা (আঃ)-এর কাছে ওহী পাঠাবেন: ***আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এমন এক জনসমষ্টি তৈরী করেছি যাদের বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধ করতে***

সক্ষম নয়; *তুমি এদের নিয়ে নিরাপদে তূর-এ চলে যাও, এবং তারপর আল্লাহ্ ইয়াজুজ-মাজুজদেরকে প্রেরণ করবেন এবং তারা প্রতিটি উঁচুস্থান থেকে দলে দলে নেমে আসবে। তাদের প্রথমজন টাইবেরিয়াস হ্রদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তা থেকে পানি পান করবে। আর শেষ জন যখন সেই হ্রদের পাশ দিয়ে যাবে তখন সে বলবে: এখানে একদা পানি ছিল। ঈসা (আঃ) এবং তাঁর সাথীগণ তারপর এখানে (তূর-এ) অবরুদ্ধ হয়ে পড়বেন এবং তাঁদের অবস্থা এমন শোচনীয় হবে যে, তাঁদের কাছে একটি ষাঁড়ের মাথা একশত দীনারের চেয়ে বেশী প্রিয় হবে। আল্লাহর রাসূল ঈসা (আঃ) এবং তাঁর সাথীগণ আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করবেন, যিনি তাদের কাছে পতঙ্গ পাঠাবেন (সেগুলো ইয়াজুজ-মাজুজদের ঘাড়ে আক্রমণ করবে) এবং সকালে তারা একযোগে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ্র রাসূল ঈসা (আঃ) এবং তাঁর সাথীগণ তখন মাটিতে নেমে আসবেন এবং তাঁরা তখন পৃথিবীকে এক সমতলভূমি হিসাবে দেখতে পাবেন, যেখানে এমন কোন স্থান থাকবে না যাতে পচনজনিত গন্ধ নেই। আল্লাহ্র রাসূল ঈসা (আঃ) এবং তাঁর সাথীগণ তারপরে আল্লাহ্র কাছে সবিনয় প্রার্থনা করবেন যখন আল্লাহ্ একঝাঁক পাখি প্রেরণ করবেন, যাদের গলা হবে বুখ্তী উটের গলার মত বিশাল এবং তারা তাদের [মৃত দেহগুলি] বয়ে নিয়ে যাবে এবং আল্লাহ্ যেখানে চান সেখানে গিয়ে ফেলবে।"*

(সহীহ মুসলিম)

সুরা কাহাফ আমাদের জানিয়ে দেয় যে, যুলকারনাইন সাধারণ মানুষদের এবং ঐ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের মাঝে একটি প্রাচির তৈরী করেছিলেন। তিনি 'লোহার' ব্লক [ইঁট] ব্যবহার করেছিলেন এবং তারপর সেগুলোকে 'গলিত তামা' দিয়ে জুড়ে দিয়েছিলেন। তিনি তারপর ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, ঐ প্রাচির হচ্ছে তার প্রভুর তরফ থেকে একটি রহমত (দয়ার নিদর্শন), তবে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই [একদিন] ঐ প্রাচির ভেঙ্গে দেবেন এবং ইয়াজুজ-মাজুজকে এমন এক সময় মুক্ত করে দেবেন যখন তাঁর (যুলকারনাইনের) প্রভুর সাবধানবাণী বাস্তবায়িত হবার সময় আসবে:

قَالَ هَـٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۖ
وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴿٩٨﴾

"তিনি বললেন: এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ। যখন আমার পালনকর্তার (শেষ যুগ সম্বন্ধীয়) প্রতিশ্রুত সময় আসবে, তখন তিনি একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন,
"এবং আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি সত্য।"

(কুর'আন, সুরা কাহাফ ১৮:৯৮)

এখানে তিনি কোন্ *ওয়া'দ* বা প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করছিলেন? এর জবাব স্পষ্টভাবেই রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ঐ বিখ্যাত হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যেটাতে শেষ দিবসের দশটি প্রধান আলামত ব্যক্ত রয়েছে। ঐ দশটি আলামতের ভিতর ইয়াজুজ-মাজুজের মুক্তি ছিল একটি:

"হুজায়ফা ইব্নে উসায়েদ গিফারী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত: [একদিন] আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) হঠাৎ করে এসে আমাদের কাছে উপস্থিত হলেন যখন আমরা আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত ছিলাম। তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা কি আলোচনা করছ? (সাহাবারা) বললেন: আমরা শেষ সময়ের সম্বন্ধে আলোচনা করছি। তখন তিনি বললেন: তোমরা যতক্ষণ দশটি আলামত না দেখবে ততক্ষণ তা আসবে না। এবং তারপর তিনি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করলেন, যথাক্রমে 'ধোঁয়া', 'দাজ্জাল', 'জন্তু', 'পশ্চিমে সূর্য উঠা', 'মরিয়ম-পুত্র ঈসা (আঃ)-র আগমন', 'ইয়াজুজ-মাজুজ', 'পূর্ব পশ্চিম এবং আরবদেশ এই তিন স্থানে ভূমিধ্বস' এবং তার পরে 'ইয়েমেন থেকে জ্বলে ওঠা আগুন যা মানুষজনকে বিতাড়িত করে একত্র করবে তাদের মিলনস্থলে'।"

(সহীহ মুসলিম)

অন্যভাবে বলতে গেলে যখন কথিত প্রাচির ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল এবং ইয়াজুজ-মাজুজ মুক্তি পেয়েছিল, সেটাই ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত যে মানবকুল 'শেষ যুগে' প্রবেশ করেছে। প্রশ্ন হচ্ছে: আমরা কিভাবে বুঝব যে কখন সেই প্রাচির অপসারিত হয়েছিল, আর কখন ইয়াজুজ-মাজুজের মুক্তির সূচনা হয়েছিল? আসুন আমরা ঐ আটটি হাদীস পরীক্ষা করে দেখি যেগুলির মধ্যে ঐ প্রশ্নের উত্তর রয়েছে এবং যার সবকটিই সহীহ বুখারী থেকে নেয়া। পাঠক যেন পুনরাবৃত্তিতে হতবাক না হয়ে পড়েন। এগুলি বিভিন্ন হাদীস নয়। বরং তাদের সারবস্তু একই। কিন্তু হাদীসগুলি বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা সামান্য ভিন্ন কথায় বর্ণিত। যার ফলে এ হাদীস হচ্ছে *মুতাওয়াতির* এবং সেহেতু সম্ভাব্য সবচেয়ে শক্তিশালী হাদীস:

"আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন: ইয়াজুজ-মাজুজের বাঁধে একটি ছিদ্রের সৃষ্টি হয়েছে। (উপ-বর্ণনাকারী) উহায়ব (রাঃ) (তাঁর তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে) ৯০ এঁকে দেখালেন।"

(সহীহ্ বুখারী)

*"উম্মুল মুমিনীন যয়নাব বিনতে জাহশ (রাঃ) হতে বর্ণিত: একদিন আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) ভয়ার্ত অবস্থায় তাঁর নিকটবর্তী হলেন এবং বললেন আল্লাহ ছাড়া কারো উপাস্য হবার অধিকার নেই! দুর্ভাগ্য আরবদের, এক মহা অকল্যাণ তাদের কাছে আসছে। **আজ** ইয়াজুজ-মাজুজের বাঁধে এরকম একটি ছিদ্রের সৃষ্টি হয়েছে। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে একটি বৃত্ত তৈরী করে দেখালেন। যয়নাব বিনতে জাহশ (রাঃ) আরো বলেন: আমি বললাম: হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)! আমাদের ভিতর সৎলোক থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হব? রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন: হ্যাঁ, যদি অসৎ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তবে।"*

(সহীহ বুখারী)

সহীহ্ বুখারীতে সামান্য পরিবর্তনের সাথে উপরোক্ত হাদীসখানির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

*"উম্মুল মুমিনীন যয়নাব বিনতে জাহশ (রাঃ) হতে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) রক্তিম মুখমণ্ডল সহ ঘুম থেকে জেগে উঠলেন এবং বললেন: আল্লাহ্ ছাড়া কারো উপাস্য হওয়ার অধিকার নেই। দুর্ভাগ্য আরবদের, এক মহা অকল্যাণ তাদের কাছে প্রায় সমাগত। **আজ** ইয়াজুজ-মাজুজের দেয়ালে এমন একটি ছিদ্র তৈরী হয়েছে (সুফিয়ান তাঁর আঙ্গুল দ্বারা ৯০ বা ১০০ এঁকে ছিদ্রের আকার বর্ণনা করেন)। তখন জিজ্ঞেস করা হল: আমাদের ভিতর সৎলোক থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? রাসুলুল্লাহ্ বললেন: হ্যাঁ, যদি অসৎ কাজ বৃদ্ধি পায় তবে।"*

(সহীহ বুখারী)

*"উম্মুল মুমিনীন যয়নাব বিনতে জাহশ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) ভয়ার্ত অবস্থায় তাঁর কাছে এসে বললেন: 'আল্লাহ্ ছাড়া কারো উপাস্য হবার অধিকার নেই! দুর্ভাগ্য আরবদের কারণ অমঙ্গল তাদের নিকটবর্তী। **আজ** ইয়াজুজ-মাজুজের দেয়ালে এতবড় একটা ছিদ্র তৈরী করা হয়েছে' (তাঁর দুটো আঙ্গুল দিয়ে একটা বৃত্ত তৈরী করে দেখালেন)। যয়নাব (রাঃ) বললেন: 'হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)! আমাদের ভিতর পূণ্যবান লোক থাকা সত্ত্বেও আমরা কি ধ্বংস হয়ে যাব?' তিনি বললেন: 'হ্যাঁ, যদি অসৎ কাজ বৃদ্ধি পায়'।"*

(সহীহ বুখারী)

"উম্মুল মুমিনীন যয়নাব বিনতে জাহশ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) একদা ভয়ার্ত অবস্থায় তাঁর কাছে আসলেন এবং বললেন: 'আল্লাহ্ ছাড়া কারো উপাস্য হবার অধিকার নেই। দুর্ভাগ্য আরবদের এক বিপদ থেকে যা তাদের নিকটবর্তী। (তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা একটা বৃত্ত এঁকে তিনি বললেন) ইয়াজুজ-মাজুজের দেয়ালে এরকম একটি ছিদ্র তৈরী করা হয়েছে'। যয়নাব বিনতে জাহশ (রাঃ) বললেন: 'হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)! আমাদের ভিতর পূণ্যবান লোকজন থাকা অবস্থায়ও কি আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হব?' তিনি বললেন: 'হ্যাঁ, যখন অসৎ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে'।"

(সহীহ বুখারী)

"উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) জেগে উঠলেন এবং বললেন: 'সুবহানআল্লাহ্: কত বিশাল ঐশ্বর্য দান করা হয়েছে আর কত বিশাল দুর্ভোগ পাঠানো হয়েছে'!"

(সহীহ বুখারী)

"আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন: রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: 'ইয়াজুজ-মাজুজের দেয়ালে আল্লাহ্ এরকম একটি ছিদ্র সৃষ্টি করেছেন (এবং তিনি তাঁর আঙ্গুল দিয়ে ছিদ্রের পরিমাণ দেখালেন)।"

(সহীহ বুখারী)

"ইব্নে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত: 'আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) তাঁর উটে চড়ে (কা'বার চারপাশে) তাওয়াফ করছিলেন এবং প্রতিবার কালো পাথর সম্বলিত কোণে পৌঁছে সেই পাথরের দিকে হাত নির্দেশ করে বলছিলেন, 'আল্লাহু আকবার'।' যয়নাব

(রাঃ) বলেন: রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: 'ইয়াজুজ-মাজুজের দেয়ালে এরকম একটি ছিদ্র তৈরী করা হয়েছে (তিনি তাঁর তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দিয়ে ৯০ সংখ্যাটি এঁকে দেখালেন)'।"

(সহীহ বুখারী)

সহীহ্ বুখারীর এই আটটি হাদীস চারটি সূত্র থেকে এসেছে, আবু হুরায়রা, যয়নাব বিনতে জাহশ, উম্মে সালামা এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এবং এগুলো স্পষ্টভাবেই বর্ণনা করে যে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জীবনকালেই ইয়াজুজ-মাজুজ মুক্তিলাভ করেছে। বাস্তবিকই তিনি এমনকি এ ঘোষণাও দেন যে **"আজ"** তাদের মুক্তি ঘটেছে! এভাবেই শেষ যুগ বা ফিতনার যুগের সূচনা হয় রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জীবদ্দশায়ই। শেষ সময়ের সাথে তাঁর সংশ্লিষ্টতা সম্বন্ধে তিনি যে বিখ্যাত বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন এটা তারই ব্যাখ্যা:

"সাহ্ল ইব্নে সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত: আমি আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)-কে দেখেছি তাঁর তর্জনী ও মধ্যাঙ্গুলি নির্দেশ করে বলতে: আমার আগমন এবং শেষ প্রহর হচ্ছে এই দুটো আঙ্গুলের মত। সেই বিশাল বিপর্যয় (অর্থাৎ ফিতনার যুগ) সব কিছুকে ছেয়ে ফেলবে।"

(সহীহ বুখারী)

কুর'আন মুমিনদের জন্য একটা বিরাট নিদর্শন পেশ করেছে যা দ্বারা তারা যে কেবল ইয়াজুজ-মাজুজের মুক্তি সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ লাভ করবে তাই নয়, বরং পৃথিবী যে এখন ইয়াজুজ-মাজুজের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে তারও প্রমাণ দেখতে পাবে। এভাবে তারা ইয়াজুজ-মাজুজকে পৃথিবীর নিয়ন্তা-শক্তি হিসাবে সনাক্ত করতে সক্ষম হবে। সুরা আম্বিয়ায় ইয়াজুজ-মাজুজ সংক্রান্ত বক্তব্যের মাঝে এই প্রমাণ নিহিত রয়েছে:

وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٩٥﴾

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴿٩٦﴾

"এবং যে শহরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তার অধিবাসীদের ফিরে না আসা অবধারিত;

"যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজকে বন্ধনমুক্ত করে দেয়া হবে (অর্থাৎ সেই প্রাচির অতিক্রম করতে দেয়া হবে), এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে (অথবা সব দিকে ছড়িয়ে পড়বে)।"

(কুর'আন, সুরা আম্বিয়া ২১:৯৫-৯৬)

ইয়াজুজ-মাজুজ যখন মুক্তিপ্রাপ্ত হবে এবং উপরন্তু যখন তারা 'প্রতিটি উঁচু স্থান থেকে নেমে আসবে, অথবা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে', এরকম একটা সময়ে ঐ শহরের জনগণ যারা আল্লাহ্ তা'আলার দ্বারা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং নিজেদের শহর

থেকে নির্বাসিত হয়েছিল (আল্লাহ্ তা'আলা যে শহরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন), তাদের এখন সেই শহরে ফিরিয়ে আনা হবে। ইয়াজুজ-মাজুজের সাথে সংশ্লিষ্ট এরকম একটা শহরই আছে (যা আল্লাহ্ তা'আলা ধ্বংস করেছিলেন), যার কথা হাদীসে উল্লেখিত রয়েছে। আর সেই শহর হচ্ছে **জেরুজালেম**।

নিম্নলিখিত হাদীসখানি গ্যালিলি হ্রদের পাশ দিয়ে ইয়াজুজ-মাজুজের যাবার কথা উল্লেখ করে, যা কিনা 'পবিত্রভূমিতে' অবস্থিত:

"আন্-নাউওয়াস ইব্নে সাম'আন (রাঃ) হতে বর্ণিত: . . . এমত অবস্থায় আল্লাহ্ ঈসা (আঃ)-এর কাছে এই ওহী পাঠাবেন: আমি আমার বান্দাদের ভিতর থেকে এমন একদল তৈরী করেছি, যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কেউ টিকে থাকতে পারবে না। তুমি এদের নিয়ে নিরাপদে তূর-এ চলে যাও। তখন আল্লাহ্ ইয়াজুজ-মাজুজকে প্রেরণ করবেন যারা প্রতিটি গিরিপথ বেয়ে নেমে আসবে। তাদের প্রথমজন টাইবেরিয়াস হ্রদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তা থেকে পানি পান করবে। আর শেষ জন যখন সেই হ্রদের পাশ দিয়ে যাবে তখন সে বলবে: এখানে একদা পানি ছিল। ঈসা (আঃ) এবং তাঁর সাথীগণ তারপর এখানে (তূর-এ) অবরুদ্ধ হয়ে পড়বেন এবং তাঁদের অবস্থা এমন শোচনীয় হবে যে, তাঁদের কাছে একটি ষাঁড়ের মাথা একশত দীনারের চেয়ে বেশী প্রিয় হবে। . . ."

(সহীহ মুসলিম)

ইয়াজুজ-মাজুজ যখন গ্যালিলি সাগরের পাশ দিয়ে যায় তখন তারা তূর (পাহাড়) এর দিকে যাবে যা অপর একখানা হাদীসে **জেরুজালেমের** পাহাড় বলে বর্ণিত:

*"ইয়াজুজ-মাজুজ হাঁটতে থাকবে যতক্ষণ না তারা আল-খামর পাহাড়ে পৌঁছাবে এবং এটা হচ্ছে **বায়তুল মাক্দিসের** (অর্থাৎ জেরুজালেমের) একটা পাহাড়, এবং তারা বলবে: আমরা পৃথিবীতে যারা ছিল তাদের হত্যা করেছি। এখন যারা আকাশে রয়েছে তাদের হত্যা করা যাক। তারা আকাশের দিকে তাদের তীর ছুঁড়ে মারবে আর সেসব তীর রক্তমাখা অবস্থায় তাদের কাছে ফিরে আসবে।"*

(সহীহ মুসলিম)

ইয়াজুজ-মাজুজ সংক্রান্ত হাদীসসমূহে যেহেতু জেরুজালেম ছাড়া অন্য কোন শহরের উল্লেখ নেই (যা আল্লাহ্ তা'আলা ধ্বংস করেছিলেন), আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে সুরা আম্বিয়ার ৯৫-৯৬ আয়াতে উল্লেখিত শহরটি কেবলমাত্র **জেরুজালেমই** হতে পারে।

ঐ শহরটি সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত ও সনাক্তকরণ থেকে এখন এই নিহিতার্থ প্রকাশিত হয় যে, 'পবিত্রভূমিতে' ইহুদীদের প্রত্যাবর্তন, যা ইতোমধ্যেই সংঘটিত হয়েছে তা হচ্ছে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক প্রতিবন্ধক অপসারণের নাটকীয় এবং

সুদৃঢ় প্রমাণ এবং এটা এও প্রমাণ করে যে, আমরা এখন ইয়াজুজ-মাজুজের যুগে বসবাস করছি এবং সেই হেতু এখন আমরা শেষ যুগে বসবাসরত।

কিন্তু ঐ 'শহরে' (জেরুজালেম) ইহুদীদের প্রত্যাবর্তন এবং ইসরাঈল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ নিহিতার্থ হচ্ছে এই যে, ইয়াজুজ-মাজুজের মিশনের সেই অধ্যায় তারা ইতোমধ্যেই বাস্তবায়িত করেছে যার উল্লেখ সুরা আম্বিয়ার ২১:৯৬-এ রয়েছে, অর্থাৎ তারা প্রতিটি উঁচু স্থান থেকে নেমে এসেছে (সবদিকে ছড়িয়ে পড়েছে) এবং পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। যে বিশ্বব্যবস্থা ইহুদীদেরকে 'পবিত্রভূমিতে' ফিরিয়ে এনেছে, তা হচ্ছে ইয়াজুজ-মাজুজের বিশ্বব্যবস্থা! তারা তাহলে কারা? আমরা কি তাদের সনাক্ত করতে পারি? আমাদের পর্যবেক্ষণের পন্থা অবশ্যই এমন হওয়া উচিত যাতে আমরা এমন এক জনগোষ্ঠীর খোঁজ করব, যাদের আচার-আচরণে, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পূর্বের সময়ের তুলনায় তাঁর পরবর্তী অধ্যায়ে, ইহুদীদের প্রতি এবং 'পবিত্রভূমির' প্রতি মোহাবিষ্ট সম্পর্কে এক আজব পরিবর্তন দেখা যায়।

'পবিত্রভূমির' ব্যাপারে অবাক করা এক ইউরোপীয় মোহ

ইব্রাহীম (আঃ) যখন পবিত্রভূমিতে হিজরত করেন এবং যখন ব্যাবিলন, পারস্য, মিশর ও চীনে বিশাল সভ্যতা বিরাজমান এবং যখন গ্রীক ও রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি, ইউরোপ তখন মোটামুটিভাবে 'বন্য গোত্রসমষ্টি' হিসেবে জীবনযাপন করত। বাকী সভ্য জগতের সাথে, তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল খুব সামান্য বা প্রায় শূন্য। ভ্রমণের মাধ্যমেও যে উল্লেখযোগ্য কোন আদান-প্রদান ছিল তাও নয়। এই আজব নির্বাসনের ফলশ্রুতিতে বাকী পৃথিবী ইউরোপীয় ভাষাসমূহ জানত না, অথবা পৃথিবীর মঞ্চে ইউরোপ কখনো কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেনি। সুরা কাহাফে এই একক ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্যের কথা কুর'আন উল্লেখ করেছে যখন যুলকারনাইন তার তৃতীয় যাত্রা শুরু করেন এবং এমন জনগোষ্ঠীর সাক্ষাত লাভ করেন যাদের ভাষা তিনি বুঝতে পারেননি (সুরা কাহাফ, ১৮:৯৩)।

ইউরোপে এক আজব ও রহস্যময় বিপ্লব সাধিত হয়। পৌত্তলিক, গ্রীক এবং রোমান সভ্যতার বিকাশ ঘটে এবং তারা প্রায় সাথে সাথেই ও অদ্ভূতভাবে বাকী পৃথিবীর যতটুকু জয় করা সম্ভব ততটুকু বিজয়ের অভিযান শুরু করে। গ্রীক এবং রোমান উভয় ইউরোপীয় সভ্যতারই 'পবিত্রভূমি' সম্পর্কে এক বিশেষ আগ্রহ ছিল বলে মনে হয়। আলেকজান্ডার 'দ্য গ্রেট' জেরুজালেম জয় করেন এবং ইহুদী ধর্মের প্রতি আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। আর রোমান সাম্রাজ্য ঈসা (আঃ)-এর সময় এমনকি তার পরেও জেরুজালেম তথা 'পবিত্রভূমিতে' শাসন করে। দ্বিতীয়ত তাদের দেবদেবী ও পৌত্তলিক

জীবনযাত্রার প্রতি তেমন কোন বাধ্যবাধকতা ও বিশ্বস্ততা ছিল না। হিন্দু ভারতের দেবদেবীগণ যেমন টিকে আছে, গ্রীক ও রোমান দেবদেবীগণ তেমনটা টিকতে পারেনি। বরং সেখানে কয়েক শতাব্দী আগে যেমন আজবভাবে পৌত্তলিক বিশ্বাসসমূহকে আঁকড়ে ধরা হয়েছিল, ঠিক তেমনি অনানুষ্ঠানিক ভাবে শেষ পর্যন্ত সেগুলোকে ত্যাগও করা হয়।

তারপর নিছক রাজনৈতিক সুবিধার খাতিরে ইউরোপ খ্রীস্টধর্মকে আলিঙ্গন করে, ফলে ইউরো-খৃস্ট চার্চের উদ্ভব ঘটে, এবং রোম গড়ে উঠে এই নতুন চার্চের কেন্দ্রস্থল হিসাবে। খৃস্টধর্মই ইউরোপের বাকী অংশের বেশীর ভাগকে তার ইতিহাসের 'বন্য গোত্র' পর্যায় থেকে বের করে নিয়ে আসে এবং গোটা ইউরোপকে খৃস্টরাজ্য [Christendom] হিসাবে একতাবদ্ধ করে। এই নতুন খৃস্টান চার্চ বা কর্তৃত্ব মধ্যপ্রাচ্যের সনাতন খৃস্টধর্ম থেকে তার স্বাতন্ত্র্যকে এতই গুরুত্ব দিত যে, তারা ঈসা (আঃ) এর জন্মবার্ষিকী উদযাপনের জন্য নতুন তারিখ উদ্ভাবন করল। এই নতুন ইউরোপীয় বড়দিন নির্ধারিত হল ২৫শে ডিসেম্বর।

কিন্তু ইউরো-খৃস্টধর্ম তাৎপর্যপূর্ণভাবে এবং রহস্যময়ভাবে সনাতন গোঁড়া বাইজেন্টিয়াম খৃস্টধর্ম থেকে পৃথক অবস্থান গ্রহণ করল। এই নতুন খৃস্টান চার্চ বা কর্তৃপক্ষ ইউরোপের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করার সাথে সাথেই 'পবিত্রভূমির' প্রতি এক অভূতপূর্ব মোহাচ্ছন্নতা প্রদর্শন করে, যা (ইউরোপের বাইরে) অন্য কোন খৃস্টান সম্প্রদায়ের মাঝে দেখা যায় নি। আর তাই ক্রুসেডসমূহ কেবল খৃস্টানদের আক্রমণ ছিল না, বরং বলা যায় সেগুলো ছিল ইউরো-খৃস্টানদের আক্রমণ। 'পবিত্রভূমির' নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নেবার লক্ষ্যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে একের পর এক রক্তক্ষয়ী ক্রুসেড পরিচালনা করা হয়। যখন সুলতান সালাহুদ্দীন খৃস্টান ক্রুসেডারদের পরাভূত করেন, তখন ইউরোপীয়ানদের দ্বারা বাস্তবায়িত 'পবিত্রভূমির' এই স্বল্পস্থায়ী 'স্বাধীনতার' লজ্জাস্কর সমাপ্তি ঘটে, এবং 'পবিত্রভূমির' উপর মুসলিম নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ক্রুসেডের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক ছিল এই যে, সেটা ছিল একান্তই ইউরোপীয় এক প্রচেষ্টা। ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের যদিও বাইজেন্টাইন খৃস্টানদের আবাসভূমির উপর দিয়ে যেতে হয়, তবু অ-ইউরোপীয় খৃস্টানরা ইউরোপীয়দের সাথে [ক্রুসেড অভিযানে] যোগ দেয়নি। আর তাই ক্রুসেডসমূহে তাদের কোন ভূমিকা ছিল না। সুতরাং 'পবিত্রভূমি' ও জেরুজালেম সংক্রান্ত মোহাচ্ছন্নতা খৃস্টান বৈশিষ্ট্যের চেয়ে বরং ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্য বললেই সঠিক বলা হবে। আমাদের এই গ্রন্থে তাই প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে: 'পবিত্রভূমির প্রতি এই অদ্ভূত ইউরো-খৃস্টান মোহের কারণ কি?'

দ্বিতীয়ত, ইউরোপীয় ক্রুসেডাররা যখন স্বল্প সময়ের জন্য মুসলিমদের কাছ থেকে জেরুজালেমের নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়, তখন তারা যে রক্তের বন্যা

বইয়ে দেয় তা স্পষ্টতই ছিল অ-খৃস্টানসুলভ আচরণ। তারা জেরুজালেমের সকল অধিবাসীকে জবাই করে। এমনকি নারী ও শিশুদেরও সেদিন অব্যাহতি দেওয়া হয়নি। 'পবিত্রভূমিকে' মুক্ত করার আপাত ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অভিযানে আত্মনিয়োগকারী ইউরোপীয় খৃস্টান জনগোষ্ঠীর ঐ বর্বরোচিত ও কসাইসুলভ ক্রিয়াকলাপে [বাকী] গোটা খৃস্টান বিশ্ব আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এটা স্পষ্টতই বুঝা যাচ্ছিল যে বিশ্বাসের চেয়ে বরং সুবিধার জন্যই ইউরোপ, খৃস্টধর্মের পরিচ্ছদ গায়ে চড়িয়েছিল। ক্রুসেডসমূহ ইউরোপের ভয়ঙ্কর নির্মম স্রষ্টা-বিমুখ এবং নৈতিকতা বিবর্জিত চেহারাকে উন্মোচন করে। খৃস্টান না বলে ঐ চেহারাকে অতি অবশ্যই স্রষ্টা-বিমুখ বলতে হবে এবং সুসভ্য জনগোষ্ঠীর চেয়ে তা ছিল অধিকতর 'বন্য-গোত্র সুলভ'। এবং তা এক রহস্যময় লাগামহীন ক্ষমতারও অধিকারী বলে মনে হয়েছিল। সময় বয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তারা নিজের সত্যিকার প্রকৃতি গোপন করার এবং নিজেদের সত্যিকার চেহারার বিপরীত পরিচয় প্রকাশ করার ব্যাপারেও অদ্ভূত পারদর্শিতা প্রদর্শন করে।

এই অদ্ভূত ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্যের গবেষণায় মুসলিমদের যেটুকু মনোযোগ দেওয়ার কথা ছিল, তা বেশ আজব ও রহস্যময়ভাবে অন্যদিকে প্রবাহিত হয়ে গেল যখন মঙ্গোল-অভিযান সংঘটিত হয় এবং ইউরো-খৃস্টানদের মতই বন্য ও বর্বর এক জনগোষ্ঠী মুসলিম বিশ্বকে সন্ত্রস্ত করে তোলে। মঙ্গোল আক্রমণের ঘটনাটা না ঘটলে মুসলিম চিন্তাবিদগণ হয়ত ইউরো-খৃস্টান ইউরোপের আচার-আচরণের বিকাশমান অস্বাভাবিকতা ও অশুভ লক্ষণ সনাক্ত করতে পারতেন।

যেহেতু ইতিহাসের বিকাশমান এই অভূতপূর্ব ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণার দিকে মুসলিম বিশ্ব মনোযোগ দিতে পারেনি, সেহেতু ঠিক এই কারণেই তার চেয়েও অবাক করা, তার চেয়েও রহস্যময় ও তার চেয়েও ব্যাখ্যাতীত যে বিপ্লব ইউরোপকে মধ্যযুগীয় খৃস্টান সভ্যতা থেকে নিখাদ ধর্ম-বিমুখ আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিমা সভ্যতায় রূপান্তরিত করেছে, সেটাকে বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতেও তারা অক্ষম হয়েছে। ঐ বিপ্লব ইউরোপকে বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-বিপ্লব এবং রিবা বা সুদের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উপহার দেয়, যা ধর্ম-বিমুখ ইউরোপকে বাকী বিশ্বের চেয়ে অধিকতর ক্ষমতাশালী অবস্থানে নিয়ে যায় এবং বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দী ও প্রশ্নাতীত নিয়ন্তার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। এই নতুন ইউরোপে 'পবিত্রভূমি' থেকে সমুদ্র পথে একমাস যাত্রা-দূরত্বে অবস্থিত অনুল্লেখযোগ্য দ্বীপ ব্রিটেন, গোটা ইউরোপের ক্ষমতার সমীকরণকে অবজ্ঞা করে ইউরোপের নেতা হিসাবে এবং বিশ্বের নিয়ন্তা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু এই নতুন আপাত খৃস্টান, অথচ বাস্তবে ধর্ম-বিমুখ ইউরোপ 'পবিত্রভূমি' সম্পর্কে একই ধরনের আজব মোহাচ্ছন্নতা প্রদর্শন করে, যা কিনা ক্রুসেডরত পুরাতন খৃস্টান ইউরোপ প্রদর্শন করেছিল। 'পবিত্রভূমিকে' মুক্ত করার আবহমান প্রচেষ্টায়

তারা [অর্থাৎ এই নতুন ইউরোপীয় কাঠামো] এবার আপাত ইহুদী অথচ স্রষ্টা-বিমুখ ইউরোপীয় (Khazar)[১] খাযারদের সাথে হাত মিলায়। এই দুই ইউরোপীয় জনগোষ্ঠী, অর্থাৎ ইউরো-খৃষ্টান ও ইউরো-ইহুদী, সেই থেকে আজ অবধি, এক রহস্যময় অপবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে। ১৯১৭ সালে ব্রিটেনের ঐ দ্বীপই ব্যালফর ঘোষণার মাধ্যমে জানাল যে ফিলিস্তিনে ইহুদী জাতীর আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তারা কাজ করে যাবে। মাত্র দু'বছর পরে তারা অ-ইহুদী (মুসলিম) শাসন থেকে 'পবিত্রভূমিকে' মুক্ত করার লক্ষ্যে এগিয়ে যায়। ১৯১৭ সালে জেনারেল অ্যালেনবির নেতৃত্বাধীন ব্রিটিশ বাহিনী জেরুজালেম এবং 'পবিত্রভূমি' রক্ষায় নিয়োজিত তুর্কি বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করলে একাজ সম্পন্ন হয়। আপাত খৃস্টান ইউরোপ দ্বারা পরিচালিত পুরাতন ক্রুসেড যেখানে বিফল হয়েছিল, সেখানে ধর্ম-বিমুখ ইউরোপ দ্বারা পরিচালিত নতুন ক্রুসেড সফল হল। জেরুজালেম এবং 'পবিত্রভূমিকে' মুক্ত করার দুটো প্রচেষ্টাই ছিল ইউরোপীয়। দুটোই ছিল ক্রুসেড। বিজয়ী বেশে জেরুজালেমে প্রবেশ করার সময় তার স্মরণীয় ঘোষণার মাধ্যমে জেনারেল অ্যালেনবি নিজেই এটা নিশ্চিত করেন: *"আজ ক্রুসেডের সমাপ্তি ঘটল।"* আর তাই এটা পরিস্কার যে 'পবিত্রভূমিকে' মুক্ত করার প্রচেষ্টার মাঝে ধর্মের কোন ব্যাপার ছিল না। এটা ছিল পৃথিবীর মঞ্চে নতুন নায়কের রূপে 'ইউরোপের' নতুন চেহারা!

লীগ অফ নেশনস এর ছত্রছায়ায়, ব্রিটেন তখন 'নিয়োগকৃত শক্তি' হিসাবে 'পবিত্রভূমির' নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ করে এবং ইহুদী জাতীর আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য বাস্তবায়নের কাজে অগ্রসর হয়। এই গ্রন্থে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে: ইউরোপ, যে কিনা তখন ধর্মনিরপেক্ষতা ও বস্তুবাদ অবলম্বন করেছে, আর যে কিনা কেবল নামমাত্র খৃস্টান, 'পবিত্রভূমি' সম্বন্ধে তার এ ধরনের আজব মোহাচ্ছন্নতা কেন?

ইউরোপের খৃস্টধর্ম অবলম্বন যদি অবাক করা ব্যাপার হয়ে থাকে, তবে ইউরোপের ইহুদী ধর্ম অবলম্বন তার চেয়েও বেশী অবাক হবার বিষয় বৈকি। খুব সম্ভবত সপ্তম শতাব্দীতে কোন এক সময় পূর্ব ইউরোপের খাযার গোত্রসমূহ ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করে। তারা যখন ইহুদী হল, তখন তার পেছনে মূলত রাজনৈতিক কারণ ছিল। তাদের ধর্মান্তরিত হওয়ার ব্যাপারে আসলে ধর্ম বিশ্বাসের কোন ভূমিকা ছিল না। ইহুদী ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার আগেই ঐ ইউরো-খাযারদের কিছু রহস্যময় ক্ষমতা ছিল বলে জানা

[১] খাযার জাতির বসবাস ছিল ককেসাস ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। খৃষ্টাব্দ ২০০ থেকে ৯৫০ পর্যন্ত এরা রাশিয়ার বিশাল এলাকায় ক্ষমতায় ছিল। ইসলাম আসার কিছুদিন পরেই, অর্থাৎ ৬৯৬ খৃষ্টাব্দে এদের *খাকান* বা রাজা এক অজ্ঞাত কারণে ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করে। এদের শক্তিশালী প্রতিরোধের কারণেই ইসলাম ককেসাসের উত্তরে প্রবেশ করতে পারে নি।

যায়, যার কারণে তারা সফলভাবে ইউরোপে ইসলামের অগ্রযাত্রা রোধ করতে সক্ষম হয়।

ইউরো-খৃস্টানদের মতই ইউরো-ইহুদীরা, ইসরাঈলি ইহুদীদের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্নতর ছিল। ইউরো ইহুদীরা 'পবিত্রভূমির' নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে মোহাবিষ্ট ছিল। ইসরাঈলি ইহুদীদের মধ্যে এধরনের কোনো আকাঙ্খা দেখা যায় নি। ইউরো-ইহুদীরাই যায়োনিস্ট আন্দোলনের সূচনা করে এবং ইউরো-খৃস্টানদের ক্রুসেডের মতই 'পবিত্রভূমিকে' মুক্ত করার লক্ষ্যে সচেষ্ট হয়। আমাদের প্রশ্ন: ইউরো-ইহুদীদের 'পবিত্রভূমির' বিষয়ে এই অদ্ভূত মোহাচ্ছন্নতা কেন?

'পবিত্রভূমিতে' ইহুদীদের 'প্রত্যাবর্তন' বাস্তবায়নের যায়োনিস্ট আন্দোলনকে ব্রিটেন সহায়তা দান করে, এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৪৮ সালে ইসরাঈল রাষ্ট্রের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তা বাস্তবায়িত হয়। ধাত্রী ব্রিটেন যখন ইসরাঈল-রূপ শিশুকে উপস্থাপন করল, পৃথিবী তখন দৃশ্যত প্রাচীন ইসরাঈল রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অবলোকন করল, যা কিনা দুই হাজার বৎসরেরও আগে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। ব্রিটেন যখন কয়েকশ বৎসর যাবত ইতোমধ্যেই পৃথিবী শাসন করে সেরেছে, তখন এক আজব ও রহস্যময় পরিবর্তন সংঘটিত হল, যার ফলে এক নতুন পরাশক্তি পৃথিবীর নিয়ন্তার ভূমিকা গ্রহণ করল। ঐ পরিবর্তনের স্পষ্ট প্রমাণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিদ্যমান, যখন মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপ ব্রিটেনকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করে। তা এমনকি আরো স্পষ্টভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রতীয়মান হয় যখন মার্কিন জেনারেল আইযেনহাওয়ার ঐ মিত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত হন, যা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল, যদিও জার্মান-আমেরিকান আইযেনহাওয়ার ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত ছিলেন না।

তারপর ১৯৪৪ সালে নিউইয়র্কে অবস্থিত ব্রেটন উড্স (Bretton Woods)-এ নতুন আন্তর্জাতিক মুদ্রাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। কৃত্রিম কাগুজে মুদ্রার বিশ্বে, মূল মুদ্রা হিসাবে বিশ্বব্যাপী বিবেচিত ব্রিটিশ স্টার্লিং-পাউন্ডকে ব্রেটন উড্সে মার্কিন ডলার দ্বারা স্থানচ্যুত করা হয়। একইভাবে কৃত্রিম মুদ্রার উপর ভিত্তি করে গঠিত, নতুন বিশ্ব-মুদ্রা ব্যবস্থার কেন্দ্র হিসাবে ওয়াশিংটন লন্ডনের স্থান দখল করে নেয়। এই নতুন পরাশক্তির উত্থান, আজব এবং রহস্যময়ভাবে ঐ একই ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্য থেকে সংঘটিত হয়েছে যা কিনা জেরুজালেমের প্রতি মোহের বশবর্তী হয়ে, প্রথমে ক্রুসেডের যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেছে এবং তারপর 'পবিত্রভূমিতে' ইহুদীদের জন্য জাতীয়-আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। ইসরাঈল রাষ্ট্র ও 'পবিত্রভূমির' সাথে ব্যাখ্যাতীত এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে, নতুন পরাশক্তিটি পুরাতন পরাশক্তির রেখে যাওয়া নীতিমালার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছে। আর তাই ১৯৪৮ সালে যখন ইসরাঈল রাষ্ট্রকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করা

হল, তখন ঐ ইহুদী রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দানকারী পৃথিবীর প্রথম দেশটি ছিল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র।

নতুন পরাশক্তিটি পর্যাপ্তভাবেই এটা স্পষ্ট করে দেয় যে, ইহুদী রাষ্ট্রের কৌশলগত অংশীদার হিসাবে তারা ব্রিটেনকে স্থানচ্যুত করেছে। বাস্তবিকই সে তা করতে গিয়ে এমন সব ঘটনা ঘটায়, যা ব্রিটেনকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করে। ১৯৫২ সালে এক মিশরীয় বিপ্লব ঘটে এবং মিশরীয় বাহিনী রাজপরিবারকে অপসারিত করে মিশরের ক্ষমতা গ্রহণ করে। ১৯৫৬ সালে কর্ণেল জামাল আবদুল নাসের, জেনারেল মোহাম্মদ নাজীবকে অপসারণ করে রাষ্ট্রপ্রধান হন। নাসের তড়িঘড়ি করে তার জাতীয়তাবাদী পরিচয়ের দর্শনীয় প্রমাণ রাখতে গিয়ে সুয়েজ খালকে রাষ্ট্রায়ত্ত করেন। ইসরাঈল ব্যাপারটাকে ইহুদী রাষ্ট্রের জন্য কৌশলগত হুমকি বলে গণ্য করে। অপরদিকে ব্রিটেন ব্যাপারটাকে তার পরাশক্তি মর্যাদার প্রতি চ্যালেঞ্জ বলে গণ্য করে।

যুক্তরাষ্ট্রকে পাশ কাটিয়ে ব্রিটিশ, ফরাসী ও ইসরাঈলি সরকার মিশরের উপর যৌথ আক্রমণ চালিয়ে মিশরীয় বাহিনীকে সুয়েজ থেকে সরিয়ে দেয়। তখন ব্রিটিশ, ফরাসী ও ইসরাঈলি বাহিনীকে মিশরীয় ভূখণ্ড প্রত্যাহার করার আদেশ দিয়ে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইযেনহাওয়ার তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। সাবেক পরাশক্তি ব্রিটেন তার বাহিনী প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় এবং অ্যান্থনী ইডেনের তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের পতন ঘটে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই হচ্ছে ইহুদী রাষ্ট্রটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক। আমাদের প্রশ্ন: 'পবিত্রভূমির' প্রতি ইউরো-মার্কিনের এই অদ্ভূত মোহ কেন?

'পবিত্রভূমির' প্রতি ইউরোপীয় এবং আমেরিকান (ইউরো-খৃস্টান ও ইউরো-ইহুদী সমেত) মোহ যদিবা আজব হয়ে থাকে, তবে মনে হচ্ছে তার চেয়েও বেশী আজব ব্যাপারসমূহ ভবিষ্যতে বিকাশ লাভ করতে যাচ্ছে। আমাদের মতে, বিশ্ব এখন ব্রিটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রকে পৃথিবীর প্রধান শক্তির অবস্থান থেকে অপসারণ এবং পরাশক্তি হিসাবে ইউরোপীয়ান-ইসরাঈল রাষ্ট্রের (অর্থাৎ এমন এক ইসরাঈল যা ইউরো-যায়োনিস্ট আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট) উত্থানের ঘটনা অবলোকন করার দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। ইউরো-ইসরাঈল ইতোমধ্যেই যথেষ্ট পারমাণবিক ও তাপ-পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী, যার ফলে তাকে পরাশক্তির মর্যাদা দেয়া যায়। উপরন্ত তার সামরিক প্রযুক্তি, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক প্রযুক্তির সমকক্ষ। সবশেষে, ইউরো-ইহুদী উদ্যোক্তা ও ব্যাঙ্কারগণের এমন ক্ষমতা রয়েছে যে, তারা অনায়াসে মার্কিন ডলারের ধ্বস্ নামিয়ে পৃথিবীর অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারে। যখন মার্কিন ডলারের পতন ঘটবে, তখন সেটা কাগুজে মুদ্রার গোটা পৃথিবীকে সাথে নিয়ে রসাতলে যাবে। ফিলিস্তিন এবং প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রসমূহের উপর আক্রমণের মাধ্যমে ইউরো-ইসরাঈলি সামরিক ক্ষমতার

প্রদর্শনীর সাথে পরিকল্পিতভাবে একই সময়ে এ ব্যাপারটা [ডলার কেন্দ্রিক অর্থনীতির ধ্বস] ঘটানো হতে পারে। ইসরাঈল তখন সফলভাবে এই যুদ্ধের ফসল ঘরে তুলবে এবং বাকী পৃথিবীকে অমান্য করবে। এবং তা করতে গিয়ে নিজেকে সে পৃথিবীর নিয়ন্তাশক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবে। সেটা যখন ঘটবে তখন প্রায় নিশ্চিতভাবেই ইসরাঈলি-ইহুদীদের (অর্থাৎ আসল বনী-ইসরাঈলের) কাছে মনে হবে যে, তারা স্বর্ণযুগের অর্থাৎ সুলায়মান (আঃ)-এর ইসরাঈল যে যুগে পৃথিবী শাসন করেছিল, সেই যুগে প্রত্যাবর্তনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে।

পবিত্র কুর'আনে কি উপরোক্ত সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা আছে? যদি থাকে তাহলে সেই ব্যাখ্যাটি কি?

আমরা প্রথমেই এ ব্যাপারটা স্বীকার করার ইচ্ছা পোষণ করি যে, এই গ্রন্থের মত একটি গ্রন্থ 'পবিত্রভূমিতে' ইহুদীদের প্রত্যাবর্তনের পূর্বে লেখা সম্ভব ছিল না। আর মনে হচ্ছে যে ঐ ঘটনা ঘটার পরে, এ পর্যন্ত এটাই হচ্ছে এই ধরনের প্রথম লিখিত গ্রন্থ। যার ফলে আমরা যখন আজব ও রহস্যময় ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করতে কুর'আন ও হাদীস ব্যবহার করছি তখন তা অনেককে, এমনকি ইসলামের অনেক পণ্ডিতকেও নিশ্চিতভাবে বিস্মিত করবে। এই লেখকের কাছে আরো মনে হয় যে, ইউরোপে এবং পবিত্রভূমিতে ঘটে যাওয়া অদ্ভূত ঘটনাবলীর যে কুরআনিক ব্যাখ্যা রয়েছে, সে সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান খুব সম্ভবত এখনকার আগে পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল না। একই সাথে এটা [এই অনুভূতি] এই লেখককে এবং যারা এখন এই গ্রন্থে যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তাকে সত্য হিসাবে গ্রহণ করবেন, তথা যারা এই জ্ঞান দ্বারা পূর্বেই আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সবাইকে বিনীতভাবে আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে সিজদায় যেতে বাধ্য করে, যাঁর একারই কেবল *"সব বিষয়ে জ্ঞান রয়েছে"* এবং *"যিনি যাকে খুশী তাকে তাঁর আলোর দিকে পরিচালিত করেন।"*

এই গ্রন্থে দেয়া কুর'আনিক ব্যাখ্যাকে যারা প্রত্যাখ্যান করবেন, তাঁদেরকে এই ঘোষণা দিতে হবে যে, হয় কুর'আন 'পবিত্রভূমিতে' ইহুদীদের প্রত্যাবর্তন এবং ইসরাঈল রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কোনো ব্যাখ্যা দেয় না, অথবা আমরা এই গ্রন্থে যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, তার চেয়ে ভিন্ন একটা ব্যাখ্যা রয়েছে; আর সেই ক্ষেত্রে সেই ভিন্ন কুর'আনিক ব্যাখ্যা প্রকাশ করার দায়দায়িত্ব তাদের উপর বর্তায়!

যারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং ঘোষণা করেন যে তাদের কাছে 'সত্য' রয়েছে, তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই বিষয়টা ব্যাখ্যা করতে তাদের সেই 'সত্য'-কে ব্যবহার করেন। সত্যের দাবীদার আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রই হোক বা সে ইহুদী ধর্ম, খৃস্টধর্ম, হিন্দুধর্ম, জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, কনফুসিয়বাদ, তাওবাদ,

বাহাই, আহমদীয়া, ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ ও উদারতাবাদ, বস্তুবাদ, অথবা নাস্তিকতাবাদ যাই হোক না কেন – ঐ দাবীর সত্যতা কেবল তখনই প্রমাণিত হবে, যদি তারা এখানে আলোচিত বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে পারেন। এই গ্রন্থের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব মনে হয় এখানেই। এই গ্রন্থে 'সত্য' সম্বন্ধে ইসলামের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

পবিত্র কুর'আন এই ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে যে পৃথিবী এখন দেখতে পাবে যে তার শেষ সময়ের ঘন্টা বাজা শুরু করেছে:

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا
يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَـٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٩٧﴾

"অমোঘ প্রতিশ্রুত সময় (হিসাব নিকাশের দিন) নিকটবর্তী হলে কাফেদের চক্ষু উচ্চে স্থির হয়ে যাবে;

"হায় আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা এ বিষয়ে বেখবর ছিলাম; বরং আমরা গোনাহগারই ছিলাম!"

(কুর'আন, সুরা আম্বিয়া ২১:৯৭)

যখন ইয়াজুজ-মাজুজের মুক্ত হবার কথা, তখন তারা '*প্রতিটি উঁচু স্থান থেকে দলে দলে নেমে আসবে*' অথবা '*চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে*'। এটাতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাদের অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা বলে তারা গোটা পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং ইতিহাসে প্রথমবারের মত কেবল একদল মানুষ সমগ্র মানবজাতিকে শাসন করবে। **ইতিহাসের কালস্রোতে ঠিক এই ক্ষণটিতেই পৃথিবী এখন অবস্থিত।**

ইয়াজুজ-মাজুজের বিশ্বব্যবস্থা হচ্ছে এক ফাসাদপূর্ণ ব্যবস্থা (অর্থাৎ অত্যাচার, নিপীড়ন ও শঠতার ব্যবস্থা)। সুরা কাহাফ ঐ বিশ্বব্যবস্থার ফাসাদের বৈশিষ্ট্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে দুটো প্রধান বৈশিষ্ট্যকে, যুলকারনাইনের সময়কার বিশ্ব ব্যবস্থার দুটো বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ বিপরীত বলে বর্ণনা করেছে। সেগুলো ছিল নিম্নরূপ:

যুলকারনাইন জুলুমকারীদের শায়েস্তা করতে ক্ষমতা ব্যবহার করেছিলেন (আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতা), আর তা করতে গিয়ে এখানে, পৃথিবীপৃষ্ঠের বিশ্বব্যবস্থার সাথে মহাজাগতিক বা ঐশী বিশ্বব্যবস্থার এক সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন (অর্থাৎ জাগতিক বাস্তবতার সাথে আধ্যাত্মিক বাস্তবতার সমন্বয় সাধন)। অপরপক্ষে ইয়াজুজ-মাজুজ তাদের (ঈশ্বর বর্জনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত) অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা ব্যবহার করবে অত্যাচার, নিপীড়ন এবং নিপীড়িতদের শায়েস্তা করার কাজে। তা করতে গিয়ে তারা এখানে, পৃথিবীপৃষ্ঠে, এমন বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

করবে যা কিনা ঊর্ধ্বের স্বর্গীয় বিন্যাসের সাথে সম্পূর্ণ বিরোধিতাপূর্ণ। দ্বিতীয়ত ঐ বিশ্ববিন্যাসের আওতায় আমরা দেখব যে অত্যাচার, নিপীড়নের মাত্রা কেবল উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেতে থাকবে।

যুলকারনাইন তার ক্ষমতা ব্যবহার করেছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলায় যাদের ঈমান ছিল এবং যারা সদাচারী ছিল, ঐ সমস্ত মানুষকে পুরস্কৃত করতে। ইয়াজুজ-মাজুজ একেবারে বিপরীত উদ্দেশ্যে তাদের ক্ষমতাকে ব্যবহার করবে। যুলকারনাইন যখন পৃথিবীর আদিম জনগোষ্ঠীর মুখোমুখি হয়েছিলেন, তখন তার ক্ষমতার প্রয়োগে তিনি নিজেকে সংযত রেখেছিলেন। ঐ সমস্ত জনমানুষের আদিম জীবনযাত্রাকে ধ্বংস না করে টিকে থাকার সুযোগ দিয়ে তিনি প্রজ্ঞা ও দয়ার পরিচয় দিয়েছিলেন। অপরপক্ষে ইয়াজুজ-মাজুজ পৃথিবীর সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রাকে ধ্বংস বা কার্যত নিশ্চিহ্ন করে দিতে তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। দ্বিতীয়ত তাদের ঐ বিশ্বব্যবস্থা হবে এমন এক ব্যবস্থা যাতে সনাতন জীবনযাত্রার উপর আক্রমণকে আমরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে দেখব, যার ফলশ্রুতিতে একসময় আদি জীবনযাত্রা শেষ পযন্ত সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

ইয়াজুজ-মাজুজ এভাবে এমন একটা বিশ্বব্যবস্থার সৃষ্টি করবে এবং তাকে প্রচলিত রাখবে যা ঐ সমস্ত ব্যক্তিত্বের দৃষ্টি এড়াবে না, যাদের (ঈমান এবং সদাচারের ভিত্তিতে গঠিত) আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি তাদেরকে যে কোন বিষয়ের অন্তর্নিহিত সত্য দেখতে সাহায্য করে। যদি ইহুদী জনগণ ইয়াজুজ-মাজুজদের মত অশুভ মানুষজনকে তাদের পবিত্রভূমি মুক্ত করার জন্য এবং জেরুজালেমে তাদের প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করার জন্য দায়িত্ব দিয়ে থাকে, তবে বুঝতে হবে যে তারা আধ্যাত্মিক দিক থেকে অন্ধ হয়ে গেছে।

মধ্যযুগের ইউরো-খৃস্টান রাজ্যের সময় থেকে শুরু করে আধুনিক ইউরোপীয় পশ্চিমা সভ্যতার সময় পর্যন্ত ইয়াজুজ-মাজুজের বিশ্বব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়েছে এবং তাদের মৌলিক মিশনও বাস্তবায়িত হয়েছে। ইউরোপ সমগ্র পৃথিবীকে দুর্নীতিগ্রস্ত করেছে এবং ইউরোপ-ই ইহুদীদের 'পবিত্রভূমিতে' ফিরিয়ে এনেছে। সুতরাং এটা ইহুদী জনগণের আধ্যাত্মিক অন্ধত্বের পরিচায়ক যে, তারা নিজেদেরকে ইয়াজুজ-মাজুজ কর্তৃক প্রতারিত হতে এবং অন্তিম ধ্বংসের পথে পরিচালিত হতে দিয়েছে।

ইহুদীদের চুড়ান্ত শাস্তিলাভের সময়ের যে অশনি সংকেত তা যেন আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি সেজন্য রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদের জন্য একটা উপায় রেখে গেছেন। প্রথমত ঐ চূড়ান্ত শাস্তি ততক্ষণ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে না যতক্ষণ না আসল

'মসীহ্' ঈসা (আঃ) 'ভণ্ড-মসীহ্' দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং এক জীবাণু যুদ্ধের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ তা'আলা নিজে ইয়াজুজ-মাজুজকে ধ্বংস করবেন। গ্যালিলি হ্রদে যতক্ষণ পানি অবশিষ্ট রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সময় আসবে না। নিম্নলিখিত হাদীসখানি দেখুন:

"আন্-নাউওয়াস ইব্নে সাম'আন (রাঃ) হতে বর্ণিত: এমন অবস্থায় আল্লাহ ঈসা (আঃ)-এর কাছে ওহী পাঠাবেন: আমি আমার দাসদের মধ্য থেকে এমন এক জনসমষ্টি তৈরী করেছি যাদের বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধ করতে সক্ষম নয়; তুমি এদের নিয়ে নিরাপদে তূর-এ চলে যাও, এবং তারপর আল্লাহ্ ইয়াজুজ-মাজুজদেরকে প্রেরণ করবেন এবং তারা প্রতিটি উঁচুস্থান থেকে দলে দলে নেমে আসবে। তাদের প্রথমজন টাইবেরিয়াস হ্রদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তা থেকে পানি পান করবে। আর শেষ জন যখন সেই হ্রদের পাশ দিয়ে যাবে তখন সে বলবে: এখানে একদা পানি ছিল। ঈসা (আঃ) এবং তাঁর সাথীগণ তারপর এখানে অবরুদ্ধ হয়ে পড়বেন (তূর-এ) এবং তাঁদের অবস্থা এমন শোচনীয় হবে যে, তাঁদের কাছে একটি ষাঁড়ের মাথা একশত দীনারের চেয়ে বেশী প্রিয় হবে। . . . ."

(সহীহ মুসলিম)

অতএব এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে আমরা যেন গ্যালিলি হ্রদের পানির গভীরতার দিকে মনোযোগ দেই। দেখুন এই গ্রন্থের শেষে 'প্রথম সংযোজন'। (এই সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ে ইয়াজুজ-মাজুজের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে যে সমস্ত অপর্যাপ্ততা অনুভূত হবে সেগুলোকে আমাদের আগামী গ্রন্থ Suratul Kahf and the Modern Age পূরণ করে দেবে, ইনশাআল্লাহ্)।

একাদশ অধ্যায়

ইহুদী জাতি ও আরব জাতি

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ۚ
ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾

"আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শত্রু ইহুদী ও মুশরেকদের পাবেন;

"আর আপনি সবার চাইতে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বে নিকটবর্তী তাদেরকে পাবেন যারা বলে, 'আমরা নাসারা';

"কেননা এদের মধ্যে আলেম রয়েছে, সংসার-বিরাগী রয়েছে, এবং তারা অহঙ্কার করে না।"

(কুর'আন, সুরা মায়িদাহ্ ৫:৮২)

আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইহুদীদেরকে তাদের 'পবিত্রভূমিতে' ফিরিয়ে আনবেন, সেটাই হবে তাদের উপর শাস্তি নেমে আসার অশনি সংকেত — এই ভবিষ্যদ্বাণী ইতোমধ্যেই বহুল পরিমাণে বাস্তবায়িত হয়েছে। এই সত্যতার অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার আগে 'ইসমা'ঈল (আঃ), আরব জাতি এবং পবিত্রভূমি', এই বিষয়গুলি একটু জেনে নেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। যায়োনিস্ট আন্দোলন যেহেতু আরবদের ঐ ভূমি থেকে এবং তাদের বাড়িঘর থেকে বলপূর্বক তাড়িয়ে দিয়েছে, এবং ইসরাঈল রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জন করেছে, সে জন্য বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ। এক ধরনের কিতাবাশ্রিত যৌক্তিকতা ছাড়া, তারা তা করার সাহস পেত না। অথচ ঐ কিতাবাশ্রিত যৌক্তিকতা, যার উপর তারা নির্ভর করেছিল, আসলে তা ছিল ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতার নামে চালিয়ে দেয়া মিথ্যাচার ও জালিয়াতি। যায়োনিস্টরা জানত যে ব্যাপারটা মিথ্যাচার ছিল এবং তারা ব্যাপারটাকে সম্ভাব্য সবরকমে কাজে লাগিয়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করব।

ইহুদীধর্মের দৃষ্টিতে আরববাসী

২০০০ সালের ৫ই আগস্ট শনিবারের ধর্মীয় অভিভাষণে ইসরাঈলের Sephardic ইহুদীদের[১] ঐকান্তিকভাবে গোঁড়া Orthodox Shas Party-র আধ্যাত্মিক নেতা ঘোষণা দিয়েছেন বলে খবরে প্রকাশ যে: *"ইসমাইলের বংশধরেরা (আরব) সবাই অভিশপ্ত পাপী এবং ইসরাঈলের শত্রু। সেই পবিত্র সত্তা, (অর্থাৎ আল্লাহ্), তিনি অনুশোচনা করেন যে তিনি এই ইসমা'ঈলীদের সৃষ্টি করেছিলেন।"* পবিত্র জেরুজালেম শহরের উপর ফিলিস্তিন লিবারেশন অর্গানাইজেশন এবং ইসরাঈলের পরস্পর বিরোধী দাবীর ব্যাপারে, ইসরাঈলের এহুদ বারাক সরকার এক ধরনের সমঝোতায় পৌঁছানোর চেষ্টা করছিল, সেই চেষ্টাকে বিদ্রূপ করে র‍্যাবাই Ovadia Yosef ঐ বক্তব্য রাখেন বলে খবরে প্রকাশ। তিনি জিজ্ঞেস করেন: *"পুরাতন শহরটি ভাগ করা হচ্ছে কেন? যাতে তারা আমাদের হত্যা করার আরেকটি সুযোগ পায় সে জন্য? আমাদের পাশাপাশি তাদের থাকবার প্রয়োজন কোথায়?"* ইসরাঈলী প্রধানমন্ত্রী এহুদ বারাককে উদ্দেশ্য করে র‍্যাবাই বলেন: *"তুমি সাপদেরকে আমাদের কাছে নিয়ে আসছ। তুমি একটা সাপের সাথে কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পার?"* তিনি আরো বলেন: *"বারাক দুষ্ট ইসমা'ঈলীদের পিছনে পাগলের মত ছুটছে ... সে জেরুজালেমে আমাদের পাশে বসবাস করার জন্য সাপদের নিয়ে আসবে। তার কোন হুঁশ নেই।"* The Jerusalem Post-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ঐ সমাবেশ হাত তালি দিয়ে র‍্যাবাই-র বক্তব্যের প্রশংসা করে। দেখুন www.JerusalemPost.com , ৫ই আগস্ট, ২০০০)।

ইসমা'ঈল (আঃ)-এর বংশধরদের প্রতি তার ঘৃণা এবং জেরুজালেমের উপর তাদের দাবীর বিরুদ্ধে তার অশ্রদ্ধার কারণ এই যে, তৌরাতের পয়দায়েশ কিতাব অনুযায়ী ইসমা'ঈল (আঃ) ছিলেন:

"... মানুষ হলেও সে বুনো গাধার মত হবে, সে সকলকে শত্রু করে তুলবে আর অন্যেরাও তাকে শত্রু বলে মনে করবে।"

(তৌরাত, পয়দায়েশ ১৬:১২)

ঐ র‍্যাবাই এবং তার অনুসারীরা তাই খুব সম্ভবত এই যুক্তি দেখাবেন যে ইসরাঈল কর্তৃক আরবদের উপর পরিচালিত বিরামহীন এবং উত্তরোত্তর বর্ধিষ্ণু অত্যাচার-নিপীড়ন এজন্য যুক্তিযুক্ত যে, নিম্নলিখিত শব্দগুলির মাঝে এর তথাকথিত ঐশ্বরিক অনুমোদন নিহিত রয়েছে: *"আর অন্যেরাও তাকে শত্রু বলে মনে করবে।"* এছাড়া আর

[১] স্পেন ও পর্তুগালের ইহুদীদেরকে সেফার্দিম ইহুদী আর মধ্য এবং পূর্ব ইউরোপের ইহুদীদেরকে আশকেনাযিম ইহুদী বলা হয়। হিব্রু ভাষায় স্পেনকে *সেফারাদ* এবং জার্মানীকে *আশকেনায* বলা হয়। ইউরোপীয় ইহুদীদের ৮৫% আশকেনাযিম।

কিভাবেই বা সভ্য জগতের বাকী সকলে 'পবিত্রভূমিতে' জেনিনের রিফিউজি ক্যাম্পের উপর ইসরাঈলীদের নিষ্ঠুর ও বর্বরোচিত আক্রমণকে ব্যাখ্যা করবে! যদি ইহুদীরা তৌরাতের পুনর্লিখন ও তাতে ইব্রাহীম (আঃ)-এর পুত্র ইসমা'ঈল (আঃ)-এর নামে মিথ্যাচারের কার্য সমাধা না করত, তাহলে 'পবিত্রভূমির' আরব মুসলিমদেরকে বিতাড়িত করে ইসরাঈল রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার শয়তানসুলভ যায়োনিস্ট ষড়যন্ত্রের মাঝে যে ধোঁকা এবং ফাঁদ পাতা রয়েছে, তা বুঝা বা সনাক্ত করা সহজতর হত।

পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ তা'আলার নবী, ইসমা'ঈল (আঃ)-এর যে বর্ণনা রয়েছে তা স্পষ্টতই তৌরাতের ঐ বক্তব্যের মাঝে যে জালিয়াতি এবং আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধে মিথ্যাচারকে উন্মোচিত করে:

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾
وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

"এই কিতাবে ইসমাঈলের কথা বর্ণনা করুন, তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী ছিলেন, এবং রাসূল ও নবী ছিলেন।

"তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন, এবং তিনি তাঁর পালনকর্তার কাছে পছন্দনীয় ছিলেন।"

(কুর'আন, সুরা মরিয়ম ১৯:৫৪-৫৫)

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ﴿٨٥﴾
وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٦﴾

"এবং ইসমা'ঈল, ইদরীস ও যুলকিফলের কথা স্মরণ করুন; তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সবরকারী।

"আমি তাদেরকে আমার রহমতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম: তাঁরা ছিলেন সৎকর্মপরায়ণ।"

(কুর'আন, সুরা আম্বিয়া ২১:৮৫-৮৬)

وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٨﴾
هَـٰذَا ذِكْرٌ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٤٩﴾
جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ ﴿٥٠﴾
مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿٥١﴾

وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ ﴿٥٢﴾
هَـٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾
إِنَّ هَـٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ﴿٥٤﴾

"আর স্মরণ করুন ইসমা'ঈল, আল-য়াসা'আ ও যুলকিফ্‌লের কথা; তারা প্রত্যেকেই ছিলেন গুণীজন।

"এ এক মহৎ আলোচনা; খোদাভীরুদের জন্যে রয়েছে উত্তম ঠিকানা।

"স্থায়ী বসবাসের জান্নাত; তাদের জন্যে তার দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে।

"সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে; তারা সেখানে চাইবে অনেক ফল-মূল ও পানীয়।

"তাদের কাছে থাকবে আনতনয়না সমবয়স্কা রমণীগণ।

"তোমাদেরকে এরই প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে বিচারদিবসের জন্যে।

"এটা আমার দেয়া রিযিক যা শেষ হবে না।"

(কুর'আন, সুরা সোয়াদ ৩৮:৪৮-৫৪)

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ ۗ
إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۖ
وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ
وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾
وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٥﴾
وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٨٦﴾
وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ۖ
وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾
ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ
وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾
أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ
فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَـٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾

أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّـهُ ۖ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ۗ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٠﴾
وَمَا قَدَرُوا اللَّـهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّـهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ ۗ
قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ ۖ
تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۖ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ ۖ
قُلِ اللَّـهُ ۖ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾
وَهَـٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩٢﴾

"এটি ছিল আমার যুক্তি, যা আমি ইবরাহীমকে তার সম্প্রদায়ের বিপক্ষে (ব্যবহারের জন্য) প্রদান করেছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় সমুন্নত করি।

"আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।

"আমি তাঁকে দান করেছি ইসহাক এবং ইয়াকুব। প্রত্যেককেই আমি পথ-প্রদর্শন করেছি এবং পূর্বে আমি নূহকে পথ-প্রদর্শন করেছি —

"তার সন্তানদের মধ্যে দাউদ, সোলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকে।

"এমনিভাবে আমি সৎকর্মশীলদেলকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

"আরও যাকারিয়া, ইয়াহিয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকে। তারা সবাই পূণ্যবানদের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

*"এবং **ইসমা'ঈল**, আল-য়াসা'আ, ইউনুস, লূতকে — প্রত্যেককেই আমি সারা বিশ্বের উপর গৌরবান্বিত করেছি।*

"আরও তাদের কিছু সংখ্যক পিতৃপুরুষ, সন্তান-সন্ততি ও ভ্রাতাদেরকে;

"আমি তাদেরকে মনোনীত করেছি এবং সরল পথ প্রদর্শন করেছি।

"এটি আল্লাহ্‌র হেদায়েত। স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা, এপথে চালান।

"যদি তারা শির্‌ক করত, তবে তাদের কাজকর্ম তাদের জন্যে ব্যর্থ হয়ে যেত।

"তাদেরকেই আমি কিতাব, শরীয়ত ও নবুওয়ত দান করেছি।

"অতএব, যদি এরা আপনার নবুওয়ত অস্বীকার করে, তবে এর জন্য এমন সম্প্রদায় নির্দিষ্ট করেছি, যারা এতে অবিশ্বাসী হবে না।

"এরা এমন ছিল, যাদেরকে আল্লাহ পথ-প্রদর্শন করেছিলেন। অতএব, আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন। আপনি বলে দিন: আমি তোমাদের কাছে এর জন্যে কোন পারিশ্রমিক চাই না।

"এটি সারা বিশ্বের জন্য একটি উপদেশমাত্র।

"তারা আল্লাহকে যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেনি, যখন তারা বলল: আল্লাহ কোন মানুষের প্রতি কোন কিছু অবতীর্ণ করেননি।

"আপনি জিজ্ঞেস করুন: ঐ গ্রন্থ কে নাযিল করেছে, যা মূসা নিয়ে এসেছিল? যা জ্যোতি বিশেষ এবং মানবমন্ডলীর জন্য হেদায়েতস্বরূপ,

"যা তোমরা বিক্ষিপ্তপত্রে রেখে লোকদের জন্যে প্রকাশ করছ এবং বহুলাংশকে গোপন করছ। তোমাদেরকে এমন অনেক বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা জানত না।

"আপনি বলে দিন: আল্লাহ নাযিল করেছেন। অতঃপর তাদেরকে তাদের ক্রীড়ামূলক বৃত্তিতে ব্যাপৃত থাকতে দিন।

"এ কুর'আন এমন গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি; বরকতময়, পূর্ববর্তী গ্রন্থের সত্যতা প্রমাণকারী, যেন আপনি মক্কাবাসী ও পার্শ্ববর্তীদেরকে ভয়প্রদর্শন করতে পারেন।

"যারা পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে, তারাই এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তারা নামাযের সংরক্ষণ করে।"

(কুর'আন, সুরা আন'আম ৬:৮৩-৯২)

কুর'আনে উচ্চারিত এই কঠোর হুঁশিয়ারীর ব্যাপারে ঐ র‍্যাবাই-র সাবধান হওয়া উচিত, যেখানে আল্লাহ্ তা'আলা ইসমা'ঈল (আঃ) এবং তাঁর বংশধরদের সম্বন্ধে মিথ্যাচারীদের তিরষ্কার করেছেন:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّـهِ كَذِبًا
أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّـهُ ۗ
وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ
وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ۖ
الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّـهِ غَيْرَ الْحَقِّ
وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾

"ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় জালেম কে হবে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে

"অথবা বলে: আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ তার প্রতি কোন ওহী আসেনি এবং যে দাবী করে যে, আমিও নাযিল করে দেখাচ্ছি, যেমন আল্লাহ্ নাযিল করেছেন।

"যদি আপনি দেখতে পেতেন, যখন জালেমরা মৃত্যু-যন্ত্রণায় থাকে

"এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলে, বের কর স্বীয় আত্মা!

"অদ্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহ্‌র উপরে অসত্য বলতে

"এবং তাঁর আয়াতসমূহকে অহংকারভরে প্রত্যাখ্যান করতে।"

(কুর'আন, সুরা আন'আম ৬:৯৩)

ঐ র‍্যাবাই এবং তৌরাতের ঐ ধরনের জালিয়াতির উপর যাদের ধর্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত, তারা সকলেই এক কাল্পনিক জগতে বসবাস করে। বাস্তবতা সম্বন্ধে তাদের উপলব্ধি হচ্ছে মিথ্যা ও বিকৃত। এর ফলে যে ক্ষতি হচ্ছে তা এই যে ইসমা'ঈল (আঃ) সম্বন্ধে তারা উপরোক্ত মিথ্যা বিশ্বাস সৃষ্টি করেছে এবং সেই মিথ্যা বিশ্বাসকে আজো লালিত করছে। তৌরাতে কখনই ইসমা'ঈল (আঃ)-এর চরিত্রের কোন মন্দ দিক, দুর্ব্যবহার অথবা বিদ্রোহের কোন প্রমাণ পেশ করা হয়নি যা থেকে ঐ কথিত ঐশ্বরিক তিরস্কারকে ব্যাখ্যা করা যায়। পক্ষান্তরে ইসমাঈলের বংশধরেরা, যাদেরকে ঐ র‍্যাবাই সর্পকুল বলে অভিহিত করে ঘৃণা প্রকাশ করেছেন, তারাই ২০০০ বছর ধরে নিজেদের মাঝে ইহুদীদেরকে বসবাসের সুযোগ দিয়েছে। তারা [ইহুদীরা] তাদের জান ও মালের পূর্ণ নিরাপত্তা উপভোগ করেছে এবং ইহুদী হিসাবে বেঁচে থাকার এবং প্রার্থনা করার পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেছে।

যারা ভণ্ড ইসরাঈল রাষ্ট্রের (যা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী এবং অবশ্যই স্রষ্টা-বিমুখ একটা প্রকল্প) সৃষ্টিকে সমর্থন করেছিলেন এবং এখনও করেন যা অবিচার এবং অত্যাচারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তারা হচ্ছেন এমন মানুষ যাদের আদৌ কোন আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি নেই। যে আধ্যাত্মিক অন্ধত্ব এই ভণ্ড রাষ্ট্রটিকে সনাক্ত করতে তাদের অক্ষম করে দিয়েছে, যার ভন্ডামি প্রতিদিন তাদেরকে নদীর স্রোতের টানে আরো ভাটিতে নিয়ে যাচ্ছে, সেই একই আধ্যাত্মিক অন্ধত্ব তাদেরকে দিয়ে এটাও ঘোষণা করিয়েছিল যে, মরিয়ম ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং ঈসা (মসীহ্) জারজ সন্তান ছিলেন এবং তিনি যে নিজেকে 'মসীহ্' হিসেবে দাবী করেছিলেন, তা মিথ্যা ছিল। এই অন্ধত্বই তাদেরকে ইতিহাসের সবচেয়ে ন্যাক্কারজনক এবং জঘন্য কাজটি, অর্থাৎ ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশবিদ্ধ করার চেষ্টা এবং তারপর এটা বলে গর্ব করে বেড়ানো যে তারা তাকে হত্যা করতে সফল হয়েছে, ইত্যাদি করার পথে নিয়ে গেছে। ঐ আধ্যাত্মিক অন্ধত্বই ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতা কর্তৃক মানুষের কাছে প্রেরিত শেষ নবী (সাঃ)-কে প্রত্যাখ্যান করিয়েছে। কুর'আনকে ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতা আল্লাহ্ তা'আলার বাণী হিসাবে অস্বীকার করার পথে এটাই তাদেরকে নিয়ে গেছে। তাদের সেই অন্ধত্ব বার বার তাদেরকে এমন সব কাজে লিপ্ত করেছে, যা আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধের জন্ম দিয়েছে। তাদের বর্তমান বর্ণবাদী, ব্যবসায়িক এবং অর্থনৈতিক আচরণ স্পষ্টতই ঘৃণ্য।

বহু আগে যখন তারা মূসা (আঃ)-কে অপমান করেছিল এবং বলেছিল যে, তাঁর এবং তাঁর প্রভুর উচিত 'পবিত্রভূমিকে' মুক্ত করতে একত্রে যুদ্ধ করা, এবং তারা বসে তামাশা দেখবে, আল্লাহ্ তা'আলা ঐ জঘন্য আচরণের কারণে, পরবর্তী চল্লিশ বৎসর 'পবিত্রভূমিকে' তাদের জন্য হারাম ঘোষণা করে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন, এবং অমনোযোগী ও লক্ষ্যহীনভাবে পৃথিবীপৃষ্ঠে ঘুরে বেড়ানোটাই তাদের জন্য বরাদ্দ করে দিয়েছিলেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আঃ)-কে ডাকলেন এবং বললেন: *"এই সমস্ত পাপী মানুষদের জন্য দুঃখ কর না।"* ঐ কথাগুলোয় সহানুভূতির কোন স্থান ছিল না। আল্লাহ্র নাযিল করা তৌরাতে জালিয়াতির মাধ্যমে [মানুষের] লেখা ঢোকানোর ব্যাপারটা ধরিয়ে দেবার জন্য যদি পবিত্র কুর'আন নাও থাকত, তৌরাত এবং ইঞ্জীলের অনুসারীদের অন্তর্দৃষ্টিই তাদের এই ব্যাপারটা ধরতে পারার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত ছিল যে, সেসকল কিতাবে লিখিত সব কথা সত্যি নয়, বিশেষভাবে ইসমা'ঈল (আঃ) সম্বন্ধে।

আর সেজন্যই ঐ সময় যেমন তারা সহানুভূতি পাবার যোগ্য ছিল না, ঠিক একই কারণে আজও তারা সহানুভূতি পাবার আশা করতে পারে না। তাদের সময় শেষ। তাদের ভাগ্য ইতোমধ্যেই নির্ধারিত হয়ে গেছে। ইতিহাসে সংঘটিত জঘন্যতম প্রতারণার ঘটনায় তারা প্রতারিত হয়েছে, – ২০০০ বছর ধরে ইসমা'ঈলী আরবদের মাঝে তুলনামূলক শান্তি, নিরাপত্তা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার মাঝে তারা যে সমস্ত দেশে বসবাস করছিল (ইয়েমেন, মরক্কো, মিশর, ইরান, ইরাক, সিরিয়া ইত্যাদি), সে সমস্ত দেশ ত্যাগ করায় প্ররোচিত হয়ে – এবং অত্যাচার ও অবিচার সমর্থন করতে পবিত্রভূমিতে ফিরে এসে। দিন দিন সেই অত্যাচার উৎপীড়ন দুঃখজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুসলিমরা তাদের ধোঁকা দেয়নি। মুসলিমরা তাদের প্রত্যাবর্তন করতে আহ্বান জানায়নি। পবিত্র কুর'আন ঘোষণা করে যে, ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতা নিজেই এটা নির্ধারণ করেছেন। ঐ একই সর্বমহান বিধাতা, যিনি দুই দুইবার সুলায়মান (আঃ) কর্তৃক নির্মিত উপাসনালয়ের (মসজিদ) ধ্বংস নির্ধারণ করেছেন, তিনি নিজে ভণ্ড ইসরাঈল রাষ্ট্রের ধ্বংস নিশ্চিত করবেন। এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য হচ্ছে জেরুজালেম এবং ইসরাঈল রাষ্ট্রের ধ্বংসের ব্যাপারে কুর'আন কি বলে সেদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা। যখন ঐ ধ্বংসলীলা সংঘটিত হবে, আর তা নিশ্চিতভাবে অনিবার্য, তখন সেটা হবে কোন জাতির উপর নেমে আসা ইতিহাসের কঠোরতম ঐশ্বরিক শাস্তি এবং সেটা তাদের ভয়ার্ত চোখের সামনে বাস্তবতা লাভ করবে। ঐ র‍্যাবাই যেন সতর্ক হয়ে যান!

বাস্তবতার বিকৃত উপলব্ধি ঐ র‍্যাবাই-র বক্তব্যে স্পষ্টতই পরিলক্ষিত হয়। সেই একই বিকৃতি জেরুজালেম এবং 'পবিত্রভূমির' ভবিষ্যত নিয়ে আপোষ-মীমাংসার মারাত্মক মহড়ায় নিয়োজিত দুই পক্ষ, অর্থাৎ পি-এল-ও এবং ইসরাঈল রাষ্ট্রের মাঝেও দেখা যায়। তারা উভয়েই পবিত্র কুর'আন অথবা তৌরাতকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দিক

নির্দেশনাসূত্র হিসাবে গণ্য করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা বা অবজ্ঞার পরিচয় দিয়েছে। নিজ নিজ ধর্মের অর্থাৎ ইসলাম ও ইহুদী ধর্মের ধারণার সাথে, তাদের যত না মিল রয়েছে তার চেয়ে বরং ঐ দুই পক্ষের নিজেদের মাঝে অনেক বেশী মিল রয়েছে। তারা উভয়েই ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, যারা নির্ভেজাল ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী লক্ষ্য হাসিল করার জন্য ধর্মের অপব্যবহার করছে। ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ নিরঙ্কুশ সত্য সন্ধানের কোন স্পৃহা রাখে না। আসলে তারা যে বিধাতার উপাসনা করে, সেই বিধাতাকে তারা নিজেরাই সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টি করে থাকে। আর একই ভাবে প্রয়োজনের তাগিদে তাদের মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়, যেগুলো সতত পরিবর্তনশীল ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদীর সাথে খাপ খাওয়াতে প্রতিনিয়তই নতুন নতুন রূপ ধারণ করছে।

পূর্ব জেরুজালেমকে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে পাওয়ার ফিলিস্তিনী দাবীর ব্যাপারে হয়ত বা কোন সুকৌশলী আপোষ ফর্মূলা অর্জিত হবে। কিন্তু যদি এবং কখনো ঐ ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ও, আদতে তা হবে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের হুবহু নকল। সেক্ষেত্রে, 'পবিত্রভূমির' পরিচিতি আরও পরিপূর্ণরূপে আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা থেকে জন্ম নেয়া শির্কের উপর প্রতিষ্ঠিত নতুন বিশ্বব্যবস্থার একটা অংশ হিসেবে নিশ্চিত হবে। সার্বভৌমত্ব যখন আল্লাহ্ তা'আলার পরিবর্তে কোন রাষ্ট্র বা অন্য কোন পরিচিতির কাছে ন্যস্ত হয়, তখনই স্পষ্ট শির্ক সংঘটিত হয়। যখন কোন রাষ্ট্রের কাছে সর্বময় কর্তৃত্ব ন্যস্ত করা হয় এবং যখন রাষ্ট্রের আইন সর্বোচ্চ আইনে পরিণত হয়, তখনই শির্ক সংঘটিত হয়।

মুসলিমদের কাছে *হারাম আশ-শারীফ*[১] ও ইহুদীদের কাছে *টেমপ্‌ল মাউন্ট*[২] হিসেবে পরিচিত সুলায়মান (আঃ) কর্তৃক নির্মিত মসজিদের জায়গাটি নিয়ে ইসরাঈল সরকার ও পি-এল-ওর মধ্যে যে বিরোধ রয়েছে, সে ব্যাপারে সমাধানে পৌঁছাতে মার্কিন সরকার যে প্রস্তাব রেখেছিল, সেই প্রস্তাবের ভিতর আমরা শির্কের সর্বাপেক্ষা নির্লজ্জ রূপ দেখতে পাই। ঐ মার্কিন পরিকল্পনা ইসরাঈল রাষ্ট্রকে পশ্চিমা দেয়ালের উপর 'সার্বভৌমত্ব' দান করার কথা বলেছিল। ইহুদীরা সেটাকে সুলায়মান (আঃ) কর্তৃক নির্মিত আদি উপাসনালয়ের (মসজিদ) অবশিষ্ট বলে মর্যাদা দেয়। অপরপক্ষে মসজিদ আল-আক্‌সা এবং ওমরের (রাঃ) মসজিদের (Dome of the Rock বা *কুব্বাত আল-সাখরা* বলে পরিচিত) উপর ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব লাভ করার কথা ছিল। অর্থাৎ ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতাকে *হারাম আশ-শারীফের* (যারা এই আরবী নাম ব্যবহার করতে

[১] মাসজিদ আল-আক্‌সা।

[২] যায়ন পাহাড়ের উপর অবস্থিত সুলায়মান (আঃ)-এর হায়কাল্।

অস্বস্তি বোধ করেন তাদের ভাষায় 'The Walled area' বলে পরিচিত) বাকীটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হত। এই প্রস্তাবের ফর্মূলা যখন তৈরী করা হয়, তখন খোদ শয়তান নিশ্চয়ই সেখানে উপদেষ্টা হিসাবে উপস্থিত ছিল।

আল্লাহ্ তা'আলা যা 'হারাম' করেছেন, রাষ্ট্র যখন সেটাকে 'হালাল' বলে ঘোষণা করার পদক্ষেপ নেয়, অথবা যা 'হালাল' করেছেন সেটাকে 'হারাম' করার চেষ্টা করে, তখনই শির্ক সম্পাদিত হয়। ভবিষ্যতের ফিলিস্তিন রাষ্ট্র যে সেখানে জুয়া ও লটারী, এমনকি রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় লটারীকে আইনগত বৈধতা দেবে, এটা পূর্বদিক থেকে সূর্যোদয় হওয়ার মতই একটা নিশ্চিত ব্যাপার। সেই রাষ্ট্র রিবা অর্থাৎ সুদের বিনিময়ে অর্থের আদান-প্রদানকে আইনসিদ্ধ করবে (রিবা সম্বন্ধে পরিপূর্ণ ধারণার জন্য আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থ দু'খানি দেখুন)। ঐ রাষ্ট্র মদ্যপানও আইনসিদ্ধ করবে। মোট কথা ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈল এবং আজকের বাকী পৃথিবী (মুসলিম বিশ্বের বেশীরভাগ দেশসমেত) ইতোমধ্যেই যেভাবে শির্ককে পন্থা হিসাবে অবলম্বন করেছে, একইভাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রও তাই করবে। পি-এল-ও কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই ফিলিস্তিন রাষ্ট্র নিজের জনগণকে একই ধরনের অবক্ষয়ের পথে পরিচালিত করবে, যা আজ ধর্মনিরপেক্ষ ইহুদী রাষ্ট্র তথা বাকী বিশ্ব করে চলেছে।

সাম্প্রতিক সৌদি পরিকল্পনা যা ইসরাঈল রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতে চায় এবং ফিলিস্তিনে বসবাসকারী খৃস্টান ও মুসলিম জনসংখ্যার উপর গত পঞ্চাশ বছরের অত্যাচার নিপীড়নকে মেনে নিতে চায়, এ ধরনের কোন সমঝোতার প্রতি মুসলিমরা সমর্থন জ্ঞাপন করতে পারে না বা পারা উচিতও না। ঠিক তেমনি তারা 'পবিত্রভূমিতে' ইহুদী রাষ্ট্রের হুবহু নকল হিসাবে একটি ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা মেনে নিতে পারে না। এই ধারণার সমর্থনে জেরুজালেম এবং এর শেষ অধ্যায়ের বিষয়ে কুর'আনের দৃষ্টিকোণ থেকে বক্তব্যকে আমরা লিপিবদ্ধ করেছি, যার বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে আমাদের গ্রন্থ: The Religion of Abraham and the State of Israel ─ A View from the Qur'an-এ।

এই গ্রন্থ অবশ্য ঐ সমস্ত ইহুদী, যারা নির্বিচারে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী ইসরাঈলকে দাউদ (আঃ) এবং সুলায়মান (আঃ) কর্তৃক সৃষ্ট অতীতের গৌরবময় রাজ্যের প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করেছে, তাদের কাছে বাস্তব অবস্থা ব্যাখ্যা করতেও সচেষ্ট। বর্তমানের ইসরাঈল রাষ্ট্র হচ্ছে আসলে এক ভণ্ড পরিচিতি যা ইহুদীদেরকে ধোঁকা দিয়েছে। ইসরাঈলের প্রকাশ্য সমালোচনাকারী ফিলিস্তিনী ইসলামি পণ্ডিত ড. ইসমা'ঈল রাজী আল-ফারূকি – যাকে অন্ধকারে হত্যা করা হয়েছিল, তিনি ইসরাঈলকে "এক ঔপনিবেশিক প্রকল্প", "পাপ থেকে জন্ম নেওয়া", "সেকেলে জাতীয় চরিত্র ও মিশনের উপর প্রতিষ্ঠিত" এবং "স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সামরিক নিপীড়নকারী" ইত্যাদি বলে বর্ণনা

করেছেন (তার চমৎকার গ্রন্থ: Islam and the Problem of Israel দেখুন)। স্থানীয় আরব জনসংখ্যা, যাদের নিজ বাসভূমি থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল অথবা যারা সন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তারা ছিল ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতার উপাসনাকারী এক জনগোষ্ঠী। অথচ ইহুদীরা 'পবিত্রভূমির' উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ সুসংহত করে নেয়ার পরও ঐ সমস্ত উদ্বাস্তুদেরকে দেশে ফেরার ব্যাপারে আমন্ত্রণ জানাতে অস্বীকার করল এবং তাদের প্রত্যাবর্তন করার অনুমতি দিতে অস্বীকার করল। পঞ্চাশ বছর পরে আজও তারা একগুঁয়ে ভাবে ঐ সমস্ত উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারটাকে প্রত্যাখ্যান করে চলেছে, অথচ একই সময়ে তারা পৃথিবীর যে কোন স্থানে বসবাসকারী ইহুদীদেরকে 'পবিত্রভূমিতে' এসে বসবাস করার আহ্বান বহাল রেখেছে। এই আচরণ মোটেই সদাচার নয়! বরং তা শয়তানসুলভ।

রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ভবিষদ্বাণীতে এরকম ইঙ্গিত রয়েছে যে, যায়োনিস্ট রাষ্ট্র ইসরাঈল শেষ পর্যন্ত বনী ইসরাঈলকে প্রতারিত করবে এবং তাদেরকে ঐ সমস্ত জনগণের সামনে ঠেলে দেবে যারা ইসরাঈল কর্তৃক অত্যন্ত নির্লজ্জ ও রাখঢাকবিহীনভাবে অবিরাম নিপীড়িত ও নির্যাতিত হয়ে আসছে।

ইয়াসির আরাফাত আসলে একজন ভণ্ড। সে ঐ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে না যাদেরকে নিজেদের বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং পঞ্চাশ বছরের বেশী সময় ধরে যাদের উপর অবিরাম নিপীড়ন চালান হয়েছে। ঐ জনগোষ্ঠী হচ্ছে সেই সমস্ত ফিলিস্তিনী, যারা ইসরাঈল কর্তৃক ফিলিস্তিন থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল, এবং লেবানন ও অন্যান্য জায়গার রিফিউজি ক্যাম্পে পঞ্চাশ বছরের বেশী সময় ধরে বসবাস করে আসছে। ইসরাঈল যেভাবে এরই মাঝে ইহুদীদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে, একইভাবে আরাফাতও ঐ জনগোষ্ঠীকে ধোঁকা দেবে। আরাফাত যাদের ধোঁকা দেবে, শেষ পর্যন্ত তারাই ঐ মুসলিম বাহিনীর প্রধান অংশ হবে, যারা 'পবিত্রভূমির' ইহুদী বসবাসকারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, এবং ইসরাঈল রাষ্ট্র যখন তাদের পরিত্যাগ করবে তখন তাদের শায়েস্তা করবে। ঐ মুসলিম বাহিনী ইতোমধ্যে দক্ষিণ লেবাননে তাদের যুদ্ধদক্ষতা প্রদর্শন করেছে। এবং সেই সাথে দক্ষিণ লেবানন থেকে ইসরাঈলী বাহিনীর প্রত্যাহার (এবং যে পোষ্য খৃস্টান বাহিনী তাদের হয়ে যুদ্ধ করে আসছিল তাদেরকে পরিত্যাগ) হচ্ছে ভবিষ্যতে বিকাশোন্মুখ আরও নাটকীয় ঘটনাবলীর পূর্বলক্ষণ।

ধর্মনিরপেক্ষ ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈল কর্তৃক ইসমা'ঈল (আঃ)-এর বংশধরদের উপর বর্ণবাদী নিপীড়ন নাটকীয়ভাবে 'পবিত্র ভূমিতে' ইতোমধ্যে বিরাজমান ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক নিপীড়নকে আরও তীব্রতর করে তুলেছে। ঐ নিপীড়ন উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাচ্ছে। এই পটভূমিতে এখন আমরা রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে ঘোষিত সতর্কতাকে অনুধাবন করতে সক্ষম হব:

"তোমরা নিশ্চিতভাবে ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং নিশ্চিতভাবে তাদের হত্যা করবে। (আর এটা চলতেই থাকবে) যতক্ষণ না (এমনকি) পাথরসমূহ কথা বলবে (এই বলে): হে মুসলিম! আমার পিছনে একজন ইহুদী লুকিয়ে আছে, আস এবং তাকে হত্যা কর।"

(সহীহ বুখারী)

দ্বাদশ অধ্যায়

‘পবিত্রভূমিতে’ ইহুদীদের প্রত্যাবর্তনের কুর’আনিক ব্যাখ্যা

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّـــهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

“আর বলুন: সকল প্রশংসা অল্লাহ্‌র, যিনি শীঘ্রই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন দেখাবেন, তখন তোমরা তা চিনতে পারবে; এবং তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আপনার পালনকর্তা অমনোযোগী নন।”

(কুর’আন, সুরা নাম্‌ল ২৭:৯৩)

আমরা এমন একটি যুগে বাস করছি যখন প্রায় ২০০০ বৎসর পবিত্রভূমি থেকে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নির্বাসনে থাকার পর ইহুদীরা জেরুজালেমে ফিরে এসেছে, ‘সেটাকে পুনরুদ্ধার করতে’। আজ জেরুজালেম সমৃদ্ধ। ‘পবিত্রভূমি’ যেখানে অবস্থিত তার আশপাশের গোটা অঞ্চলটার উপরই তাদের ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। ইসরাঈল রাষ্ট্র, মিশর এবং জর্ডানের মত স্রষ্টা-বিমুখ পশ্চিমের তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির সাথে সুবিধাজনক ‘শান্তি’ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। এছাড়াও ইসরাঈল ফিলিস্তিন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পি-এল-ও)-র সাথে আরো অনেক লাভজনক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে যা ক্রমান্বয়ে ‘পবিত্রভূমিতে’ ইহুদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাদের বিরোধিতাকে দ্রবীভূত করে ফেলেছে। এমনকি সৌদি আরবও কার্যত ইসরাঈলকে গ্রহণ করার পদক্ষেপ নিয়েছে, কিন্তু এ ব্যাপারে সৌদিরা তাদের পরিকল্পনা প্রকাশ করার আগে অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে গেছে, এবং পরিশেষে তাদের অতি সাবধানী নীরবতা ভেঙে নাটকীয় ভাবে বেরিয়ে এসেছে — ঐ ‘সৌদি পরিকল্পনার’ ভিতর ইহুদী রাষ্ট্রের ‘স্বীকৃতিও’ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

ইত্যবসরে মদীনা শহর অনেকটা গুরুত্বহীন শহরের মর্যাদায় ফিরে গেছে, আঞ্চলিক বা বিশ্বের বিকাশমান ঘটনাগুলির উপর যার কোন প্রভাবই নেই। মদীনার ক্ষয়িষ্ণুতাকে আরও অপমানজনক করার জন্য খেলাফতের ধ্বংসাবশেষ থেকে ব্রিটেনের তাঁবেদার রাষ্ট্র হিসাবে সৌদি রাষ্ট্রকে সৃষ্টি করা হয়, যা এখন মদীনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। নিয়ন্তা রাষ্ট্র হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র যখন ব্রিটেনের স্থলাভিষিক্ত হল, তখন সৌদি রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হল। শুরু থেকেই ইসরাঈলের মতই সৌদি আরব প্রথমে ব্রিটেনের উপর এবং তারপর যুক্তরাষ্ট্রের উপর তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে নির্ভরশীল।

১৯১৬ সালে আবদুল আজিজ ইব্নে সউদ যখন মাসিক ৫০০০ পাউন্ডের বিনিময়ে ব্রিটেনের সাথে মৈত্রীতে আবদ্ধ হন যার মাধ্যমে ওসমানি ইসলামি শাসন থেকে হিজাযের নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নেয়ার ব্রিটিশ লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়, তখন থেকে আজ পর্যন্ত সৌদি-ওহাবী আঁতাত, সৌদি রাষ্ট্রের রাজনীতি ও ধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে এবং বিশ্বস্তভাবে ঐ রাষ্ট্রের তাঁবেদার রাষ্ট্র মর্যাদা সংরক্ষণ করে আসছে। ওহাবী ধর্মীয় আন্দোলন, খৃস্টান ও ইহুদী পশ্চিমের সাথে তাঁবেদার রাষ্ট্র মর্যাদা মেনে নিতে সক্ষম হয়, কেননা খৃস্টান ও ইহুদীদেরকে তারা বাকী মুসলিম বিশ্বের তুলনায় নিজেদের বেশী কাছের বলেই মনে করেছে। ওহাবীরা অ-ওহাবী মুসলিমদের অবিশ্বাসী বলে গণ্য করেছে, কেননা তারা তাদের সবাইকে 'শিরকের' অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে (আমাদের গ্রন্থ: The Caliphate, the Hijaz and the Saudi-Wahhabi Nation State দেখুন)।

ইসরাঈলের উত্থানও ঠিক একইভাবে পশ্চিমের তাঁবেদার রাষ্ট্র হিসাবে ঘটেছে। কিন্তু ইসরাঈল এবং সৌদি আরব এই দুটো তাঁবেদার রাষ্ট্রের ভিতরে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রথমে ব্রিটেন এবং পরে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তাঁবেদার রাষ্ট্রের মর্যাদা থেকে নিজেকে কেবল মুক্ত করাই যে ইসরাঈলের নিয়তি তাই নয়, বরং ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের পরে পৃথিবীর নিয়ন্তা রাষ্ট্র হিসেবে মর্যাদা লাভকারী পরাশক্তির অবস্থানে যাওয়াও তার নিয়তি। তা যখন সংঘটিত হবে তখন সৌদি রাষ্ট্র ইসরাঈলের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হবে। ঐ সময় জেরুজালেমের সমৃদ্ধি বিকাশ লাভ করবে আর মদীনা তখন ধ্বংসাবশেষের অবস্থায় উপনীত হবে (অর্থাৎ ইসরাঈল রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ আনুগত্যের অবস্থায় উপনীত হবে)।

রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এমন দিন আসবে। কিন্তু সেটা ইসরাঈলের জন্য এক অশুভ বার্তা বয়ে নিয়ে আসবে:

"মুয়ায ইব্নে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন: জেরুজালেমের সমৃদ্ধির অবস্থা আসবে যখন ইয়াসরিব (অর্থাৎ আজকের সৌদি আরবের মদীনা) ধ্বংসাবশেষের অবস্থায় থাকবে, ইয়াসরিবের ঐ জরাজীর্ণ অবস্থা হবে যখন মহাযুদ্ধ আসবে, মহাযুদ্ধ আসবে যখন কনস্টানটিনোপল বিজিত হবে, কনস্টানটিনোপল বিজিত হবে যখন দাজ্জাল ('ভণ্ড-মসীহ্' বা Anti-Christ) বেরিয়ে আসবে। তিনি [নবী (সাঃ)] হাত দিয়ে তাঁর উরু অথবা কাঁধ চাপড়ে বললেন: তুমি (অর্থাৎ মুয়ায ইব্নে জাবাল) যে এখানে আছ এবং বসে আছে এটা যেমন সত্য, ঠিক তেমনি একথাও সত্য।"

(সুনান, আবু দাউদ)

জেরুজালেমের সমৃদ্ধশালী অবস্থা, যার ফলে আজ সে যে অঞ্চলে অবস্থিত সেই গোটা অঞ্চলের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে, তা উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীকে যথেষ্ট

পরিমাণে সত্যায়িত করেছে। ইতোমধ্যেই ইসরাঈল সফলভাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট তথা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ, উভয়কেই সফলভাবে অবজ্ঞা করেছে, যারা উভয়েই ফিলিস্তিনী পশ্চিম তীর থেকে ইসরাঈলী বাহিনীর প্রত্যাহার দাবী করেছিল। ফিলিস্তিনী মানব বোমারুদের (যারা হচ্ছেন শহীদ এবং যাদেরকে 'আত্মঘাতী' বোমা হামলাকারী হিসেবে বর্ণনা করা উচিত নয়) কার্যকলাপ চলাকালীন ইসরাঈল ঐ অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছিল। কিন্তু ইসরাঈল যখন তার বৃহত্তম যুদ্ধে আত্মনিয়োগ করবে — প্রায় সবাই (হয়ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছাড়া) যে যুদ্ধের আশঙ্কা করেন — তখন ফিলিস্তিনীদের হামলা আরও বৃদ্ধি পাবে। ঐ যুদ্ধ ইসরাঈলের সীমানার নাটকীয় সম্প্রসারণ এনে দেবে। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী তখন আরো পরিস্কারভাবে বুঝা যাবে।

অদূর ভবিষ্যতে মার্কিন অর্থনীতির ধ্বস্ এবং ঐ যুদ্ধের ফলে লাভ করা নতুন অঞ্চল পরিত্যাগ করার মার্কিন দাবীকে সফলভাবে অবজ্ঞা করার মধ্য দিয়ে, উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হবে। একইভাবে, স্রষ্টা-বিমুখ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইসলামের প্রাণকেন্দ্রের যে তাঁবেদার-রাষ্ট্র-সম্পর্ক চালু রয়েছে, সেটা যে ইয়াসরিবের (অর্থাৎ মদীনার) জরাজীর্ণ অবস্থার ভবিষ্যদ্বাণীকে ইতোমধ্যে অনেকাংশে বাস্তবায়িত করেছে, তারই পরিচায়ক। ইসরাঈল যখন পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী পরাশক্তি হিসাবে অবস্থান গ্রহণ করবে এবং সৌদি রাষ্ট্র যখন ইসরাঈলের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হবে, তখন এই ভবিষ্যদ্বাণীটি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হবে। উপরে বর্ণিত হাদীসে উচ্চারিত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হওয়ার নিহিতার্থ হচ্ছে এই যে, মুসলিমরা এখন এক মহাযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে, যে মহাযুদ্ধ, সম্ভবত, ইসরাঈল এবং কামালপন্থী তুরস্কের বাহিনীদ্বয় সম্মিলিতভাবে শুরু করবে। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) তুরস্কের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে গেছেন, যার বাহিনী এখন ইসরাঈলের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে:

"আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন: শেষ প্রহর ততক্ষণ আসবে না যতক্ষণ না তোমরা লোমশ পাদুকা পরিহিত জাতির সাথে যুদ্ধ করবে এবং যতক্ষণ না তোমরা তুর্কীদের সাথে যুদ্ধ করবে, যাদের থাকবে ক্ষুদ্রচক্ষু, লাল মুখমণ্ডল এবং চ্যাপ্টা নাক; এবং যাদের মুখমণ্ডল হবে সমতল ঢালের ন্যায়। আর তোমরা দেখবে যে সবচেয়ে ভাল মানুষ হবে তারা, যারা শাসক হিসাবে নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত শাসনকার্যকে সবচেয়ে বেশী অপছন্দ করবে। মানুষ ভিন্ন স্বভাবের! ইসলামপূর্ব সময়ের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জনেরাই ইসলামেও সর্বোৎকৃষ্ট। একটা সময় আসবে যখন তোমাদের যে কেউ তার পরিবার এবং সম্পত্তি দ্বিগুণ হওয়ার চেয়েও, আমাকে দেখতে বেশী পছন্দ করবে।" — (সহীহ বুখারী)

সিরিয়ার উপর তুর্কী আক্রমণের ভিতর দিয়ে ঐ যুদ্ধের সূচনা হতে পারে, যেটাকে ইসরাঈল ঐ অঞ্চলে যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে দিতে ব্যবহার করবে। কিন্তু ঐ যুদ্ধ

শেষে ইসরাঈল পৃথিবীর নিয়ন্তা রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে। ঐ ঘটনার সময় 'তার একটা দিন যখন আমাদের এক দিনের মত হবে' তখন দাজ্জালও আত্মপ্রকাশ করবে অর্থাৎ সে তখন আমাদের সময়ের মাত্রায় প্রবেশ করবে তথা আমাদের পৃথিবীতে দৃশ্যমান হবে। এটা নিশ্চিত যে সে ইসরাঈল রাষ্ট্রের শাসক হিসাবে জেরুজালেমে আত্মপ্রকাশ করবে। যখন ভণ্ড 'মসীহ্' দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে, ঐ সময়েই আসল 'মসীহ্', মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ) প্রত্যাবর্তন করবেন। তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন আর তারপরে মুসলিম বাহিনী ইসরাঈল রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে দেবে।

পবিত্র কুর'আন 'পবিত্রভূমিতে' ইহুদীদের প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছে এবং তার নিহিতার্থও ব্যাখ্যা করেছে। এছাড়া বহু কুর'আনিক ঘোষণা এবং রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বহু ভবিষ্যদ্বাণী ও ঘোষণা রয়েছে যেগুলো জেরুজালেমের শেষ অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। কুর'আনের ঐ সকল ঘোষণাগুলি কি? আর রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ঐ সব ভবিষ্যদ্বাণী আর ঘোষণাগুলিই বা কি? পাঠকের উচিত নিম্নলিখিত দশটি ঘোষণার উপর গভীর মনোযোগ দেয়া। কেননা জেরুজালেমের শেষ অধ্যায়ের উপর কুর'আন যা বলে তার সারবস্তু সেগুলোর মাঝে নিহিত রয়েছে।

পবিত্র কুর'আন এবং হাদীস উভয়েই নিশ্চিত করে যে ঈসা (আঃ) একদিন পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর তাঁকে 'মসীহ্' হিসাবে বিশ্বাস করা ছাড়া ইহুদীদের আর কোন বিকল্প থাকবে না। তখন তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, কিন্তু তাদের মৃত্যু হবে সম্ভাব্য নিকৃষ্টতম মৃত্যু অর্থাৎ এ ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞান নিয়ে তারা মৃত্যুবরণ করবে যে তারা প্রতারিত হয়েছিল এবং যা কিছুকে 'সত্য' মনে করে জেদ এবং ঔদ্ধত্য সহকারে আঁকড়ে ধরেছিল, তার সবই 'মিথ্যা' ছিল, অপর দিকে ঈসা (আঃ) এবং মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বাণীসমূহকে যে তারা 'মিথ্যা' বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল, বাস্তবে সেগুলোই 'সত্য' ছিল। সুতরাং তারা যে দোজখে প্রবেশ করবে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞান নিয়ে তারা মৃত্যুবরণ করবে।

ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশবিদ্ধ করেছে বলে গর্ববোধ করার পর, আল্লাহ্ তাদেরকে 'পবিত্রভূমি' থেকে বহিষ্কার করেন। তবে এবারের বহিষ্কার, তাদের পূর্ববর্তী বহিষ্কারের চেয়ে ভিন্ন ছিল। পূর্ববর্তী ঘটনায় তাদেরকে ক্রীতদাস হিসাবে ব্যবিলনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু এবার তাদেরকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে, মানবকুলের মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। জেরুজালেম এবং ইহুদীদের নিয়তি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এরপর পবিত্র কুর'আন নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলি প্রকাশ করেছে:

১. ছিন্নমূল ইহুদী জনগোষ্ঠী টুকরো টুকরো হয়ে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল;

২. 'পবিত্রভূমির' উপর অধিকার দাবী করা থেকে বিরত রাখার জন্য সেখানে ইহুদীদের প্রত্যাবর্তন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল;
৩. পরম করুণাময় আল্লাহ্ কর্তৃক ইহুদীদের ক্ষমা করার একটা সম্ভাবনা ছিল, যদি তারা ঐ নবীতে বিশ্বাস স্থাপন করত, যিনি ছিলেন 'উম্মী' (নিরক্ষর এবং অ-ইহুদী);
৪. 'শেষ সময়ে' (শেষ যুগের শেষ পর্যায়ে) 'পবিত্রভূমিতে' আল্লাহ্ নির্ধারিত ইহুদীদের প্রত্যাবর্তন;
৫. 'পবিত্রভূমিতে' ইহুদীদের প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে ইয়াজুজ-মাজুজের ভূমিকা;
৬. আল্লাহ্র তরফ থেকে শাস্তির পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে এই ব্যাপারে ইহুদীদের প্রতি সাবধানবাণী;
৭. ইহুদীদের জন্য এযাবতকালের কঠোরতম শাস্তির সাবধানবাণী;
৮. চূড়ান্ত শাস্তির সময় যখন সমাগত, তখন [ইহুদীদের] আধ্যাত্মিক অন্ধত্ব;
৯. (তৌরাতে বর্ণিত গণপ্রস্থানের সময়কার) ফেরাউনের মরদেহ পুনরুদ্ধার করা হবে যার মধ্যে সেই ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে যে ইহুদীদের এখন ঐ একই পরিণতি হবে যা ফেরাউনের হয়েছিল;
১০. যখন ঈসা (আঃ) প্রত্যাবর্তন করবেন তখন তাঁকে 'মসীহ্' বলে বিশ্বাস না করে ইহুদীদের আর কোন উপায় থাকবে না, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে যাবে, অর্থাৎ ভয়ঙ্কর শাস্তি ও দোযখের আগুন থেকে বাঁচার আর কোন পথ থাকবে না।

১. ছিন্নমূল ইহুদী জনগোষ্ঠী টুকরো টুকরো হয়ে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল

'মসীহ্'কে প্রত্যাখ্যান করার পর এবং তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করার পর আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইহুদীদের 'পবিত্রভূমি' থেকে বহিষ্কার করলেন, তখন তিনি একটি ঘোষণা দিয়েছিলেন যা এই বিষয়টিকে পরিস্কার করে দিয়েছিল যে, এই নতুন বিতাড়িত সম্প্রদায়, (ব্যবিলনে বসবাসরত) পুরাতন বিতাড়িত সম্প্রদায় থেকে ভিন্নতর হবে। পূর্ববর্তী ক্ষেত্রে ইহুদীরা তবুও এক সুষম সম্প্রদায় হিসেবে একটি ভৌগোলিক অবস্থানে (ব্যবিলনে) একত্রে বসবাস করছিল। কিন্তু তাদের দ্বিতীয় বহিষ্কারের ঘটনায় আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করলেন যে, এবার তারা এক ভিন্ন ধরনের ছিন্নমূল জনগোষ্ঠী হবে:

وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ۖ

"আর আমি তাদেরকে বিভক্ত করে দিয়েছি দেশময় বিভিন্ন শ্রেণীতে..."।
(কুর'আন, সুরা আ'রাফ ৭:১৬৮)

পবিত্র কুর'আনের এই ঘোষণা অভাবনীয়ভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল যখন ২০০০ বৎসরেরও বেশী সময় ধরে ইহুদীরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকল। এই দীর্ঘ সময়ব্যাপী তারা ইয়েমেন, মরক্কো, ইরাক, ইরান, মিশর, জর্ডান, লিবিয়া, ইথিওপিয়া, আরবভূমি, সিরিয়া, তুরস্ক ইত্যাদি স্থানে বসবাস করেছে।

ইহুদীদের ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর ২০০০ বৎসর ধরে আজবভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকাটা আল্লাহ্‌র ক্রোধ ও শাস্তির নিদর্শন, এবং বহু ইহুদী ব্যাপারটাকে সেভাবেই সনাক্ত করেছিল।

২. 'পবিত্রভূমির' উপর অধিকার দাবী করা থেকে বিরত রাখার জন্য সেখানে ইহুদীদের প্রত্যাবর্তন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল

'পবিত্রভূমি' থেকে ইহুদীদেরকে বহিষ্কার করার পর, ঐ ভূমিতে তাদের প্রত্যাবর্তন নিষিদ্ধ করে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর এক নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। (তারা পর্যটক হিসাবে সেখানে যেতে পারত, কিন্তু নিজেদের দাবী পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে নয়)। ঐ নিষেধাজ্ঞা এক ঐতিহাসিক বাস্তবতায় পরিণত হয়েছিল এবং ২০০০ বৎসর সময়কাল ধরে প্রকাশ্যেই বলবৎ ছিল। পবিত্র কুর'আনের সুরা আম্বিয়ার নিম্নোক্ত ঘোষণার এক নাটকীয় সত্যায়ন এর মাঝে নিহিত রয়েছে:

وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٩٥﴾

"এবং যে শহরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, ঐ 'শহরের' অধিবাসীদের (তাদের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে) সেখানে ফিরে না আসা অবধারিত।"

(কুর'আন, সুরা আম্বিয়া ২১:৯৫)

(নিচে দেখুন: "'পবিত্রভূমিতে' ইহুদীদের প্রত্যাবর্তনের সাথে ইয়াজুজ-মাজুজের সম্পর্ক" এবং 'কুর'আন ও হাদীসে ইয়াজুজ-মাজুজ' শিরোনামে দশম অধ্যায়, যেখানে আমরা দেখিয়েছি যে ঐ 'শহর' হচ্ছে জেরুজালেম)।

ইহুদীদের উপর জেরুজালেমে (এবং 'পবিত্রভূমিতে') দাবী প্রতিষ্ঠা করতে ফিরে আসার ব্যাপারে যে ঐশ্বরিক নিষেধাজ্ঞা ছিল, তার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তা যেন ইহুদীদের উপর ঐশ্বরিক ক্রোধ ও শাস্তির এক নিদর্শন হিসাবে কাজ করে। এ ছাড়া কোন রাখ-ঢাক ছাড়াই, তাদের আর একটা ব্যাপার এর মধ্যে দিয়ে বুঝানো হয়েছিল যে, তারা আর তথাকথিত 'নির্বাচিত জনগোষ্ঠী' নয়।

৩. পরম করুণাময় আল্লাহ্ কর্তৃক ইহুদীদের ক্ষমা করার একটা সম্ভাবনা ছিল যদি তারা ঐ নবীতে বিশ্বাস স্থাপন করত, যিনি ছিলেন উম্মী (নিরক্ষর এবং অ-ইহুদী)

(অন্যান্য পাপাচারের মধ্যে) মসীহ্কে হত্যা করার প্রচেষ্টার পরিণতিতে আল্লাহ্ তা'আলা ইহুদীদেরকে 'পবিত্রভূমি' থেকে বহিষ্কার করার পরও এবং (দাবী পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য) জেরুজালেমে তাদের প্রত্যাবর্তনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পরও, পবিত্র কুর'আনের ঘোষণা মতে, ক্ষমাশীল আল্লাহ্র ক্ষমা অর্জন করার একটা সম্ভাবনা তাদের জন্য তখনো উন্মুক্ত ছিল:

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ ۚ

"হয়ত তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন. . ."
(কুর'আন, সুরা বনী ইসরাঈল ১৭:৮)

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের একটা সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন, যা শেষ হওয়ার পূর্বে তিনি তাদের ক্ষমা করতে পারতেন, যদি তারা তাদের খাসলত পরিবর্তন করত, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত, এবং ইব্রাহীম (আঃ) এর ধর্মে প্রত্যাবর্তন করত। কিন্তু ঐ ক্ষমা লাভ করার জন্য মাত্র একটি দ্বারই উন্মুক্ত ছিল। এবিষয়ে পবিত্র কুর'আন যে 'বনী ইসরাঈল'-কে সম্বোধন করেছে তারা ইতোমধ্যেই তৌরাত ও ইঞ্জীল লাভ করেছিল এবং ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশবিদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল। তারপরও কুর'আন তাদের ক্ষমালাভের একমাত্র উপায় নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে জানিয়ে দিয়েছিল:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ
يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ
فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

"যারা রাসূলকে অনুসরণ করে, যিনি উম্মী নবী, যাঁর কথা তাদের নিজেদের কিতাবসমূহ অর্থাৎ তৌরাত এবং ইঞ্জীল-এ বর্ণিত আছে,

"যিনি তাদের সৎকাজে আদেশ ও মন্দকাজে নিষেধ করেন; যিনি তাদের জন্য যা ভাল (এবং খাঁটি) তা হালাল করেন এবং যা মন্দ (এবং ভেজাল) তা হারাম করেন; যিনি তাদের ভারী বোঝা

"এবং তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া জোয়াল থেকে তাদের মুক্তি দেন।
"আর তাই, যারা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তাঁকে সম্মান করে, তাঁকে সাহায্য করে, এবং তাঁর কাছে যে 'আলো' (অর্থাৎ পবিত্র কুর'আন) প্রেরণ করা হয়েছে তা অনুসরণ করে,
"তারাই মুক্তিলাভ করবে।"

(কুর'আন, সুরা আ'রাফ ৭:১৫৭)

সুতরাং শেষ নবী (সাঃ)-কে গ্রহণ, বিশ্বাস এবং অনুসরণ করার মাধ্যমেই তারা ক্ষমা লাভ করতে পারত।

এমন অনেক নিদর্শন রয়েছে যা থেকে জানা যাবে যে, ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য বনী ইসরাঈলকে দেয়া সময়সীমা এখন অতিক্রান্ত হয়েছে। ঐ সমস্ত নির্দশনের ভিতর রয়েছে পৃথিবীতে দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ-মাজুজের মুক্তি। **দুটো ব্যাপারই রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর জীবদ্দশায় ঘটেছে।** রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনায় ইহুদীদের মাঝে ১৭ মাস বসবাস করার পর, যখন বুঝা গেল যে, ইহুদীরা তাঁকে এবং পবিত্র কুর'আনকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ইসলামকে ধ্বংস করতে তারা ষড়যন্ত্রে রত, তখনই ঐ দুটো ঘটনা ঘটেছে। আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সময়ই কা'বাকে কিবলা হিসাবে নির্ধারণ করে ওহী নাযিল করেন। জেরুজালেম থেকে মক্কার দিকে কিবলা পরিবর্তনের ভিতরে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঐশ্বরিক ক্ষমা ও করুণা লাভ করার জন্য ইহুদীদের কাছে যে একটি মাত্র সুযোগের দ্বার খোলা ছিল, তা তখন বন্ধ হয়ে গেছে। সেই থেকে শেষ যুগের সূচনা হয়ে গেল এবং ইহুদীদের কাছে অনিবার্য শাস্তিকে এড়িয়ে যাওয়ার আর কোন উপায় রইল না। আল্লাহ্র তরফ থেকে ব্যাপারটা নির্ধারিত হয়ে গেল।

যদিও শেষ যুগের সূচনা হয়ে গেছে এবং ঐশ্বরিক করুণার দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে, তবুও চূড়ান্ত শাস্তি কার্যকর হওয়ার আগে একটা বিশেষ সময়ের জন্য ইহুদীদেরকে অপেক্ষা করতে হবে। অবশ্যই ঐ শাস্তি অত্যন্ত ধীরগতিতে সংঘটিত হবে। চূড়ান্ত শাস্তির ঘন্টা বাজার আগের বেশীর ভাগ সময় জুড়েই, ইহুদীরা মুসলিমদের মাঝে নিরাপদ আশ্রয় পেতে থাকবে:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّـهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ
وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّـهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّـهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ
ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

"আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি কিংবা মানুষের প্রতিশ্রুতি ব্যতীত ওরা যেখানেই অবস্থান করেছে সেখানেই তাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

"আর ওরা উপার্জন করেছে আল্লাহ্‌র গযব। ওদের উপর চাপান হয়েছে গলগ্রহতা।

"তা এজন্যে যে, ওরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অনবরত অস্বীকার করেছে এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে।

"তার কারণ ওরা নাফরমানী করেছে এবং সীমা লঙ্ঘন করেছে।"

(কুর'আন, সুরা আলে 'ইমরান ৩:১১২)

তারপর যখন শাস্তির জন্য ঘন্টা বেজে উঠার সময় হয়ে গেল, সেটাকেও বুঝাবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ নিদর্শনার ব্যবস্থা রাখলেন। ঐ সমস্ত নিদর্শনার ভিতর সবচেয়ে স্পষ্ট ছিল মূসা (আঃ) এবং ইসরাঈলীদের পেছনে ধাওয়া করতে গিয়ে পানিতে ডুবে মরা ফেরাউনের শবদেহের পুনরুদ্ধার। এটা ইহুদীদের জন্য সত্যিই দুঃখজনক যে, ঐ ফেরাউনের (দ্বিতীয় র‍্যামেসিস) শবদেহ ইতোমধ্যেই উদ্ধার করা হয়েছে। আর যেহেতু তাদের জন্য অনুশোচনা করার (তওবা করার), পবিত্র কুর'আনে ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতা কর্তৃক প্রকাশিত 'সত্য' গ্রহণ করার, এবং আল্লাহ্ তা'আলার শেষ নবী (সাঃ)-এর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য সময় পার হয়ে গেছে, সেহেতু সবচেয়ে কঠোর ঐশ্বরিক শাস্তি থেকে বেঁচে যাবার সুযোগ তাদের আর নেই:

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ۗ
يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا
لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ۗ
قُلِ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴿١٥٨﴾

"তারা কি এমনটা দেখার অপেক্ষায় আছে যে ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে, অথবা আপনার পালনকর্তা (নিজেই) আগমন করবেন, অথবা আপনার পালনকর্তার কোন সুনির্দিষ্ট 'নিদর্শন' আসবে?

"যেদিন আপনার পালনকর্তার কোন সুনির্দিষ্ট নিদর্শন আসবে (অর্থাৎ দাজ্জাল, ইয়াজুজ-মাজুজ, ফেরাউনের শবদেহ পুনরুদ্ধার ইত্যাদি) তখন সেসবে বিশ্বাস স্থাপন কোন ব্যক্তির জন্য ফলপ্রসূ হবে না,

"যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা স্বীয় ঈমান অনুযায়ী কোনরূপ সৎকর্ম করেনি।

"আপনি বলে দিন: তোমরা পথের দিকে চেয়ে থাক, আমরাও পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম।"

(কুর'আন, সুরা আন'আম ৬:১৫৮)

৪. শেষ সময়ে (শেষ যুগের শেষ পর্যায়ে) 'পবিত্রভূমি'তে আল্লাহ্ নির্ধারিত ইহুদীদের প্রত্যাবর্তন

পবিত্র কুর'আন আরো ঘোষণা করেছে যে 'শেষ সময়ে' আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই ইহুদীদের 'পবিত্রভূমিতে' ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। 'পবিত্রভূমিতে' তাদের দাবী পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে ফিরে আসতে পারার সাফল্য, ইহুদীরা যেটাকে সত্য বলে মনে করে সেই দাবীকে সত্যায়িত করেছে, এই ভেবে তারা ধোঁকা খাবে। 'পবিত্রভূমিতে' শেষ বারের মত প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ইতোমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে, বরং আরো দর্শনীয়ভাবেই, ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী পরিচিতির ভণ্ড ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সেটা বাস্তবায়িত হয়েছে:

وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿١٠٤﴾

"তারপর আমি বনী ইসরাঈলকে বললাম: নিরাপদ ভাবে এই (পবিত্র) ভূমিতে বসবাস কর (এই শর্তে যে তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে এবং নিজেদের আচরণে সদাচারী থাকবে);

"কিন্তু (জেনে রাখ) যখন শেষ সতর্কবাণীর সময় আসবে (অর্থাৎ যখন শেষ যুগ এসে পৌঁছাবে), আমি তোমাদেরকে মিশ্র জনগোষ্ঠী হিসাবে একত্রিত করব (অর্থাৎ ইহুদী সম্প্রদায় বহু বৎসর ছড়িয়ে ছিটিয়ে নির্বাসনে থাকার ফলে যে বিভিন্নতা লাভ করেছে তার সবটুকু একত্রিত করে তাদেরকে পবিত্রভূমিতে ফিরিয়ে আনা হবে)।"

(কুর'আন, সুরা বনী ইসরাঈল ১৭:১০৪)

পবিত্র কুর'আনের এই ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে যে, শেষ যুগে 'পবিত্রভূমিতে' ইহুদীদের প্রত্যাবর্তন ঘটবে, এবং ২০০০ বৎসর ধরে বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করার ফলে ইহুদীদের মাঝে যে ভিন্নমুখীতা ও অসমতা এসে জড়ো হয়েছে তা প্রদর্শিত হবে। এখানে 'লাফিফ' শব্দ দ্বারা এমন জনসমষ্টিকে বুঝানো হয়েছে, যারা সবাই এক রকমের নয়। আজকের ইসরাঈলে যে ইহুদী সমাজ রয়েছে এটা তার যথাযথ বর্ণনা। সেটা হচ্ছে ইহুদীদের এক বিচিত্র জনসমষ্টি যা আরব ও মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অংশ সহ পৃথিবীর অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত, যারা বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন উপভাষার বিভিন্ন টানে কথা বলে, ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছদ পরে, নানা ধরনের খাবার খায়, নিজ নিজ পদ্ধতিতে ভিন্ন ভিন্ন সিনাগগে উপাসনা করে। কিন্তু সবচেয়ে অবাক হবার মত পার্থক্য হচ্ছে বর্ণভিত্তিক। আর সেখানেই কুর'আনিক ভবিষ্যদ্বাণীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটেছে। আধুনিক ইসরাঈলের ইহুদীদের একটা বড় অংশ হচ্ছে নীল চক্ষু ও সোনালী চুল বিশিষ্ট নির্ভেজাল ইউরোপীয় জনগোষ্ঠী। বর্তমানে বংশানুগতি সম্বন্ধীয় এমন

কিছু প্রমাণ বিকশিত হচ্ছে যা প্রতীয়মান করে যে ঐ ইউরোপীয় ইহুদীরা (অর্থাৎ *আশ্‌কেনাযিম* ইহুদীরা) পৃথিবী পৃষ্ঠে বসবাসরত অন্য যে কোন জনগোষ্ঠীর চেয়ে জীন-সম্বন্ধীয় বৈশিষ্ট্যে সম্পূর্ণ আলাদা। একটা জনগোষ্ঠী, যার সবাই ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধরদের মধ্য থেকে ইসহাক (আঃ) এবং ইয়াকুব (আঃ)-এর সূত্র ধরে আগত, তাদের মাঝে যে বর্ণভিত্তিক সুষমতা থাকার কথা, তা এখন অবলুপ্ত।

তাহলে, শেষ যুগে 'পবিত্রভূমিতে' ইহুদীদের প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত কুর'আনিক ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হবার অর্থ এবং নিহিতার্থ কি?

৫. 'পবিত্রভূমিতে' ইহুদীদের প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে ইয়াজুজ-মাজুজের ভূমিকা

পবিত্র কুর'আনে অন্ততপক্ষে তিনটি আয়াতে ইহুদীদেরকে 'পবিত্রভূমিতে' ফিরিয়ে আনার পরে তাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তির ব্যাপারে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। যারা কেবল বাহ্যিক চক্ষু দিয়ে পবিত্র কুর'আনকে বুঝতে চান তাদের সমস্যা এই যে, যতক্ষণ তাদের 'আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি' (অর্থাৎ অন্তর্চক্ষু) 'বাহ্যিক দৃষ্টির' পরিপূরক না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত শেষ যুগের বাস্তবতা তাদের বোধগম্য হবে না। কথিত তিনটি আয়াতের দুটি হচ্ছে এরকম:

وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٩٥﴾

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴿٩٦﴾

"কিন্তু একটা শহর যা আমরা ধ্বংস করেছিলাম, তার উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যে তারা (অর্থাৎ ঐ শহরের মানুষজন) ফিরে আসবে না,

"যতক্ষণ না ইয়াজুজ-মাজুজ মুক্তি লাভ করবে এবং প্রতিটি উঁচু স্থান থেকে তারা দ্রুত নেমে আসবে অর্থাৎ সবদিকে ছড়িয়ে পড়বে।"

(কুর'আন, সুরা আম্বিয়া ২১:৯৫-৯৬)

যদিও ঐ 'শহরের' পরিচিতি এখানে খোলাখুলিভাবে বলা হয়নি, তবুও এটা যথেষ্টই স্পষ্ট যে সেটা জেরুজালেম ছাড়া আর কোন শহর হতে পারে না। ঐ শহরের এক প্রচ্ছন্ন কুর'আনিক পরিচিতি এভাবে পাওয়া যায়: মোহাম্মদ (সাঃ) সত্যিই একজন নবী কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখার উপায় হিসাবে কুরাইশদের অনুরোধে মদীনার র‍্যাবাইগণ সাড়া দেয়। তিনটি প্রশ্ন উপস্থাপন করে তারা কুরাইশকে একাজে সাহায্য করে। তিনি যদি ঐ তিনটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেন তবে তাঁকে সত্যিকার নবী হিসাবে গণ্য করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আনের আয়াতের মাধ্যমে ঐ তিনটি প্রশ্নের সবকটির উত্তর ব্যক্ত করেন। প্রথম দুটি প্রশ্ন, যথা ঐ যুবকেরা যারা একটি গুহায় আশ্রয়

নিয়েছিল, এবং ঐ মহান পর্যটক যিনি পৃথিবীর দুই প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন, এই দু'টি ব্যাপারে জ্ঞাতব্য সুরা কাহাফে স্থান পেয়েছে (দেখুন সুরা কাহাফ, ১৮:৯-২৬, ৮৩-৯৮)। কিন্তু রূহ্ সংক্রান্ত তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর স্থান পেয়েছে সুরা বনী ইসরাঈলে, ১৭:৮৫। উত্তরগুলির এই বিস্ময়কর উপস্থাপনার ভিতর দিয়ে কুর'আনের বক্তব্যকে তুলে ধরার একটা মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার ভিত্তিতে পবিত্র কুর'আনের ঐ দুটি সুরাকে একটা জোড় হিসাবে গণ্য করা হয়। উল্লেখ্য, পাকিস্তানের বিখ্যাত পণ্ডিত ড. ইসরার আহমেদ পবিত্র কুর'আনের ঐ দুটি সুরার সমন্বয়ে জোড় গঠনের ধারণাকে নিশ্চিত করে প্রচুর প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

আর তাই গুহার ভিতরের যুবকদের মতই যুলকারনাইন, ইয়াজুজ-মাজুজ এবং ক্বারিয়াহ (অর্থাৎ ঐ শহর)-এর পরিচয় নির্ধারণ করতে আমাদেরকে সুরা বনী ইসরাঈলের সাহায্য নিতে হবে। আমরা যখন তা করি, তখন দেখতে পাই যে ঐ সুরা কেবল একটি ক্বারিয়াহ্ বা শহরের দিকে ইশারা করে, আর সেটা হচ্ছে জেরুজালেম। (দেখুন সুরা বনী ইসরাঈল, ১৭:১৬ এবং ৫৮)।

অপর পক্ষে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাদীসসমূহ সরাসরি ঐ শহরের পরিচিতি নির্ধারণ করেছে। ইয়াজুজ-মাজুজ সংক্রান্ত হাদীসসমূহে কেবলমাত্র জেরুজালেমকে নাম ধরে উল্লেখ করা হয়েছে, অন্য কোন শহরের কথা উল্লেখই করা হয়নি যা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। নিম্নলিখিত হাদীসখানি ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তনের ঘটনাকে বর্ণনা করে এবং পরিস্কারভাবে 'পবিত্রভূমি' তথা জেরুজালেমের সাথে ইয়াজুজ-মাজুজের সম্পর্ক নির্ধারণ করে, আর তাই ঐ ক্বারিয়াহ বা শহর হিসাবে কেবলমাত্র জেরুজালেমকেই সনাক্ত করা যায়:

"আন্-নাউওয়াস ইব্নে সাম'আন (রাঃ) হতে বর্ণিত: এমত অবস্থায় আল্লাহ্ ঈসা (আঃ)-এর কাছে নিম্নবর্ণিত ওহী পাঠাবেন: আমি আমার বান্দাদের ভিতর থেকে এমন একদল তৈরী করেছি, যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কেউ টিকে থাকতে পারবে না। তুমি এদের নিয়ে নিরাপদে তূর-এ চলে যাও। এবং তখন আল্লাহ্ ইয়াজুজ-মাজুজকে প্রেরণ করবেন যারা প্রতিটি গিরিপথ বেয়ে নেমে আসবে। তাদের প্রথমজন টাইবিরিয়াস (গ্যালিলি) হ্রদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তা থেকে পানি পান করবে। আর শেষ জন যখন সেই হ্রদের পাশ দিয়ে যাবে তখন সে বলবে: এখানে একদা পানি ছিল। ঈসা (আঃ) এবং তাঁর সাথীগণ তারপর এখানে (তূর-এ) অবরুদ্ধ হয়ে পড়বেন এবং তাঁদের অবস্থা এমন শোচনীয় হবে যে, তাঁদের কাছে একটি ষাঁড়ের মাথা একশত দীনারের চেয়ে বেশী প্রিয় হবে। . . ."

(সহীহ মুসলিম)

গ্যালিলি হ্রদ 'পবিত্রভূমিতে' অবস্থিত। দ্বিতীয়ত, হাদীসে বর্ণিত তূর (পাহাড়) হচ্ছে জেরুজালেমের একটি পাহাড়। এ ব্যাপারে ঐ একই হাদীসের আরেকটি সংস্করণ যা কিনা বর্ণনাকারীদের একই সূত্র থেকে সংগৃহীত, তাতে উল্লেখ রয়েছে:

"ইয়াজুজ-মাজুজ যতক্ষণ না আল-খাম্‌র পাহাড়ে পৌঁছাবে ততক্ষণ হাঁটতে থাকবে, আর এটা হচ্ছে বায়তুল মাক্‌দিস অর্থাৎ জেরুজালেমের একটি পাহাড়, এবং তারা বলবে: পৃথিবীতে যারা ছিল আমরা তাদেরকে হত্যা করেছি, এখন আকাশে যারা রয়েছে তাদেরকে হত্যা করা যাক। তারা তখন আকাশের দিকে তাদের তীর ছুঁড়ে মারবে আর সেসব তীর রক্তমাখা অবস্থায় তাদের দিকে ফিরে আসবে।"

(সহীহ মুসলিম)

'শেষ সময়ে' জেরুজালেমে ইহুদীদের প্রত্যাবর্তনকে পবিত্র কুর'আনে বর্ণিত একটি নিদর্শন হিসাবে অনুধাবন করার মত অবস্থায় আমরা এসে পৌঁছেছি। সেটা যে কেবল ইয়াজুজ-মাজুজের মুক্ত হয়ে যাওয়া নিশ্চিত করে তাই নয়, বরং তা থেকে আমরা এও জানতে পারি যে, তারা এক অজেয় ক্ষমতাবলে এখন গোটা পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করছে। (ইয়াজুজ-মাজুজ সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জানার জন্য দশম অধ্যায় দেখুন)। ইয়াজুজ-মাজুজ হচ্ছে বিশ্বজনীন ফাসাদের উৎস। (দেখুন কুর'আন, সুরা কাহাফ ১৮:৯৪)। ফাসাদের অর্থ হচ্ছে, "দুর্নীতি, ক্ষয়, শঠতা, পাপ, অনৈতিকতা, বিকৃতি ইত্যাদি।" যখন ইয়াজুজ-মাজুজ কোন জনগোষ্ঠীকে আপন করে নেয়, তখন তারা তাদেরকে দোযখের আগুনের দিকে নিয়ে যায়। ঐ হাদীস এই তথ্য প্রকাশ করে যে, ইয়াজুজ-মাজুজের যুগের বিশ্বায়ন প্রতি ১০০০ জনের ভিতর ৯৯৯ জনকে দোযখে নিয়ে যাবে:

"আবু সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন: পুনরুত্থানের দিন আল্লাহ্ বলবেন: হে আদম! আদম বলবেন: হে আমাদের প্রতিপালক, লাব্বায়েক এবং সা'দাইক। তখন উচ্চস্বরে ধ্বনিত হবে: আল্লাহ্ তোমাকে আদেশ করেছেন যে, তোমার বংশধরদের মাঝ থেকে একটা দলকে দোযখের পথে পাঠাও। আদম বলবেন: হে প্রভু! দোযখের জন্য কতজন নির্ধারিত? আল্লাহ্ বলবেন, প্রতি এক হাজারের ভিতর থেকে ৯৯৯ জনকে বেছে নাও। ঐ সময় প্রতিটি অন্তঃসত্তা নারীর গর্ভ ঝরে পড়বে (গর্ভপাত হবে) এবং শিশুদের চুল পেকে যাবে। "আর তুমি মানবকুলকে অনেকটা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দেখতে পাবে, যদিও তারা নেশা করেনি, কিন্তু আল্লাহ্‌র আযাব হবে ভয়ঙ্কর"। (কুর'আন, সুরা হাজ্জ ২২:২)। (যখন রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) একথা উল্লেখ করলেন), সবাই এত ভেঙ্গে পড়ল (এবং ভয় পেল) যে তাদের মুখের রঙ বদলে গেল যা দেখে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, ইয়াজুজ-মাজুজের দল থেকে ৯৯৯ জন নেয়া হবে এবং তোমাদের মাঝ থেকে একজন। (অন্যান্য শ্রেণীর বিশাল জনসংখ্যার তুলনায়) তোমরা মুসলিমরা হবে একটা সাদা ষাঁড়ের পার্শ্বদেশের কালো কেশের মত অথবা একটি কালো ষাঁড়ের পার্শ্বদেশের সাদা কেশের মত। আর আমি আশা করি যে তোমরা যেন বেহেশতের জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ হবে। একথা শুনে আমরা বললাম: আল্লাহু

আকবর! তখন তিনি বললেন: আমি আশা করি যে তোমরা যেন বেহেশতের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ হবে। আমরা আবার বললাম, আল্লাহু আকবর! তখন তিনি বললেন: আমি আশা করি তোমরা বেহেশতের জনসংখ্যার অর্ধেক হবে। অতএব আমরা বললাম: আল্লাহু আকবর।"

(সহীহ বুখারী)

জেরুজালেমে ইহুদীদের প্রত্যাবর্তন এবং ইসরাঈল রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল ইয়াজুজ-মাজুজ ও 'ভণ্ড-মসীহ্' দাজ্জালের সাহায্যে। ইহুদীদের জন্য ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন বিপদ এরই ভিতরে নিহিত রয়েছে। সত্যি বলতে কি তাদের নিয়তি নির্ধারিত হয়ে গেছে। অথচ এ ব্যাপারে তাদের কোন চেতনা হচ্ছে না। ইহুদী জনগণ এখন যে বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে সেটা তারা অনুধাবন করতে পারত যদি পবিত্র কুর'আনকে ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতার কাছ থেকে নেমে আসা ঐশ্বরিক বাণী হিসেবে গ্রহণ করত, এবং শেষ নবী (সাঃ)-এর শিক্ষাকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করত। বাস্তবতাকে অনুধাবন করতে চাইলে এই গ্রন্থে উল্লেখিত কুর'আন ও হাদীসের তথ্যাবলী তাদের সহায়তা করতে পারে।

৬. আল্লাহ্‌র তরফ থেকে শাস্তির পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে এই ব্যাপারে ইহুদীদের প্রতি সাবধানবাণী

পবিত্র কুর'আন ইহুদীদের সাবধান করে দিয়েছিল যে, তারা যদি তাদের দুষ্ট কর্মকাণ্ডে ফিরে যায়, তবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁর শাস্তি নিয়ে ফিরে আসবেন। তিনি প্রথমে তাদেরকে এক ব্যবিলনীয় বাহিনীর মাধ্যমে শায়েস্তা করেন। তারপর এক রোমান বাহিনীর মাধ্যমে পুনরায় তাদেরকে শায়েস্তা করেন। শেষ শাস্তি, যখন তা সংঘটিত হবে, তখন তা এক মুসলিম বাহিনীর মাধ্যমে আসবে:

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴿٨﴾

"হয়ত তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। কিন্তু যদি পুনরায় তদ্রূপ কর (অর্থাৎ তোমাদের পাপকর্মে ফিরে যাও), আমিও পুনরায় তাই করব (অর্থাৎ আমার শাস্তি প্রদানে ফিরে যাব)। আমি জাহান্নামকে কাফেরদের জন্যে কয়েদখানা করেছি।"

(কুর'আন, সুরা বনী ইসরাঈল ১৭:৮)

৭. ইহুদীদের জন্য এযাবতকালের কঠোরতম শাস্তির সাবধানবাণী

পবিত্র কুর'আন ইহুদীদেরকে যথাসম্ভব স্পষ্ট এবং সাধারণ ভাষায় এই মর্মে সতর্কবাণী প্রদান করে যে, একদিন (ক্ষমা চাওয়ার জন্য যখন তাদের সময় শেষ হয়ে যাবে) তারা ঐ বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াবে যা এখন তাদের সামনে এসে হাজির হয়েছে, অর্থাৎ, ইয়াজুজ-মাজুজ এবং 'ভণ্ড-মসীহ্' দাজ্জাল পৃথিবীতে মুক্তি লাভ করবে। ইহুদীরা পবিত্র কুর'আনকে ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতার কাছ থেকে নাযিল হওয়া বাণী এবং মোহাম্মদ (সাঃ)-কে ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতার শেষ নবী হিসাবে অস্বীকার করেছে। যার ফলশ্রুতিতে তারা বাস্তবতাকে সনাক্ত করতে অক্ষম:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۗ
إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٧﴾

"আর সে সময়ের কথা স্মরণ কর যখন তোমার পালনকর্তা সংবাদ দিয়েছেন যে, অবশ্যই তিনি কেয়ামতের দিন পর্যন্ত তাদের (অর্থাৎ ইহুদীদের) উপর এমন লোক পাঠাতে থাকবেন যারা তাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিতে থাকবে।

"নিঃসন্দেহে তোমার পালনকর্তা শীঘ্র শাস্তিদানকারী এবং তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।"

(কুর'আন, সুরা আ'রাফ ৭:১৬৭)

এটা আল্লাহ্ তা'আলার বিধান যে, শাস্তি অন্যায়ের সমপর্যায়ের হবে বা অন্যায়ের নিরীখে যথোপযুক্ত হবে। ইহুদীরা যেহেতু ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশবিদ্ধ করার চেষ্টা এবং তৌরাতকে বদলে ফেলার মাধ্যমে সম্ভাব্য নিকৃষ্টতম অপরাধ করেছে, সুতরাং কঠোরতম শাস্তি লাভ করে তারা সেসবের মূল্য পরিশোধ করবে। ঐ শাস্তির সূচনা হবার কথা শেষ বিচারের দিনের আগেই। শেষ নবী (সাঃ) পৃথিবীতে আসার পর এবং তাঁকে ইহুদীরা অস্বীকার করার পরই বস্তুত ঐ শাস্তির সূচনা হয়েছে। তারপর থেকে নাটকীয় ঘটনাবলীর যে ধারা চলছে, তার পরিসমাপ্তি ঘটবে ইহুদীদেরকে কঠোরতম শাস্তি প্রদানের ভিতর দিয়ে। ঐ নাটকের বিভিন্ন প্রধান ভূমিকায় যারা থাকবে, আল্লাহ্ তাদের বহিপ্রকাশ ঘটাবেন। তারা অবশ্যই, ইয়াজুজ-মাজুজ এবং 'ভণ্ড-মসীহ্' দাজ্জাল। 'ভণ্ড-মসীহ্' দাজ্জাল সংক্রান্ত তথ্যাবলী আমরা এই গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে ইতোমধ্যেই আলোচনা করেছি।

৮. চূড়ান্ত শাস্তির সময় যখন সমাগত তখন [ইহুদীদের] আধ্যাত্মিক অন্ধত্ব

আল্লাহ্ তা'আলা নিজে নিশ্চিত করেছেন যে, ইহুদী এবং অবিশ্বাসীদের বাকী জগতের কেউই তাদের নিজেদের অবস্থার বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারবে না:

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا
وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٤٦﴾

"আমি আমার নিদর্শনসমূহ থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখি, যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে গর্ব করে।

"যদি তারা সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে ফেলে, তবুও তা বিশ্বাস করবে না। আর যদি হেদায়েতের পথ দেখে, তবে সে পথ গ্রহণ করে না,

"অথচ গোমরাহীর পথ দেখলে তাই গ্রহণ করে নেয়।

"এর কারণ তারা আমার নির্দেশসমূহকে মিথ্যা বলে মনে করেছে, এবং তা থেকে বে-খবর রয়ে গেছে।"

(কুর'আন, সুরা আ'রাফ ৭:১৪৬)

শেষ যুগের ঐ জঘন্য নাটকের মূল ভূমিকায় যে থাকবে — যে নাটক (মুমিনগণ ছাড়া) সমগ্র মানবজাতিকে আধ্যাত্মিক অন্ধত্বের দিকে নিয়ে যাবে — সে খোদ 'ভণ্ড-মসীহ্' দাজ্জাল ছাড়া আর কেউ নয়। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে দাজ্জালকে (তার মিশন সম্পন্ন করার জন্য) আল্লাহ্ তা'আলা যে সব উপকরণ দান করেছেন, তার ভিতর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তার 'একচক্ষু'। দাজ্জালের ডানচোখ অন্ধ, যা তার আধ্যাত্মিক অন্ধত্বের ইঙ্গিতবহ। যাদেরকে সে ধোঁকা দেবে তাদের সকলেই আধ্যাত্মিক দিক থেকে অন্ধ হয়ে যাবে এবং সেহেতু তারা শেষ যুগের নিদর্শনসমূহ দেখতে ও সনাক্ত করতে ব্যর্থ হবে। এই আধ্যাত্মিক অন্ধত্বের অবস্থা আসল-মসীহ্ মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তনের সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে।

৯. (তৌরাতে উল্লেখিত মহাপ্রস্থানের সময়কার) ফেরাউনের মরদেহ পুনরুদ্ধার করা হবে এবং তা ইঙ্গিত দেবে যে, ইহুদীরা এখন ঐ একই পরিণতি ভোগ করবে যা সে ভোগ করেছিল

পবিত্র কুর'আন আরও একটি নিদর্শনের কথা উল্লেখ করেছে, যার দ্বারা উন্মুক্ত দৃষ্টিসম্পন্ন পর্যবেক্ষকগণ বুঝতে পারবেন যে, শেষ যুগের বনী ইসরাঈলের জন্য প্রযোজ্য চূড়ান্ত ঘন্টা বাজাবার সময় উপস্থিত হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে তাদের যে কঠোরতম শাস্তি দেয়া হবে তার সূচনার সময় এসে গেছে। সেই ঐশ্বরিক নিদর্শনটি হচ্ছে এই যে, মূসা (আঃ)-কে ধাওয়া করতে গিয়ে সমুদ্র পেরোবার চেষ্টায় ডুবে মরা ফেরাউনের মরদেহ পুনরুদ্ধার। বনী ইসরাঈলকে বাঁচাতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা সমুদ্রকে দুভাগ করেছিলেন। আর তারা পার হয়ে যাবার পর ফেরাউন ও তার বাহিনীর উপর তিনি জলরাশিকে পুনরায় এক করে দেন এবং তারা সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এ সম্বন্ধে পবিত্র কুর'আন বলে:

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿٥٠﴾

"আর স্মরণ কর, আমি যখন তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিখণ্ডিত করেছি; অতঃপর তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছি এবং ফেরাউনের জনগণকে তোমাদের চোখের সামনে ডুবিয়ে দিয়েছি।"

(কুর'আন, সুরা বাক্বারা ২:৫০)

বনী ইসরাঈল ঐ সময় জানত না এবং আজো অনুভব করতে পারছে না যে 'একদিন' তারা নিজেরাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে (যেমন ফেরাউন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল), এবং তারা যদি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং নির্দিষ্ট কিছু পাপকার্যে লিপ্ত থাকে, তবে ফেরাউন যে ধরনের মৃত্যুর অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল তারাও একই ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ করবে।

ফেরাউন কিভাবে মৃত্যুবরণ করেছিল? সম্মানিত পাঠক অবাক হয়ে যাবেন যখন তিনি ফেরাউনের মৃত্যুর কুর'আনিক বর্ণনা পড়বেন:

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا ۖ
حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ
قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩٠﴾
آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٩١﴾

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ۚ
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴿٩٢﴾

"আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্রের ওপারে নিয়ে গেলাম: তখন ফেরাউন ও তার বাহিনী উদ্ধতভাবে ও অসদিচ্ছা নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করল।

"শেষ পর্যন্ত যখন সে নিমজ্জিত হতে লাগল

"তখন বলল: আমি (এখন) বিশ্বাস করি যে ইসরাঈলের সন্তানরা যে বিধাতাকে বিশ্বাস করে তিনি ছাড়া কোন বিধাতা নেই: আমি তাদেরই একজন যারা (আল্লাহ্ তা'আলার কাছে, ইসলামে) আত্মসমর্পণ করে ।

"(তাকে বলা হল:) এখন একথা বলছ! এই অল্পক্ষণ আগেও তুমি বিদ্রোহী (অবস্থায়) ছিলে! আর তুমি অত্যাচার নিপীড়ন (এবং সন্ত্রাস) চালিয়ে যাচ্ছিলে!

"আর তাই আজকে (আমরা ঠিক করেছি যে) তোমার দেহকে বাঁচিয়ে রাখব (অর্থাৎ আমরা তোমার মৃতদেহের সুরক্ষা করব), যেন তুমি (অর্থাৎ তোমার মৃতদেহ ইতিহাসে পুনরায় দৃশ্যমান হয়ে) তোমার পরে যারা আসবে, তাদের জন্য এক নিদর্শন হও!

"কিন্তু বাস্তবিকই, মানবকুলের অধিকাংশই আমাদের নিদর্শনের প্রতি অমনোযোগী!"

(কুর'আন, সুরা ইউনুস ১০:৯০-৯২)

فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾
فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿٥٦﴾

"অতঃপর যখন আমাকে রাগান্বিত করল, তখন আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদের সকলকে ডুবিয়ে মারলাম

এবং আমরা তাদেরকে অতীতের বস্তুতে পরিণত করলাম এবং তাদের পরে যারা আসবে তাদের জন্য দৃষ্টান্ত করে রাখলাম।"

(কুর'আন, সুরা যুখরুফ ৪৩:৫৫-৫৬)

আর এভাবেই পবিত্র কুর'আন ঐ অদ্ভূত ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, মহাপ্রস্থানের সময়কার ফেরাউনের মৃতদেহ একদিন আবিষ্কৃত হবে, আর তখন তা হবে ঐশ্বরিক নিদর্শনসমূহের মধ্যে সবচেয়ে অমঙ্গলসূচক। আশ্চর্যজনক ভাবে ফেরাউনের ঐ মৃতদেহ উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষে আবিষ্কৃত হয়েছে। এটা হচ্ছে ঐ আধ্যাত্মিক অধঃপতনের অশুভ লক্ষণ যা আজ মুসলিম বিশ্বকে গ্রাস করেছে, যখন ইসলামি পণ্ডিতগণ এই অদ্ভূত ঘটনার (অর্থাৎ মহাপ্রস্থানের ফেরাউনের মৃতদেহ পুনরুদ্ধারের) পেছনে কেবল কুর'আনের একটি ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়েছে, এটুকু ছাড়া আর কোন অর্থ নিরূপণ করতে পারেন নি। ইহুদীদের জন্য এটা আরও অশুভ একটা লক্ষণ যে, ফেরাউনের

মরদেহ যখন আবিষ্কৃত হয়েছিল, মোটামুটিভাবে একই সময়ে যায়োনিস্ট আন্দোলনও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটা পরিস্কার যে ভণ্ড-মসীহ্ দাজ্জালই যায়োনিস্ট আন্দোলনের স্থপতি ছিল, আর তাই ইয়াজুজ-মাজুজের যুগ ছিল দাজ্জালেরও যুগ।

উপরে বর্ণিত বিষয়সমূহের অর্থ এই যে, ইহুদীরা এখন ভণ্ড-মসীহ্ দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ-মাজুজের নেতৃত্বাধীন এমন একটা পথে রয়েছে যা তাদের উপর সম্ভাব্য কঠোরতম শাস্তি ডেকে আনবে এবং যার সমাপ্তি ঘটবে তাদের বিধাতা নির্ধারিত ধ্বংসের মাধ্যমে। কিন্তু সেই সমাপ্তি ঘটবে ফেরাউনের সমাপ্তির মত একই উপায়ে। সেই সমাপ্তি কি রকম হবে? ফেরাউনের মরদেহ আবিষ্কার আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে এই মর্মে বিশাল নিদর্শন যে, পৃথিবী এখন মানব ইতিহাসের বৃহত্তম নাটক দেখতে যাচ্ছে। সাধারণভাবে সমগ্র মানবকুলের জন্য আর বিশেষভাবে ইহুদীদের জন্য এখন সময় শেষ হয়ে এসেছে। যারা ফেরাউনের মত জীবন যাপন করে তারা ফেরাউনের মত মৃত্যুবরণ করবে।

১০. যখন ঈসা (আঃ) প্রত্যাবর্তন করবেন তখন তাঁকে মসীহ্ বলে বিশ্বাস না করে ইহুদীদের আর কোন উপায় থাকবে না, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে যাবে, অর্থাৎ ভয়ঙ্কর শাস্তি ও দোজখের আগুন থেকে বাঁচার আর কোন পথ থাকবে না

ইহুদীরা ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশবিদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল এবং তারপরে এ ব্যাপারে গর্বপ্রকাশ করেছিল যে, তারা তাদের লক্ষ্য অর্জন করেছে, পবিত্র কুর'আনে ঐ ঘটনার বর্ণনা দেয়ার পরে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সতর্কবাণী ঘোষণা করলেন। ইহুদীগণ, যারা ঈসা (আঃ)-কে মসীহ্ হিসাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল (এবং খৃস্টানগণ যারা তাকে বিধাতা হিসাবে উপাসনা করল) তাদের জানিয়ে দেওয়া হল যে, তাঁর মৃত্যুর পূর্বে (অর্থাৎ তিনি প্রত্যাবর্তন করার পর এবং মৃত্যুবরণ করার পূর্বে), তারা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য হবে। এভাবে ইহুদীদেরকে বিশ্বাস করতে হবে যে, তিনিই হচ্ছেন 'মসীহ্' আর খৃস্টানদেরকে তাঁর উপাসনা বন্ধ করে তাঁকে একজন নবী হিসাবে সনাক্ত করতে হবে:

وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۖ
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿١٥٩﴾

"আর আহ্লে কিতাবের ভিতর থেকে এমন কেউ নেই যে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য হবে না
"এবং শেষ বিচারের দিনে তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবেন।"

(কুর'আন, সুরা নিসা ৪:১৫৯)

উপরের আয়াত এই ইঙ্গিত দেয় যে যখন ঈসা (আঃ) প্রত্যাবর্তন করবেন, তখন যে ইহুদীরা তাঁকে চিনতে পারবে শুধু তাই নয়, মসীহ্ হিসাবে তাঁর উপর তাদের বিশ্বাস নিশ্চিত হবে, আর উপরন্তু, প্রকারান্তরে ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতার তরফ থেকে প্রেরিত শেষ নবী হিসাবে মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর এবং শেষ কিতাব হিসাবে কুর'আনের উপরও তাদের বিশ্বাস নিশ্চিত হবে। কিন্তু ইহুদীদের তরফ থেকে এই শেষ মুহূর্তের ঈমানের নিশ্চয়তা তাদের কোন কাজে আসবে না, ঠিক যেমন শেষ মুহূর্তে ঈমানের ঘোষণা ফেরাউনের কোন কাজে আসেনি, (সে তবুও জাহান্নামী হয়েছিল)। ফেরাউনের মরদেহ পুনরুদ্ধারের সাথে সংশ্লিষ্ট ইহুদীদের জন্য অশুভ বাণী হচ্ছে এটাই!

পৃথিবী যখন চরম পরিণতিতে পৌঁছাবার শেষ ক্ষণটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সঠিক মূল্যায়নের জন্য এই অতিরিক্ত নিহিতার্থ বুঝাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, ইহুদী তথা সকল অবিশ্বাসীগণ ঐ শেষ ধাপের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকবে যে তারাই সাফল্যের রাস্তায় রয়েছে। আর তাই এই শেষ যুগে পৃথিবীতে আল্লাহ নির্ধারিত সত্যের (অর্থাৎ ইসলামের) অবস্থা হচ্ছে এই যে, যতই দিন যাবে ততই বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হবে যে ইসলাম ব্যর্থ হয়েছে। পৃথিবীর অবস্থা আজ ঠিক এরকমই।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পবিত্র কুর'আন এবং জেরুজালেমের শেষ অধ্যায়

وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا ۘ

"... কিন্তু যদি তোমরা ফিরে যাও ('পবিত্রভূমির' অধিকারের জন্য যে শর্ত আরোপিত করা হয়েছে তা ভঙ্গ করতে) আমরাও ফিরে যাব (আমাদের শাস্তি প্রদানে অর্থাৎ তোমাদেরকে বার বার বহিষ্কার করা হবে).. ।"

(কুর'আন, সুরা বনী ইসরাঈল ১৭:৮)

"রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: তোমাদের মাঝে আল্লাহ্ যতদিন চাইবেন ততদিন নবুওয়ত টিকে থাকবে, আর তারপর আল্লাহ্ তা উঠিয়ে নেবেন। তারপর আল্লাহ্ যতদিন চাইবেন ততদিন নবুওয়তের প্রদর্শিত পথে খিলাফত থাকবে, তারপর আল্লাহ্ তা উঠিয়ে নেবেন। তারপর উত্তরাধিকার সূত্রে শাসন (সম্মতি সহকারে) আসবে এবং আল্লাহ্ যতদিন চাইবেন ততদিন তা টিকে থাকবে, তারপর আল্লাহ তা উঠিয়ে নেবেন। তারপর কঠোর নির্যাতনের যুগ আসবে এবং আল্লাহ্ যতদিন চাইবেন ততদিন তা টিকে থাকবে। তারপর তিনি তা উঠিয়ে নেবেন। তারপর নবুওয়তের বিধান অনুযায়ী খিলাফত আসবে এবং এই কথা বলে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) চুপ করে রইলেন।"

(মুসনাদ, আহমদ ইব্নে হাম্বাল)

দ্বিতীয়বারের মত পবিত্রভূমি থেকে বহিষ্কারের মাধ্যমে ইহুদীদেরকে শাস্তি প্রদানের পর, আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন যে, তারা যদি ঈমান ও সদাচারের শর্ত ভঙ্গ ক'রে পবিত্রভূমিকে অপবিত্র করতে থাকে, তবে তিনিও তাদের শাস্তি দিয়ে যেতে থাকবেন (এবং বহিষ্কার করতে থাকবেন):

وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا ۘ

"... কিন্তু যদি তোমরা ফিরে যাও ('পবিত্রভূমির' অধিকারের জন্য যে শর্ত আরোপিত করা হয়েছে তা ভঙ্গ করতে) আমরাও ফিরে যাব (আমাদের শাস্তি প্রদানে অর্থাৎ তোমাদেরকে বার বার বহিষ্কার করা হবে).. ।"

(কুর'আন, সুরা বনী ইসরাঈল ১৭:৮)

পবিত্র কুর'আনের উপরোক্ত সতর্কবাণী ও দৃঢ় ঘোষণার মধ্যে, সাদামাটাভাবে জেরুজালেমের শেষ অধ্যায় লিখিত রয়েছে। ফিলিস্তিনী জনগণের ধর্মনিরপেক্ষ

জাতীয়তাবাদী প্রতিনিধিগণ এবং ইউরোপীয় ইহুদীদের ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী প্রতিনিধিগণ, যারা মনে করে যে তারা ইব্রাহীম (আঃ)-এর ইসরাঈলী 'বীজ' অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের প্রতিনিধিত্ব করে, এই দুই পক্ষের ভিতর ক্যাম্প ডেভিড বা অন্য যে কোন স্থানে যত চুক্তিই সম্পাদিত হোক না কেন, ভয়ঙ্কর ধর্ম-বিমুখতা, ক্ষয়িষ্ণুতা এবং নিপীড়ন যা বর্তমানে 'পবিত্রভূমিকে' দূষিত করে রেখেছে, তার প্রেক্ষিতে জেরুজালেমের শেষ অধ্যায় সহজেই দেখতে পাওয়া যায়। ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈলে সবচেয়ে ব্যতিক্রমী ব্যাপার হচ্ছে ধর্ম-বিমুখতার অবস্থা এবং পরিত্যক্ত ধর্মীয় জীবনযাত্রা। ইসরাঈলে ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মের চর্চা সম্বন্ধে সাম্প্রতিককালের জেরুজালেম পোস্টের সম্পাদকীয় বক্তব্য নিম্নরূপ: *অধিকাংশ ইসরাঈলীদের কাছে ইহুদীত্ব এখন অপ্রচলিত, আদিম এবং অপ্রাসঙ্গিক একটা ব্যবস্থা যা কেবলমাত্র ক্ষমতা ও অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রতিযোগিতা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা বুদ্ধিবৃত্তিক আধুনিক সমাজের জন্য একটা লজ্জার বিষয়।* (জেরুজালেম পোস্ট, সেপ্টেম্বর ১২, ২০০০)।

নবী (সাঃ)-এর অলৌকিক জেরুজালেম যাত্রার সময় তাঁকে যে সকল ঐশ্বরিক নিদর্শন দেখান হয়েছিল, তার ভিতরে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, এমন কিছু নিদর্শন ছিল, যা তাঁকে জেরুজালেমের শেষ অধ্যায় সম্বন্ধে অবহিত করেছিল। এই ব্যাপারটা বোধহয় Daniel Pipes এর মনোযোগ এড়িয়ে গেছে। তা অবশ্য আশ্চর্যজনক নয়, কেননা অন্যান্য বহু ইহুদীর মতই, ইন্তিফাদার 'পাথরগুলি' যে ইতোমধ্যেই 'পবিত্রভূমিতে' কথা বলতে শুরু করেছে, তিনি তা শুনতে অক্ষম। কিন্তু ইসরাঈলী নিরাপত্তা বাহিনীর প্রাক্তন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল Aphraim Eitam, যিনি হালে ইসরাঈলী নিরাপত্তা বাহিনী থেকে ইস্তফা দিয়েছেন, তিনি মনে হয় বুঝতে পেরেছেন যে, ঐ 'পাথরগুলি' বাস্তবিকই 'পবিত্রভূমিতে' কথা বলছে। তিনি ঘোষণা করেছেন: *"ইসরাঈল হচ্ছে পৃথিবীর বুকে ইহুদীদের জন্য সবচেয়ে বিপদজনক দেশ..."* (জেরুজালেম পোস্ট, ফেব্রুয়ারি ২০, ২০০১)

পবিত্র কুর'আন পরিস্কার ভাবে জেরুজালেমের শেষ অধ্যায় নির্ধারণ করেছে, যাতে বুঝা যায় যে মুসলিমরা জেরুজালেমের উপর তাদের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে, সেই শাসন যা রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর তিরোধানের স্বল্পসময় পরে সূচিত হয় এবং যা কয়েক শত বৎসর পর্যন্ত অবাধে চলেছিল। ইউরো-খৃস্টান ক্রুসেডাররা যখন জেরুজালেম জয় করে, তখন প্রায় আশি বৎসরের মত এক স্বল্পকালীন সময় তারা শাসন করতে পেরেছিল, তারপর জেরুজালেমের ভূমিকা অবার পূর্বের ধারায় ফিরে যায় যখন মুসলিম বাহিনী ক্রুসেডারদেরকে পরাজিত করে, আর 'পবিত্রভূমিতে' মুসলিম শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। আবারও তা নিরবচ্ছিন্নভাবে কয়েকশত বৎসরের জন্য চলতে থাকে যতদিন না ঐশ্বরিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ইহুদীদেরকে 'পবিত্রভূমিতে' ফিরিয়ে আনবার সময় এসে

পড়ে। এর সম্ভাবনা কম যে, পূর্ববর্তী ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের শাসনের মতই বর্তমান ইহুদী শাসনও আশি বছরের চেয়ে বেশী টিকে থাকতে পারবে, অবশ্য এ ব্যাপারে আল্লাহ্ই সবচেয়ে ভাল জানেন। তারপর মুসলিম বাহিনী ইহুদীদেরকে পরাজিত করবে এবং মুসলিম শাসন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন:

وَعَدَ اللَّـــهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ
وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

"তোমাদের মাঝে যারা (ইসলামে) বিশ্বাস করে এবং যারা সদাচারী তাদের কাছে আল্লাহ্ অঙ্গীকার করেছেন

"যে তিনি অবশ্যই তাদেরকে ভূমির (অর্থাৎ 'পবিত্রভূমির') উত্তরাধিকারী বানাবেন, যেমনটা তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের (অর্থাৎ ইহুদীদের) বেলায় অনুমোদন করেছিলেন

"যে তিনি তাদের ধর্মকে (অর্থাৎ ইসলামকে) ('পবিত্রভূমির') কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করবেন, যা (যে ধর্মকে) তিনি তাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন (দেখুন কুর'আন, সুরা মায়েদাহ্ ৫:৩)*; এবং তারা যে ভয়ের মাঝে বসবাস করত সেই অবস্থার পরিবর্তন করে তাদেরকে নিরাপত্তা ও শান্তির অবস্থায় ফিরিয়ে দেয়া হবে:*

"'তারা (কেবল) আমার উপাসনা করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না।'

"এর পরে যারা ঈমানকে প্রত্যাখ্যান করবে তারা হবে বিদ্রোহী এবং পাপিষ্ঠ।"

(কুর'আন, সুরা নূর ২৪:৫৫)

পবিত্র কুর'আন যখন মুমিনদের ভয়সঙ্কুল অবস্থার মাঝে জীবন-যাপনের কথা বলে তখন ঐ ভয়ের কারণসমূহের মাঝে নিশ্চয়ই 'পবিত্রভূমিতে' ঘটে যাওয়া ভয়ঙ্কর ইসরাঈলী নিপীড়নও অন্তর্ভুক্ত। কুর'আনিক আয়াত এটাও স্পষ্ট করে দেয় যে আগামী দিনের পবিত্রভূমির উত্তরাধিকার কেবলমাত্র ঐ সমস্ত মুসলিমরাই লাভ করবে, যারা একমাত্র আল্লাহ্র উপাসনা করে এবং শির্ক করে না। আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঐ বিশ্বস্ত সম্প্রদায়ে পি-এল-ওর কোন অংশ নেই। পবিত্র কুর'আনের এই অঙ্গীকার রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিম্নলিখিত হাদীস দ্বারা নিশ্চিত:

"আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: খোরাসান (আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং স্বল্পমাত্রায় ইরান ও মধ্যএশিয়ার মাঝে বিভক্ত অঞ্চলসমূহ নিয়ে গঠিত একটি এলাকা) থেকে কালো পতাকা বেরিয়ে আসবে এবং কোন শক্তি তাদেরকে Aelia (জেরুজালেম) পৌঁছান পর্যন্ত রোধ করতে পারবে না।"

(সুনান, তিরমিজী)

যে সশস্ত্র সংগ্রাম জেরুজালেমে মুসলিম বিজয় নিয়ে আসবে, তার নৈতিক যৌক্তিকতা পবিত্র কুর'আনে উল্লেখিত রয়েছে। ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতা নিজেই ঘোষণা করেছেন যে, যখন কোন জনগোষ্ঠীকে তাদের ঘরবাড়ি বা আবাসভূমি থেকে বহিষ্কৃত করা হয় শুধু এজন্য যে তারা মুসলিম [অর্থাৎ শুধু তাদের ধর্মবিশ্বাসের কারণে], তখন তিনি তাদেরকে ঐ নিপীড়নের জবাব দিতে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّـهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾
الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّـهُ ۗ

"যুদ্ধে অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে। কারণ, তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে; আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম।

"যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্...।"

(কুর'আন, সুরা হাজ্জ ২২:৩৯-৪০)

জেরুজালেমের শেষ অধ্যায় এটাই যে একটি মুসলিম বাহিনী ইসরাঈল রাষ্ট্রের ধ্বংস সাধন করবে এবং 'মসীহ্' (মরিয়ামের পুত্র ঈসা) জেরুজালেম থেকে একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসাবে মানবজাতিকে *শাসন* করবেন। যায়োনিস্ট প্রতারক ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের স্থলে, 'পবিত্রভূমিতে' তখন যে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে, সেখান থেকে ঈসা 'মসীহ্' (আঃ) পৃথিবীর উপর শাসন করবেন।

জেরুজালেমের শেষ অধ্যায়ের আওতায় এটাও রয়েছে যে, উপরোক্ত ব্যাপারগুলি ঘটার আগে ইহুদীরাষ্ট্র ইসরাঈলকে পৃথিবীর 'নিয়ন্তা রাষ্ট্রে' পরিণত হতে হবে। যে সময়টায় দাজ্জালের *'একটা দিন হবে এক সপ্তাহের মত'* সেই সময় জুড়ে ইসরাঈল পৃথিবীর উপর শাসন করবে। জঘন্যতম নিপীড়নের এক অধ্যায় শেষে ভণ্ড-মসীহ্ দাজ্জাল নিজেই, *'আমাদের দিনের মত তার দিন'*-এ দৃশ্যমান হবে। ঐ সময় গ্যালিলি হ্রদের পানি শুকিয়ে যাবে। দাজ্জাল জেরুজালেম থেকে পৃথিবীর উপর শাসন করবে আর এভাবেই আসল মসীহ্ বলে নিজেকে প্রতীয়মান করার তার মিশনকে

বাস্তবায়িত করবে। ব্যক্তিরূপে দাজ্জাল যখন দৃশ্যমান হবে, সেই সময় ইমাম আল-মাহ্দীও দৃশ্যমান হবেন।

রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) নিম্নলিখিত হাদীসে এই ঘটনাটি সম্বন্ধে বলে গেছেন:

"রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: তোমাদের মাঝে আল্লাহ্ যতদিন চাইবেন ততদিন নবুওয়াত টিকে থাকবে, আর তারপর আল্লাহ্ তা উঠিয়ে নেবেন। তারপর আল্লাহ্ যতদিন চাইবেন ততদিন নবুওয়াতের প্রদর্শিত পথে খিলাফত থাকবে, তারপর আল্লাহ্ তা উঠিয়ে নেবেন। তারপর উত্তরাধিকার সূত্রে শাসন (সম্মতি সহকারে) আসবে এবং আল্লাহ্ যতদিন চাইবেন ততদিন তা টিকে থাকবে, তারপর আল্লাহ তা উঠিয়ে নেবেন। তারপর কঠোর নির্যাতনের যুগ আসবে এবং আল্লাহ্ যতদিন চাইবেন ততদিন তা টিকে থাকবে। তারপর তিনি তা উঠিয়ে নেবেন। তারপর নবুওতের বিধান অনুযায়ী খিলাফত আসবে এবং এই কথা বলে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) চুপ করে রইলেন।"

(মুসনাদ, আহমদ ইব্নে হাম্বাল)

দাজ্জাল ইমাম মাহদীকে দামেস্কে আক্রমণ করবে। তখন আসল 'মসীহ্' ঈসা (আঃ) অবতীর্ণ হবেন এবং 'ভণ্ড-মসীহ্' দাজ্জালকে হত্যা করবেন। যখন দাজ্জাল মৃত্যুবরণ করবে, ঐ সময়ে ইয়াজুজ-মাজুজের শেষ অংশ মুক্তি লাভ করবে এবং তারা গ্যালিলি হ্রদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলবে: "এখানে একদা পানি ছিল।" ইয়াজুজ-মাজুজ ঈসা মসীহ্ (আঃ)-কে ধাওয়া করে জেরুজালেমের এক পাহাড়ে নিয়ে যাবে এবং আল্লাহ্ ঈসা (আঃ)-কে ঐ পাহাড়ে উঠার আদেশ দেবেন। ইয়াজুজ-মাজুজ তখন গর্বভরে বলবে যে পৃথিবীতে যারা আছে তাদেরকে তারা হত্যা করেছে, এখন আসমানে যারা রয়েছে তাদেরকে হত্যা করার দিকে তারা মনোনিবেশ করবে। তারা আকাশের দিকে তাদের তীর ছুঁড়ে মারবে এবং আল্লাহ্ সে সমস্ত তীর রক্তমাখা অবস্থায় তাদের কাছে ফিরে আসা অনুমোদন করবেন। (অদূর ভবিষ্যতে কেউ ইনশাআল্লাহ্ এই হাদীসের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন)। ঈসা মসীহ্ (আঃ) তখন ইয়াজুজ-মাজুজের ধ্বংস কামনা করে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করবেন এবং আল্লাহ্ তাদেরকে এক ধরনের পতঙ্গের মাধ্যমে ধ্বংস করবেন যারা তাদের ঘাড়ে আক্রমণ করবে। তাদের পতন ঘটবে এবং পরবর্তী সকালের মধ্যে তারা সবাই মৃত্যুবরণ করবে।

যখন ইয়াজুজ-মাজুজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, তখন কর্তৃত্বময় 'শ্বেতাঙ্গ বিশ্বব্যবস্থায়' ধ্বস্ নামবে এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিস্ময়ের আধুনিক জগত ধ্বসে পড়বে। এই গ্রন্থে মনে করা হয়েছে যে ঐ ঘটনা এখন থেকে পঞ্চাশ বছরের বেশী দূরে নয়। সেরকম একটা সময়েই খোরাসান থেকে কথিত ঐ মুসলিম বাহিনী সৃষ্টি হবে এবং ঐ বাহিনী তখন মুখোমুখি যুদ্ধে ইহুদীদের সাথে মোকাবিলা করবে। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম

দুটোতেই সংকলিত হাদীসে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) ঘোষণা করেছেন যে, মুসলিমরা ঐ সময় ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তাঁর বক্তব্য ছিল এরকম:

"তোমরা নিশ্চিতভাবে ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং নিশ্চিতভাবে তাদেরকে হত্যা করবে। (আর এটা চলতেই থাকবে) যতক্ষণ না (এমনকি) প্রস্তরখন্ডগুলি কথা বলবে (এই বলে যে): হে মুসলিম! আমার পিছনে একজন ইহুদী লুকিয়ে আছে, সুতরাং এস তাকে হত্যা কর।"

(সহীহ বুখারী)

"আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত: আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বলেন: মুসলিমরা ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত শেষ প্রহর আসবে না। মুসলিমগণ ইহুদীদেরকে হত্যা করতে থাকবে এবং এমন অবস্থা আসবে যে, ইহুদীরা একটি পাথর অথবা একটি গাছের পেছনে লুকাবে এবং পাথর বা গাছ বলবে: হে মুসলিম, অথবা, হে আল্লাহ্‌র বান্দা আমার আড়ালে একজন ইহুদী আছে, এস তাকে হত্যা কর; কেবল গারকাদ নামক বৃক্ষটি তা বলবে না, কেননা ওটা হচ্ছে ইহুদীদের বৃক্ষ।"

(সহীহ্ মুসলিম)

এই যুগে সত্যিকার দিক নির্দেশনা দিতে অক্ষম, ইসলামের এমন পণ্ডিতদের সনাক্ত করে বাদ দেয়া বাস্তবিকই খুব সহজ, কারণ তারা হবেন সেই সকল পণ্ডিতবর্গ যারা জনসমক্ষে উপরের হাদীসের উদ্ধৃতি দেবেন না, অথবা দিলেও কদাচিৎ দেবেন।

জেরুজালেমের ভূমিকা মুসলিমদেরকে বৃহত্তম আত্মবিশ্বাস ও আশা প্রদান করে যে, মিথ্যা এবং নিপীড়নের উপর সত্যের জয় হবেই।

আজ আমরা যে আজব পৃথিবীতে বসবাস করছি মুসলিমদের কাছে সেটাকে ব্যাখ্যা করার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে এই গ্রন্থখানি লেখা হয়েছে। এটা এমন পৃথিবী যেখানে ইসলামের বাণী *আপাত দৃষ্টিতে* অর্থহীন মনে হয়। কিন্তু ইতোমধ্যেই জেনে না থাকলেও এই গ্রন্থটি পড়ার পর পাঠক জানবেন যে, বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। তারা নিশ্চিতরূপে জানতে পারবেন যে, জেরুজালেমের শেষ অধ্যায় সত্য সম্পর্কে ইসলামের দাবীকে দর্শনীয় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে। সেই সাথে মুসলমানদেরকে ইসলামের উপর পরিচালিত বর্তমান যুদ্ধকে প্রতিরোধ করার শক্তি সঞ্চয়ে সাহায্য করবে, যে যুদ্ধের মাধ্যমে ধর্ম-বিমুখ পৃথিবী আল্লাহ্ তা'আলার উপর বিশ্বাসকে ধ্বংস করার ব্যাপারে সম্ভাব্য বৃহত্তম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

পবিত্রভূমি এবং ইসরাঈল রাষ্ট্রের রাজনৈতিক শির্ক

وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ﴿٢﴾

"আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং সেটিকে বনী ইসরাঈলের জন্যে হেদায়েতে পরিণত করেছি যে তোমরা আমাকে ছাড়া আর কাউকে কার্যনির্বাহী স্থির করো না।"

(কুর'আন, সুরা বনী ইসরাঈল ১৭:২)

(শির্ক হচ্ছে ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতা ছাড়া অন্য যে কারো উপাসনা করা। ঐ একমাত্র বিধাতার উপাসনায় কোন বিকৃতি সাধনও এক ধরনের শির্ক। কুফ্‌র হচ্ছে সত্যের প্রত্যাখ্যান অথবা সত্যকে অস্বীকার করা।)

ইসরাঈল হচ্ছে পবিত্রভূমিতে অবস্থিত এক আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এর রাজনৈতিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মের নিরীখে বিচার করা হলে ঐ রাষ্ট্রের ধর্মীয় বৈধতা কতটুকু? আর 'পবিত্রভূমিতে' প্রতিষ্ঠিত ঐ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কি 'পবিত্রভূমির' উত্তরাধিকারের ব্যাপারে আরোপিত ঐশ্বরিক শর্তসমূহ পূরণ করে, না তা ভঙ্গ করে? এই অধ্যায়ে ঐ সমস্ত প্রশ্নাবলীর উত্তর দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

আজকের বিশ্বব্যবস্থা

বিস্মিত হতে হয় যে আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করছি যা আজও বহু বিশাল [ঐতিহ্যবাহী] সভ্যতা নিয়ে গঠিত, যার কোন কোনটি কয়েক হাজার বছর পুরনো, কিন্তু বিশেষ ভূখণ্ডের উপর কোনটিরই নিয়ন্ত্রণ নেই। পৃথিবীর সর্বত্রই মানবকুল আজ ইউরোপীয় সভ্যতার শাসনের বশীভূত। পৃথিবীর সর্বত্রই ইউরোপীয় ধাঁচের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থা মানবকুলকে গ্রাস করেছে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এই ব্যাপারটি স্পষ্টতই ব্যতিক্রম। তা যেমন রহস্যময় তেমনি অশুভ। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের এই ইউরোপীয় ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত লীগ অফ নেশন্‌স নামের অভিনব আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেয়, যা পরবর্তীতে ইউনাইটেড নেশন্‌স বা জাতিসংঘ হিসেবে পুনর্জন্ম লাভ করে। এই ইউনাইটেড নেশন্‌স নামের ভিতরেই ইউরোপ কর্তৃক সৃষ্ট New World Order বা নতুন বিশ্বব্যবস্থার লক্ষ্য নিহিত রয়েছে। ইউরোপ যেন শেষ পর্যন্ত বিশ্ব-সরকার হিসেবে

গোটা বিশ্বকে শাসন করতে পারে, সে উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় রাজনৈতিক প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের আওতায়, গোটা পৃথিবীকে একত্র করাই ছিল ঐ লক্ষ্য। এই গ্রন্থটি যখন লেখা হচ্ছে তখন ইউরোপ তার ঐ রাজনৈতিক কৌশলের চূড়ান্ত এবং পূর্ণ সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। ইউরোপীয় ধর্মনিরপেক্ষ শৃঙ্খলের বন্ধন থেকে মুক্তির ব্যাপারে গোটা বিশ্বের বাকী অ-ইউরোপীয় সভ্যতাসমূহকে আজ অসহায় বা অক্ষম মনে হবে।

সুপরিচিত ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ আর্নল্ড টয়েনবী এই অভূতপূর্ব অবস্থা সম্পর্কে বলেছেন যে, পূর্ববর্তী সকল সভ্যতা হয় মৃত নয় মুমূর্ষু, কিন্তু *এটা অনিবার্য নয় যে, পশ্চিমা সভ্যতাও আগের সভ্যতাগুলোর মত এক সময় একই ধরনের দুর্ভাগ্যের শিকার হবে*, (টয়েনবী: Civilization on Trial, Oxford University Press, London, 1957; p. 38)। ইউরোপীয় লক্ষ্য ছিল খুব পরিস্কারভাবে, অথচ রহস্যজনকভাবে ও অশুভভাবে, সমগ্র পৃথিবীর উপর ইউরোপীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করা। তার বিখ্যাত গ্রন্থ Civilization on Trial-এ টয়েনবী এক অকপট বক্তব্যের মাধ্যমে এই বিষয়কে নিশ্চিত করেন:

"Western Civilization is aiming at nothing less than the incorporation of all of mankind in a single great society and the control of everything in the earth, air and sea." (ঐ, page 166)।

অবশ্য ইউরোপীয়দের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল 'পবিত্রভূমিতে' ইহুদীদের প্রত্যাবর্তনকে সম্ভব করে তোলা এবং পৃথিবীর শাসনভার ইহুদীদের হাতে অর্পণ করা, যাতে তারা জেরুজালেম থেকে পৃথিবীকে শাসন করতে পারে। ঐ ব্যাখ্যাতীত বাস্তবতাকে এই গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে!

পবিত্র কুর'আন অত্যন্ত সহজ ভাষায় (সুরা আম্বিয়া ২১:৯৬) ঘোষণা করে যে যখন আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক ইয়াজুজ-মাজুজকে পৃথিবীতে মুক্ত করা হবে, তখন তারা "সবদিকে ছড়িয়ে পড়বে"। যার ফলশ্রুতিতে, একটা জনগোষ্ঠী যাদের এমন এক 'শহর' থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল যে 'শহরটি' আল্লাহ্ তা'আলা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন এবং যাদের ঐ 'শহরে' প্রত্যাবর্তন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, তারা এখন ঐ শহরের উপর নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে ফিরে আসবে। এই গ্রন্থে যুক্তি দেখান হয়েছে যে ঐ 'শহরটি' হচ্ছে জেরুজালেম! যখন ইয়াজুজ-মাজুজ 'সবদিকে ছড়িয়ে পড়বে' তখন বাকী মানবকুলের জন্য ঐশ্বরিক ঘোষণা অনুযায়ী তাদের প্রতিরোধ করা অসম্ভব হবার কথা:

"আমি আমার বান্দাদের মাঝ থেকে এমন এক জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছি, যাদের বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধ করতে সক্ষম হবে না, তুমি তাদের নিয়ে নিরাপদে তূর-এ যাও এবং তারপর আল্লাহ্ ইয়াজুজ-মাজুজকে পাঠাবেন এবং তারা সবদিকে ছড়িয়ে পড়বে।"

(সহীহ্ মুসলিম)

উপরোক্ত বক্তব্যগুলি থেকে এটা পরিস্কার যে {মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমন পরবর্তী} ইউরোপীয় সভ্যতাই হচ্ছে ইয়াজুজ-মাজুজের সভ্যতা।

এই গ্রন্থে ভণ্ড-মসীহ্ দাজ্জালের বিষয়াদিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইয়াজুজ-মাজুজের সাথে একত্রে সে শেষ যুগের নিদর্শনগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান নিদর্শন। তার মিশন যেহেতু মসীহ্র ভূমিকায় অভিনয় করা যিনি জেরুজালেম থেকে গোটা বিশ্বকে শাসন করবেন, সেহেতু তাকেও জেরুজালেম থেকে গোটা বিশ্বকে শাসন করতে হবে। দাজ্জাল যে স্থান থেকে তার মিশন শুরু করেছে, সেই স্থানকে ব্রিটেনের দ্বীপ বলে এই গ্রন্থে সনাক্ত করা হয়েছে। এভাবে 'পবিত্রভূমিতে' ইহুদীদের শুধু প্রত্যাবর্তন সম্ভব করে তোলাই যে ইউরোপীয়দের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল শুধু তাই নয়, বরং তাদের হাতে পৃথিবীর শাসনভার তুলে দেয়া, যাতে তারা জেরুজালেম থেকে পৃথিবীকে শাসন করতে পারে, সেটাও তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

যে সার্বিক কৌশলের মাধ্যমে ইউরোপ ঐ লক্ষ্য অর্জন করতে চেয়েছিল, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ধারণা ছিল তার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জন্মতত্ত্ব

ইউরো-খৃস্টান সভ্যতাকে যখন রহস্যজনকভাবে ভিতর থেকে আক্রমণ করা হল এবং যখন তা অশুভ ও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের শিকার হল, তারপরই ইউরোপে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটল। ঐ বিপ্লব, খৃস্টধর্ম এবং ইহুদী ধর্ম-বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত সভ্যতাকে (যার একটি অপরটি থেকে উদ্ভূত), অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার অধিকারী, অবশ্যই স্রষ্টা-বিমুখ, কল্পনাতীতভাবে প্রতারণাসুলভ এবং দুঃখজনকভাবে ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতায় রূপান্তরিত করল। ইউরোপীয় সভ্যতায় সকল ঘটনাবলীর মধ্যে, এই ঘটনাটি ছিল সবচেয়ে ব্যতিক্রমধর্মী এবং বিশাল এক অশনি সংকেত।

আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ধর্ম-বিমুখতা তার বস্তুবাদের মাঝে স্পষ্টতই প্রতীয়মান। এর অর্থ এই যে, বস্তুভিত্তিক বাস্তবতার বাইরে আর কোন বাস্তবতার অস্তিত্ব ইউরোপের কাছে আর গ্রহণযোগ্য রইল না। বস্তুবাদের আত্মীকরণের ব্যাপারটা নিজেই 'একচক্ষু' জ্ঞানতত্ত্ব অবলম্বনের স্বাভাবিক এবং যুক্তিসঙ্গত পরিণতি, যে জ্ঞানতত্ত্ব একরোখাভাবে জেদ ধরে যে, জ্ঞান কেবল একটি উৎস থেকেই আহরণ করা যেতে পারে অর্থাৎ বাহ্যিক পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা থেকে। অন্য চোখটি অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টিকে, জ্ঞান অর্জনের উপায় হিসেবে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হল।

ঐ নতুন ইউরোপীয় স্রষ্টা-বিমুখতাকে রাজনৈতিক দর্শন ও রাজনৈতিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রয়োগের ফলাফল হিসেবে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটল। কিন্তু এখানেই শেষ নয়! ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব যদিও ইতিহাসে এর আগেও কখনো কখনো ছিল, কিন্তু সমগ্র মানবজাতিকে এক নতুন ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্ববিন্যাসে একত্রিত করার এই ধারণা কেবল আধুনিক যুগেই প্রথমবারের মত রূপ নিল। আর এই আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছিল অশুভ ও গুরুতর ইউরোপীয় বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে। ইউরোপের বিপ্লব গোটা মানবকুলকেই তার স্রষ্টা-বিমুখ, ধর্মনিরপেক্ষ বাঁধনে আবদ্ধ করার পর গোটা মানবকুলকে একটি একক, ভৌগোলিক, ধর্ম-বিমুখ, ধর্মনিরপেক্ষ এবং ক্ষয়িষ্ণু পৃথিবীতে রূপান্তরিত করার কাজে এগিয়ে গেল। এই ঘটনাটি ছিল মানব ইতিহাসের একটি অভিনব ঘটনা। এমন কিছু আছে কি যা এই ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারে? আমাদের দাবী হচ্ছে যে কেবল পবিত্র কুর'আনই এর ব্যাখ্যা দিতে পারে!

স্রষ্টা-বিমুখ ইউরোপীয় বিপ্লব আরো বেশী রহস্যময় এই জন্য যে, এর সাথে সাথে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবও সংঘটিত হয়েছিল। এভাবে ধর্ম-বিমুখ ইউরোপ এক অজেয় ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল যা ইউরোপকে এক চাকচিক্যপূর্ণ অবয়ব দান করার পাশাপাশি তাকে অপ্রতিরোধ্য করে তোলে। বাষ্প চালিত রেলগাড়ি, ট্রেন, মোটরগাড়ি, ট্রাক, যুদ্ধের জন্য যান্ত্রিক ট্যাঙ্কবহর, বাষ্প ও জ্বালানীচালিত জাহাজের বহর, বিমানবহর ইত্যাদি, মানুষের যাতায়াত ও যুদ্ধ করার ধারাকে সম্পূর্ণরূপে পালটে দেয়, এবং প্রকারান্তরে মানুষের বসবাস করার ধরনও পালটে দেয়। বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করল ও রাতকে দিনে পরিবর্তিত করল, এক কথায় মানুষের জীবনকে বদলে দিল। টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ বিশাল দূরত্বের ব্যবধানে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব করে তুলল, এবং সেই সাথে মানুষের জীবনযাত্রা বদলে দিল। সব শেষে নারীবাদী বিপ্লব আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও নির্ধারিত নারী ও পুরুষের মাঝের কর্মপদ্ধতিগত পার্থক্যকে (কুর'আন, সুরা লাইল ৯২:১-৪) অস্বীকার ক'রে নারীকে পুরুষের কার্যকরী ভূমিকা অধিগ্রহণ করার স্বাধীনতা দিল। ঐ বিপ্লবকে স্বাগত জানান হয় Women's Liberation বা নারী স্বাধীনতা হিসেবে! এর ফলে মানুষের জীবনযাত্রার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অশুভ পরিবর্তনটি সাধিত হয়।

মানুষের মৌলিক প্রবৃত্তি, লোভ ও কামস্পৃহার কাছে আবেদন রেখে, ঐ নতুন ইউরোপ মানবকুলের উদ্দেশ্যে এক প্রলম্বিত আক্রমণ পরিচালনা করে। এই যৌনবিপ্লব — স্বাভাবিক এবং বিকৃত — সব ধরনের যৌনতাকে সূর্যালোকের মত চাহিবা মাত্র এবং অবাধে ভোগ করতে পারার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এল। বিয়েকে উত্তরোত্তর অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করা হল এবং মানুষজন বিবাহ-বন্ধন ছাড়াই একত্রে বসবাস করাকে বেছে নিতে পারল, এবং এধরনের জীবনযাত্রা সম্মানজনক বলে বিবেচিত হতে লাগল। প্রাক্তন মার্কিন

প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডিকে Camelot যুগের[১] একজন আমেরিকান তারকা হিসাবে গণ্য করা হত, তারই স্ত্রী জ্যাকুইলিন কেনেডি জীবনের শেষ বছরগুলো বিনা বিবাহে একত্রবাস করে গেছেন। যখন তিনি মারা গেলেন তখন এক ইহুদীকে বিশ্ববাসীর কাছে তার 'সাথী' হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

সমকামিতাকে বিকল্প যৌনতা হিসাবে সমর্থন দেয়া হল এবং ব্যাপারটা গণচেতনায় এতই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠল যে, একজন সমকামী পাদ্রি বা র‍্যাবাই গোপনীয়তার আবরণ পরিত্যাগ করে সম্মানের দাবী করতে পারে এবং পাদ্রি বা র‍্যাবাই হিসাবে নির্বিঘ্নে তার কাজ চালিয়ে যেতে পারে। এমনকি সমকামিতার ইংরেজি প্রতিশব্দ homosexuality-র ভিতরে যে অস্বাভাবিক যৌন আচরণের ইঙ্গিত ও তার প্রতি সামাজিক ঘৃণা রয়েছে, তা দূরীকরণের লক্ষ্যে, ঐ শব্দকেও ধর্মনিরপেক্ষ রূপ দেয়া হল। ইংরেজি শব্দ 'Gay' দিয়ে ঐ শব্দটি প্রতিস্থাপিত হল। সরল মনের জনসাধারণ, নামের ঐ আপাত নিরীহ পরিবর্তনকে সহজেই গ্রহণ করল।

এক ভোগবাদী বিপ্লব মানবকুলকে আরও বেশী করে চোখ ধাঁধাঁনো ভোগ্যপণ্য সংগ্রহ করার তৃপ্তিহীন লিপ্সায় অভ্যস্ত করে তুলল। ভোগ্যপণ্যের ঐ বিপ্লব মানবকুলের মাঝে এমনভাবে অনুপ্রবেশ করল যে, তার বদৌলতে সেকেলে সাদামাটা বাড়ীর রান্নাঘর, গোসলখানা ও পায়খানাও সম্পূর্ণরূপে বদলে গেল।

নতুন স্রষ্টা-বিমুখ ইউরোপ 'ক্ষমতা' প্রয়োগ ক'রে, বাকী পৃথিবীকে জয় করার এবং তাকে উপনিবেশে পরিণত করার কাজে এগিয়ে গেল এবং তারপর তার 'চটক' ব্যবহার ক'রে মানবকুলকে স্রষ্টা-বিমুখ, ক্ষয়িষ্ণু ইউরোপীয় জীবনযাত্রা ও নতুন ভোগবাদী সংস্কৃতি অনুকরণ করতে প্ররোচিত করল। ঐ ধর্ম-বিমুখ ইউরোপীয় বিপ্লব, আমেরিকান, ফরাসী এবং বলশেভিক বিপ্লবের ভিতর দিয়ে যথাক্রমে ১৭৭৬, ১৭৮৭-১৮০০ এবং ১৯১৭ সালে নতুন রাজনৈতিক মোড় নিল। ঐ বিপ্লবের ফলে *রিবার* ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সুদাশ্রিত অর্থনীতির নতুন ধারার বিকাশ ঘটল, যা প্রটেস্ট্যান্ট বিপ্লবের[২] মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করল। আর সাংস্কৃতিক জীবনের মোড় পরিবর্তন ছিল নারী-মুক্তির লক্ষ্যে নারীবাদী বিপ্লবের সূচনা। এটা অনস্বীকার্য যে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের সহযাত্রা ছাড়া এই সমস্ত বিপ্লবের কোনটাই সম্ভব ছিল না।

---

[১] লোককাহিনীতে বিখ্যাত প্রাচীন যুগের ব্রিটিশ রাজা আর্থারের এক দুর্গের নাম ক্যামেলট। মনে করা হয় এটা ইংল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমে উইনচেস্টারে অবস্থিত। সাধারণ পরিভাষায় ক্যামেলটকে ন্যায়, নৈতিকতা ও গৌরবের এক "উজ্জ্বল মুহূর্ত" হিসাবে গণ্য করা হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন কেনেডী নিহত হলে তার স্ত্রী জ্যাকি, কেনেডী পরিবার ও প্রশাসনকে ক্যামেলট বলে আখ্যায়িত করেন।

[২] ষোড়শ শতাব্দিতে খৃস্টান ধর্মে সংস্কারের উদ্দেশ্যে রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে প্রটেস্ট্যান্ট চার্চ গঠিত হয়। মার্টিন লুথার ও জন কালভিন এই আন্দোলনের অগ্রনী ছিলেন।

আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের শির্ক ও কুফর

উপরে বর্ণিত বিপ্লবসমূহ সমাধা হবার পরে, ইউরো-খৃস্টান সভ্যতা, যা এককালে বিধাতা ও তাঁর সার্বভৌমত্ব এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল (রোমের চার্চের কর্তৃত্বের আওতায় 'পৃথিবীতে বিধাতার প্রতিনিধি' হিসেবে রাজাগণ শাসন করার ঐশ্বরিক ক্ষমতা লাভ করতেন), ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতাকে সার্বভৌম হিসেবে গণ্য করা ছেড়ে দিল, এবং তাঁর কর্তৃত্ব ও তাঁর আইনকে সর্বোচ্চ বলে অস্বীকার করল। এখন 'আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে' 'সার্বভৌম' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হল, এবং তা স্পষ্টতই ছিল 'শির্ক'! {ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতা ছাড়া অন্য কারো উপাসনাই হচ্ছে শির্ক। এক বিধাতার উপাসনায় যে কোন ধরনের বিচ্যুতিও শির্ক। কুফর হচ্ছে সত্যের প্রত্যাখ্যান}। 'আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের' কর্তৃত্ব ও আইনকে এখন সর্বোচ্চ বলে মর্যাদা দেয়া হল, এবং তা ছিল শির্ক! ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতা যাকে হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, রাষ্ট্র তাকে হালাল বা বৈধ ঘোষণা করার কর্তৃত্ব অর্জন করল, আর সেটাকে বাস্তবায়িত করতে এগিয়ে গেল, এবং তা ছিল শির্ক!

শির্ক মহাপাপ, এবং সবচেয়ে বড় পাপ। এটা এমন পাপ যা ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতা, আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করবেন না বলে ঘোষণা করেছেন:

إِنَّ اللَّـــهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّـــهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

"অবশ্যই আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে শির্ক করে। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে অন্য সবকিছুর ব্যাপারে ক্ষমা করতে পারেন।
"আর যে শির্ক করল, সে একটা জঘন্য পাপ করল।"

(কুর'আন, সুরা নিসা ৪:৪৮)

যে শির্ক করে এবং ঐ অবস্থায় মারা যায়, সে কখনই বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে না:

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّـــهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّـــهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ

"... যে শির্ক করে, আল্লাহ্ তার জন্য বেহেশতে প্রবেশকে হারাম করেছেন; তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম...।"

(কুর'আন, সুরা মায়িদাহ্ ৫:৭২)

মূর্তিপূজা হচ্ছে সবচেয়ে প্রকাশ্য শির্ক। আজকের পৃথিবী থেকে শিরকের এই রূপ অনেকাংশেই বিলুপ্ত যদিও হিন্দু বিশ্ব বেশ একরোখা ভাবেই মূর্তিপূজাকে ধরে রেখেছে। আর তাই একজন মুমিন যদি হিন্দুদের এই শির্ক সনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়, তবে তাকে কখনো ক্ষমা করা যায় না! পবিত্র কুর'আন মুমিনদেরকে স্পষ্টভাবে সাবধান করে দিয়েছে যে, ইহুদী এবং শির্ককারীরা (যেমন মূর্তিপূজকরা) তাদের সাথে আচার-ব্যবহারে অস্বাভাবিক ঘৃণা ও বৈরিতা প্রদর্শন করবে:

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ

"আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শত্রু হিসাবে ইহুদী ও মুশরিকদের পাবেন...।"

(কুর'আন, সুরা মায়িদাহ্ ৫:৮২)

কিন্তু পবিত্র কুর'আনে অন্যান্য ধরনের শিরকের কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ফেরাউন মূসা (আঃ)-এর কাছে ঘোষণা করেছিল: "*আমি তোমার সর্বমহান প্রভু — বিধাতা*", এবং তারপর সে তার জনগণের সর্দারদের কাছে ঘোষণা করেছিল: "*হে সর্দারগণ! তোমাদের জন্য আমি ছাড়া, আর কোন বিধাতা আমার জানা নেই...*"। ওটা ছিল শির্ক! ফেরাউনের দাবী ছিল মিশরীয় জনগণ তার উপাসনা করুক, তাকে মিশরীয় ভূমির সর্বোচ্চ কর্তৃত্বধারী জেনে তার কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করুক, এবং তার আইনকে মিশরীয় ভূমির সর্বোচ্চ আইন হিসাবে স্বীকৃতি দিক। এবং, সেটাও ছিল শির্ক!

পবিত্র কুর'আন, ফেরাউনের মত যারা *হুকুম* অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব এবং আল্লাহ্‌র আইন ব্যতিরেকে অথবা তার বিপরীতে আইন ও বিচারের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, তাদেরকে বার বার তিরস্কার করেছে। পক্ষান্তরে যখন মানুষের কাছে ঐশ্বরিক দিকনির্দেশনা পৌঁছায় (যেমন ইহুদী, খৃস্টান ও মুসলিমদের ক্ষেত্রে), এবং তারা সেই দিকনির্দেশনা গ্রহণ করে, তখন আরেক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। ঐ ধরনের জনগোষ্ঠীর যদি কোন ভূখণ্ডের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ ঘটে, যেমনটি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় ভারতীয় মুসলিমদের ঘটেছিল, এবং তারা যদি ওহী দ্বারা প্রাপ্ত আল্লাহ্‌র আইনের ভিত্তিতে আইন ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে কুর'আন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাদের তিরস্কার করেছে এবং তাদেরকে কুফ্‌র (বিশ্বাসের বিরোধিতা), জুলুম (অবিচার) এবং ফিস্‌ক (শয়তানী ও পাপাচার) এর দোষে দোষী সাব্যস্ত করেছে:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

". . .আর যে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার ভিত্তিতে বিচার করতে ব্যর্থ হয়, তবে সে কুফ্র-এ (অবিশ্বাস) লিপ্ত হল।"

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

". . .আর যে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার ভিত্তিতে বিচার করতে ব্যর্থ হয়, তবে সে জুলুম (অবিচার ও অত্যাচার)-এ লিপ্ত হল।"

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

". . .আর যে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার ভিত্তিতে বিচার করতে ব্যর্থ হয়, তবে সে ফিস্ক (শয়তানী ও জঘন্য পাপ)-এ লিপ্ত হল।"

(কুর'আন, সুরা মায়িদাহ্ ৫:৪৪, ৪৫ ও ৪৭)

যেহেতু ফেরাউনের ঘোষণা এবং মিশরীয় ভূমিতে তার বাস্তব প্রয়োগ ইত্যাদি শির্কপূর্ণ কাজ ছিল, সেহেতু বলা যায় যে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ঐ একই ধরনের ঘোষণাও শির্ক! ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতা ঘোষণা করেছিলেন: *"আর যে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার ভিত্তিতে বিচার করতে ব্যর্থ হয়, তবে সে কুফর* (অবিশ্বাস), *জুলুম* (অবিচার) *ও ফিসক* (পাপাচার)*-এ লিপ্ত হল।"* এবং যেহেতু আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঠিক ঐ কাজটিই করেছে, এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে ইহুদী, খৃস্টান, মুসলিম ইত্যাদি যারা তৌরাত, যবুর, ইঞ্জীল এবং কুর'আনের মাধ্যমে আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন লাভ করার পরও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কায়েম করেছে, তারা কুফ্র, জুলুম ও ফিস্ক এর দোষে দোষী হবে!

যদি একজন ইহুদী, খৃস্টান অথবা মুসলিম কোন আধুনিক সেক্যুলার (ধর্মনিরপেক্ষ) রাষ্ট্রের জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিতে যায়, ঐ ভোট দানের নিহিতার্থ হবে এই যে, যে দলের পক্ষে সে ভোট দিল, সেই দলকে সে নিজের উপর শাসন করার যোগ্য মনে করে। আর ঐ দল যদি সরকার হিসাবে শির্ক, কুফ্র, জুলুম ও ফিস্ক-এ লিপ্ত হয় তবে এর অর্থ দাঁড়াবে এই যে ঐ ইহুদী, খৃস্টান অথবা মুসলিম তার দল অথবা তার সরকারের শির্ক, কুফ্র, জুলুম অথবা ফিস্ক-এর অনুসরণ করল! (হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদির ব্যাপারে একই কথা প্রযোজ্য)। আল্লাহ্ যা কিছু 'হারাম' করেছিলেন তাকে 'হালাল' বানানোর (এবং 'হালাল'-কে 'হারাম' বানানোর) কাজকে পবিত্র কুর'আন শির্ক বলে গণ্য করে নিন্দা করেছে। এই প্রসঙ্গে ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতার কাছ থেকে ওহী নাযিল হয়েছে যাতে তিনি ইহুদী ও খৃস্টানদের ঠিক এই ধরনের ভয়ঙ্কর পাপের নিন্দা করেছেন:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّـهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَـٰهًا وَاحِدًا ۖ
لَّا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

"তারা তাদের পাদ্রি ও র‍্যাবাইদেরকে আল্লাহ্‌র পাশাপাশি প্রভু-ঈশ্বর হিসেবে গ্রহণ করেছে; এবং মরিয়মের পুত্র মসীহ্‌র বেলায় তারা ঠিক এমনি করেছে।

"কিন্তু কেবল মাত্র এক আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারো উপাসনা ও আনুগত্য করতে তাদের আদেশ দেওয়া হয়নি।

"তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তারা যে শির্‌কে লিপ্ত হয়, তিনি তা থেকে মুক্ত ও ঊর্ধ্বে।"

(কুর'আন, সুরা তওবা ৯:৩১)

এই আয়াত যখন নাযিল হয়েছিল, তখন এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ) এর কাছে আসলো এবং এই বলে প্রতিবাদ করল যে, ইহুদী ও খৃস্টানরা তাদের পাদ্রি ও র‍্যাবাইদেরকে পূজা করে না। সে জিজ্ঞেস করল তাহলে ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতা কি করে তাদেরকে ঐ অভিযোগে অভিযুক্ত করলেন। রাসুলুল্লাহ্‌ পাল্টা প্রশ্নের মাধ্যমে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন: আল্লাহ্‌ যা *'হারাম'* করেছিলেন তাকে কি তারা *'হালাল'* বানায়নি? তিনি বললেন, সেটাই তো *শির্‌ক*! তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন: মানুষজন (ইহুদী ও খৃস্টানগণ) কি এই পথে তাদের অনুসরণ করেনি? তিনি ঘোষণা করলেন, এটা ছিল তাদের *শির্‌ক*। যে সকল *হারাম* ব্যাপারকে *হালাল* ঘোষণা করা হয়েছিল তার ভিতর ছিল জুয়া এবং লটারী, মদ্যপান ও তা বিক্রি এবং *রিবা (টাকা ধার দিয়ে সুদ নেয়া)*। কোন কোন ক্ষেত্রে হারামকে হালাল বানানোর জন্য তৌরাতের বাণীকে বদলে ফেলা হয়েছে। (দেখুন আমাদের গ্রন্থ: The Religion of Abraham and the State of Israel — A View from the Qur'an)।

ইহুদীরা যখন এ ধরনের আচরণ করেছিল তখন দাউদ (আঃ) এবং ঈসা (আঃ) তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছিলেন:

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ
ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾
كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾

"দাউদ ও মরিয়ম-পুত্র ঈসার (আঃ) রসনায় বনী ইসরাঈলের ঐ সমস্ত লোকদের উপর অভিশাপ উচ্চারিত হয়েছিল যারা ঈমানকে প্রত্যাখ্যান করেছিল,

"কেননা তারা অবাধ্য হয়েছিল এবং সীমালঙ্ঘনে রত ছিল।

"তারা যেসব পাপপূর্ণ ও মন্দকাজে লিপ্ত ছিল সেগুলোর উপর যেসব নিষেধাজ্ঞা ছিল তা তারা বলবৎ করেনি: বাস্তবিকই তাদের কর্মকাণ্ড ছিল অসৎ।"

(কুর'আন, সুরা মায়িদাহ্ ৫:৭৮-৭৯)

যারা নিজের উপর একজন নবীর অভিশাপ নিয়ে মৃত্যুবরণ করে, তাদের জাহান্নামের লেলিহান শিখা থেকে পালিয়ে বাঁচার কোন সুযোগ থাকে না! আসলে এটা হচ্ছে মুনাফিকীর চূড়ান্ত উদাহরণ, যখন কোন জনগোষ্ঠী ঘোষণা করে যে তারা ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতার উপাসনাকারী এবং তারপর তিনি [আল্লাহ্] যা অবৈধ করেছেন তাকে বৈধ করতে এবং তিনি যার অনুমতি দিয়েছেন তাকে নিষিদ্ধ করতে এগিয়ে যায়:

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ ۚ
يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ
نَسُوا اللَّـهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٦٧﴾

"মুনাফিক নারী ও পুরুষ সবারই গতিবিধি এক রকম;

"তারা মন্দ কাজে আদেশ করে, এবং সৎকাজে নিষেধ করে এবং নিজ মুঠো বন্ধ রাখে।

"তারা আল্লাহ্কে ভুলে গিয়েছে আর তাই তিনিও তাদেরকে ভুলে গিয়েছেন। নিশ্চয়ই মুনাফিকরাই নাফরমান।"

(কুর'আন, সুরা তাওবা ৯:৬৭)

পাদ্রি ও র‍্যাবাইগণ যদি আল্লাহ্ যেটাকে হারাম ঘোষণা করেছিলেন, সেটাকে হালাল বানিয়ে শির্কে লিপ্ত হয়েছিল, তবে আজ কোন সরকার যখন একই কাজ করে, তখন সেটাও শির্ক। তখন যদি এটা মুনাফিকীর কাজ হয়েছিল, তবে আজও তাই হবার কথা। আর ঐ সময় যদি সেটা নবীদের অভিশাপ কুড়িয়েছিল, তবে আজও তাই হবার কথা!

আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মুমিনদের অংশগ্রহণকে আদ্যোপান্ত ভাবে খুঁটিয়ে দেখাই হচ্ছে এই বিষয়ে গবেষণা করার উদ্দেশ্য। যারা এর পক্ষে বলেন, তারা সুন্দর ভাষায় এর ভাল দিকগুলোই তুলে ধরেন। তারা যুক্তি দেখান যে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র-ব্যবস্থাই হচ্ছে ইতিহাসের সবচেয়ে উন্নত ও প্রগতিশীল মডেলের রাজনৈতিক বিন্যাস ও রাষ্ট্রব্যবস্থা। কেউ কেউ বলেন: "আমরা যদি নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করি, তবে আমাদের কোন রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব থাকবে না; আমাদের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করার কেউ থাকবে না।" আরও গভীর পর্যায় আরেকটা

যুক্তি দেখান হয়: "নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ হচ্ছে স্রষ্টা-বিমুখ রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে পরিবর্তনের জন্য যে কোন সফল সংগ্রামের পূর্বশর্ত।" এখানে শির্কের সংশ্লিষ্টতাকে এক ধরনের প্রতারণার মাধ্যমে পাস কাটিয়ে যাওয়া হয়: "আমরা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করব এই প্রকাশ্য ভিত্তির উপর যে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান এবং তাকে সংরক্ষণকারী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে স্বীকার করি না। এভাবে বললে আমরা শির্ক থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারব।"

আমরা এখানে এ বিষয়টি উত্থাপন করতে চাই যে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা কার্যত ঐ রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রকে গ্রহণ করে নেয়াই বুঝায়। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঐ একই ঘোষণা প্রদান করে যা ফেরাউন মূসা (আঃ)-এর উদ্দেশ্যে প্রদান করেছিল। ঐ ঘোষণা হচ্ছে: *রাষ্ট্র হচ্ছে সার্বভৌম। এর কর্তৃত্ব সর্বোচ্চ। এর আইন সর্বোচ্চ।* ওটা হচ্ছে শির্ক! যখন মানুষজন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নির্বাচনে ভোট দেয়, তখন তারা এব্যাপারটা মেনে নেয় যে, রাষ্ট্র হচ্ছে সার্বভৌম। সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের ব্যাপারে রাষ্ট্রের দাবী তারা মেনে নেয় এবং তারা এর আইনকে সর্বোচ্চ আইন হিসেবে মেনে নেয়। অতএব, মুমিনগণ যখন ঐ ধরনের নির্বাচনে ভোট দেয়, তখন তারা শির্ক করা থেকে বাঁচতে অক্ষম হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে যখন বিশ্বাসীরা কোন নির্বাচনে ভোট দেয়, তখন তাদের একটা রাজনৈতিক দলের পক্ষে ভোট দিতে হয়। সরকারে গিয়ে ঐ দল যদি ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতা, আল্লাহ্ তা'আলা যা কিছুকে হারাম করেছেন তাকে হালাল বলে ঘোষণা করে, অথবা ঐ ধরনের কোন আইন প্রণয়ন করে, তাহলে সেই সরকার শির্ক করল। সারা পৃথিবী জুড়ে আজ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের সরকারগুলি ও পার্লামেন্টগুলি ইতোমধ্যেই আল্লাহ্ যেসব জিনিসকে *হারাম* ঘোষণা করেছিলেন, তার প্রায় সবকিছুই *হালাল* ঘোষণা করেছে। যখন বিশ্বাসীরা এমন রাজনৈতিক দল বা সরকারের পক্ষে ভোট প্রদান করে, যারা ইতোমধ্যেই শিরকের উপর শির্ক করেছে, ঐ ধরনের ভোট তখন এটাই প্রতীয়মান করবে যে, তারা ঐ সব মানুষকে তাদের উপর শাসন প্রতিষ্ঠার যোগ্য মনে করেন। এভাবেই বিশ্বাসীগণ শির্ক, কুফর, জুলুম ও ফিস্ক-এ তাদের অনুসরণ করেন!

তৃতীয়ত, এই পদ্ধতিতে ইসলামের আশীর্বাদপ্রাপ্ত রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুন্নাতের খেলাপ এবং পরিত্যাগ ঘটে ।

আজকের পৃথিবীর রাজনৈতিক দলগুলো ও সরকারগুলো এমন সব মানুষ দ্বারা গঠিত যারা অবজ্ঞাভরে আল্লাহ্ যা কিছুকে *হারাম* বলে ঘোষণা করেছেন, তাকে *হালাল* ঘোষণা করা অব্যাহত রেখেছে। এই অধ্যায়ে আমরা তার বহু উদাহরণ তুলে

ধরেছি। বিশ্বাসীরা যখন জাতীয় নির্বাচনে ঐ ধরনের দলকে ভোট দেয় এবং তারপরে ঐ ধরনের দলকে তাদের শাসন করার যোগ্য বলে মনে করে, তখন বিশ্বাসীগণের একটু অবকাশ নিয়ে ভেবে দেখা উচিত যে, ঐ ধরনের পদক্ষেপের বাস্তব ফল কি দাঁড়াবে। যখন কোন জনগোষ্ঠী অবহেলা ভরে *হারাম* কর্মে লিপ্ত থাকাকে অব্যাহত রাখে, তখন তাদেরকে ভয়ঙ্কর মূল্য পরিশোধ করতে হয়। আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্ব যে ইতোমধ্যেই ঐ ধরনের মূল্য পরিশোধ করে চলেছে, সেটা দিবালোকের মত স্পষ্ট। সেটা তাহলে কি?

فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٦٦﴾

"... আর তারপরে যখন তারা অবহেলা ভরে তাই করতে থাকল যা তাদের করতে নিষেধ করা হয়েছিল, তখন আমি নির্দেশ দিলাম (অর্থাৎ তাদের জন্য নির্ধারিত করলাম) যে তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও!"

(কুর'আন, সুরা আ'রাফ ৭:১৬৬)

এর নিহিতার্থ এই যে, তারা এখন বানরের মত জীবন যাপন করবে, নিজেদের প্রবৃত্তি ও আবেগের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে তারা এতই অক্ষম হবে যে 'শেষ সময়' আসতে আসতে তারা জনসমক্ষে গাধাদের মত যৌন-সংসর্গে লিপ্ত হবে।

আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সুদের ভিত্তিতে অর্থঋণ দানকে বৈধ করেছে। সারা বিশ্ব জুড়ে আরও বেশী হারে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ইতোমধ্যেই জুয়া (ও লটারী), নেশাদ্রব্যের ব্যবহার ও বিক্রি, শুকরের মাংস, কাগজের মুদ্রার ব্যবহার (যা প্রতিনিয়ত তার মূল্য হারাচ্ছে, এবং যখন তা মূল্য হারায়, তখন জনসাধারণের সম্পদ কার্যত চুরি হয়ে যায় এবং তারা শেষ পর্যন্ত 'শ্রম-দাসত্বে' আবদ্ধ হয়), ইত্যাদিকে বৈধ করেছে। গর্ভপাত, সমকামিতা, পরকীয়া-সংসর্গ এবং ব্যভিচার এ সবই আজ বৈধ। যারা তাদের শিশু বিক্রি করতে চান, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বিজ্ঞাপন দেয়া ব্যবসাও আজ যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে। এমনকি ঐ সমস্ত মানুষের জন্য ভ্রাম্যমাণ কনডম ডেলিভারী সার্ভিস রয়েছে, যারা হঠাৎ পাওয়া একটা সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চান। সারা পৃথিবী জুড়ে বেশীর ভাগ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রই এখন আর আল্লাহ্‌র ঐ আইনকে স্বীকৃতি দেয় না, যাতে একজন পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে একজন কন্যার দ্বিগুণ সম্পদ লাভ করে। তারা ঘোষণা করে যে ঐ ধরনের আইন নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক এবং তারা তাদের নিজস্ব আইন প্রতিষ্ঠা করে, যেগুলোকে তারা আল্লাহ্‌র আইনের চেয়ে বেশী সুবিচারের বলে দাবী করে। আসলে তাদের আইন কোন আইনই না। ইচ্ছা করলে একজন মানুষ তার নিজের স্ত্রী ও সন্তানকে কিছু না দিয়ে তার সমগ্র সম্পত্তি একটি গাধাকে দিয়ে যেতে পারে! আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র একই সময়ে একজন পুরুষের একাধিক নারীকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ করেছে, কেননা তারা দাবী করে যে ঐ ধরনের ব্যাপার নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক হবে।

বরং তারা এটা বাধ্যতামূলক করেছে যে একজন পুরুষের একই সময়ে যেন একজনের বেশী স্ত্রী না থাকে এবং তারা দাবী করে যে, এতে আল্লাহ্‌র আইন নারীর বিরুদ্ধে যে অবিচার করেছে, তা দূর হয়। এই বিকল্প ধারার ফলশ্রুতিতে যে যৌন-বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, তা বিয়ের ধারণাকেই বিদ্রূপের দৃষ্টিতে দেখে! একজন স্ত্রীর তার স্বামীর প্রতি বাধ্য থাকার কোন আইনগত বা নৈতিক বাধ্যবাধকতা এখন আর নেই, কেননা তা নারীপুরুষের সমতার নিরীখে বৈষম্য বলে গণ্য হবে। আধুনিক, অবিশ্রান্তভাবে ধর্ম-বিমুখ, এবং অসাধারণ রকমের চটকদার ইউরো-বিশ্বের চেয়ে আর কোন অদ্ভূত বিশ্বে, সূর্য এর আগে উদিত হয়নি, আর সেটা নিশ্চিতভাবেই একটা অশুভ লক্ষণ!

ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মের সনাক্তকারী বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, তাতে কুফ্‌র বা শির্‌কের কোন স্থান নেই। তথাপি নতুন ও নিশ্চিতভাবে ধর্ম-বিমুখ ইউরো-খৃস্টান সভ্যতা — যা এখন আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা নামে পরিচিত — এর ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক ব্যবস্থা কুফ্‌র ও শির্‌কের উপর প্রতিষ্ঠিত। জাতিসংঘ নামক সংস্থাটিও ঠিক একই ধরনের শিরকের উপর প্রতিষ্ঠিত। জাতিসংঘ সনদ ঘোষণা করে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা *আল-আকবার* নন! জাতিসংঘ সনদের ২৪ ও ২৫তম অধ্যায় ঘোষণা করে যে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার সকল ব্যাপারে পৃথিবীতে নিরাপত্তা পরিষদই হচ্ছে সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী। অন্যভাবে বলতে গেলে নিরাপত্তা পরিষদের কর্তৃত্ব, আল্লাহ্‌ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর কর্তৃত্বের উপরে। ওটা হচ্ছে শির্‌ক।

'পবিত্রভূমিতে' একটা আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা মেনে চলার বনী ইসরাঈলী অবস্থানকে আমরা তাহলে কিভাবে ব্যাখ্যা করব? আর গোটা মুসলিম বিশ্ব জুড়ে (তুরস্কের প্রজাতন্ত্র, সৌদি আরবের রাজতন্ত্র, পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র, মালয়েশিয়া রাষ্ট্র ইত্যাদিতে) খেলাফতের (الخلافة) বৈধ বিকল্প হিসেবে, আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে মেনে নেয়ার ব্যাপারটাকেই বা আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব? আলোচনার এই পর্যায় বোধ করি খেলাফত কী ছিল এবং তার সাথে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পার্থক্যটা কোথায় তা ব্যাখ্যা করার সঠিক মুহূর্ত এসে গেছে। আজকের পৃথিবীর অজ্ঞতা এমনই যে বহু মুসলিমেরও এ ব্যাপারে কোন চেতনা নাই।

খেলাফত ও আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র

ইসলামি খেলাফতের ধারণার অন্তর্গত ছিল এমন একটা রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যা আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব, সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব ও তাঁর আইনকে মর্যাদা দিত এবং হারামকে হারাম হিসেবে ও হালালকে হালাল হিসেবে বলবৎ করত। আল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌র

রাসূল (সাঃ) ও *মুসলিমদের ভিতর যারা কর্তৃত্বের অধিকারী*, এদের সবার প্রতি আনুগত্য দাবী করার ঐশ্বরিক নির্দেশের ফলশ্রুতিতে খেলাফতের উৎপত্তি:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ

"তোমরা যারা ঈমান এনেছ শোন, আল্লাহ্‌র আজ্ঞা পালন কর, এবং তাঁর রাসূলের আজ্ঞা পালন কর, এবং তোমাদের মধ্যে তাদের (আজ্ঞা পালন কর) যারা কর্তৃত্বের উপর বহাল রয়েছে. . ."।

(কুর'আন, সুরা নিসা ৪:৫৯)

ইসলাম খণ্ডিত আনুগত্যকে স্বীকার করে না, অর্থাৎ, রাষ্ট্রের প্রতি চূড়ান্ত আনুগত্যের পাশাপাশি আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতিও চূড়ান্তভাবে অনুগত থাকা যায়, এই ধারণা ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। দুটো জগতকে (ধর্মের জগত ও রাজনীতির জগত) পরস্পর থেকে আলাদা করা যাবে না, কেননা পবিত্র কুর'আনের ঘোষণা রয়েছে, *"আল্লাহ্‌ হচ্ছেন আদি ও অন্ত, প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান।"* (কুর'আন, সুরা হাদীদ ৫৭:৩)। আসলে চূড়ান্ত আনুগত্য কেবলমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্য, রাষ্ট্রের জন্য নয়। কেননা পবিত্র কুর'আন মুমিনদেরকে ঘোষণা দিতে বলেছে:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

"বল: আমার নামায এবং আমার কোরবানী এবং আমার বেঁচে থাকা এবং আমার মৃত্যুবরণ সবই বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য. . .।"

(কুর'আন, সুরা আন'আম ৬:১৬২)

ওসমানী খেলাফতকে যখন আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানান হল ও তাকে ধ্বংস করা হল, ধরে নিতে হবে তখনি ইসলামি নমুনার রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা ইউরোপের হাতে ধ্বংস হয়ে গেল। ইউরোপ আরো এগিয়ে গিয়ে নিশ্চিত করল যে, ইসলামি খেলাফত যেন আর কখনই পুনরুদ্ধার করা না যায়। হিজাযে সৌদি আরবের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের স্থাপনায় সহায়তা দিয়ে, আর তারপরে ঐ রাষ্ট্রের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিয়ে অর্থাৎ তার টিকে থাকা নিশ্চিত করে ইউরোপ ঐ কার্য সমাধা করল। (আমাদের গ্রন্থ: The Caliphate, the Hejaz and the Saudi-Wahhabi Nation State দেখুন)। দুটি কারণে খেলাফতের পুনরুদ্ধার কখনই সম্ভব নয়। প্রথমত, সৌদি-ওহাবী শাসকগোষ্ঠী, যারা পবিত্র ঘর দুটি, এবং হিজায ও হজ্জকে নিয়ন্ত্রণ করে, তারা কখনই খেলাফতের দাবী উত্থাপন করবে না। দ্বিতীয়ত, যতদিন তারা পবিত্র ঘর দুটি, এবং হিজায এবং হজ্জকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে, ততদিন অন্য কেউ খেলাফতের দাবী করতে পারে না!

ইউরোপ কেন ইসলামি খেলাফতকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিল এবং কেন তা ধ্বংস করেছিল তা ব্যাখ্যা করতে চাইলে তার পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ পাওয়া যাবে। প্রথম কারণটি অবশ্যই 'পবিত্রভূমি'-কে মুক্ত করার এবং ঐ ভূমিতে ইহুদীদের প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করার যে লক্ষ্য, তা হাসিল করার পথ সুগম করা। কিন্তু দ্বিতীয় কারণটি ছিল মানবকুলের উপর ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নতুন ইউরোপীয় মডেলের ভিতরে যে শির্ক নিহিত রয়েছে, তার বিশ্বজনীন বিস্তারকে সম্ভব করে তোলা। খেলাফত যখন ধ্বংস হল, তখন তার আসনেই প্রোথিত হল তুরস্কের আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। তারপর শিয়া ইসলামের প্রাণকেন্দ্রে, ধর্মনিরপেক্ষ ইরান রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ ঘটল, আর সুন্নী ইসলামের আরব প্রাণকেন্দ্রে ধর্মনিরপেক্ষ সৌদি আরব রাষ্ট্রের সৃষ্টি হল। পরিশেষে ভারতীয় মুসলিমগণও ধর্মনিরপেক্ষ পাকিস্তান প্রজাতন্ত্রকে গ্রহণ করার মাধ্যমে, সুচারুরূপে প্রতারিত হল। তৃতীয়ত, খেলাফতের ধ্বংসসাধন প্রয়োজন ছিল, কেননা তা নতুন স্রষ্টা-বিমুখ ইউরোপীয় এজেন্ডার চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঐ ইউরোপীয় চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল পৃথিবীর নিয়ন্তা রাষ্ট্র হিসাবে ইহুদী ইসরাঈল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, যা জেরুজালেম থেকে পৃথিবীকে শাসন করবে।

রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে খেলাফত অবলুপ্ত হবে। তিনি তা নিম্নলিখিত হাদীসে বলেছেন:

"যখন মরিয়মের পুত্র (আঃ) তোমাদের মাঝে অবতীর্ণ হবেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে (অর্থাৎ তিনি একজন মুসলিম হবেন) তোমাদের ইমাম হবেন (অর্থাৎ আমীরুল মুমেনিন বা খলীফা), তখন তোমরা কেমন থাকবে?"

(সহীহ বুখারী)

এই হাদীস তিনটি বিষয়কে পরিস্কার করে দেয়:

প্রথমত, এটা জানিয়ে দেয় যে শেষ সময়ে পৃথিবীতে খেলাফত বিরাজ করবে। তা একই সাথে আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপোষক যে, খেলাফত পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হবে কিন্তু তারপর আবার একদিন পুনরুদ্ধার হবে। দ্বিতীয়ত, খেলাফত পুনরুদ্ধার হওয়ার পূর্বে একটা সময়ের জন্য মুসলিমগণ এমন কারো কর্তৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ ও শাসনাধীন থাকবে যারা মুসলিম নয়। আমরা আজ যে পৃথিবীতে বসবাস করছি, তার অবস্থা ঠিক তেমনই। তৃতীয়, খেলাফতের প্রত্যাবর্তন হবে মরিয়মের পুত্রের (আঃ) প্রত্যাবর্তনের সমসাময়িক এক ঘটনায়। আর আমরা যেহেতু জানি যে ঈসা (আঃ) যখন ফিরে আসবেন, তখন একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে আল্লাহ্র আইন বলবৎ করে তিনি জেরুজালেম থেকে পৃথিবীকে শাসন করবেন, তার নিহিতার্থ হচ্ছে এই যে, 'পবিত্রভূমিতে' আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ইসরাঈল সত্যিকারের ইসলামি রাষ্ট্রকর্তৃক প্রতিস্থাপিত হবে, যা ধর্মনিরপেক্ষ ইসরাঈলের যাবতীয় শির্ক থেকে মুক্ত থাকবে।

যারা জেদের বশে ধর্মনিরপেক্ষ ইসলামি রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের সাফাই গান, তাদের উচিত একটু অবকাশ নিয়ে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্‌বাণী নিয়ে ভেবে দেখা। আমাদের হিসাব অনুযায়ী খুব সম্ভবত আগামী পঞ্চাশ বছরের মাঝেই ঐ ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হবে।

আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের গুণাগুণ

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ইউরো-খৃস্টান ও ইউরো-ইহুদী জনগোষ্ঠী অথবা মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারত না, যদি না সে তার ভিতরে নিহিত কুফর ও শির্ককে কিছু প্রকাশ্য গুণাগুণের আবরণে লুকাতে পারত। সে সকল গুণাগুণ কি? ইউরো-খৃস্টান ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের প্রভাবশালী ও নিপীড়নমূলক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে এবং ইউরো-খৃস্টান চার্চের পার্থিব ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। এই [আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র] ব্যবস্থা এক নতুন ও আবেগপূর্ণ নীতিমালার মাধ্যমে সকলের জন্য সম্পূর্ণ ও অবারিত বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা, মানবাধিকার এবং সব কিছুকেই ধর্মীয় সহিষ্ণুতার সাথে মেনে নেয়ার ঘোষণা দিয়ে চার্চকে চ্যালেঞ্জ করল। সেই সাথে এমন এক রাজনৈতিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত করল, যার কারণে একই ভৌগোলিক সীমারেখার মাঝে বিভিন্ন ধর্মের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথ সুগম হয়ে গেল। এভাবে এই ব্যবস্থা, কয়েক শতাব্দী ব্যাপী যে রক্তক্ষয়ী ধর্মীয় যুদ্ধ-বিবাদ ইউরোপকে মহামারীর মত আক্রান্ত করে রেখেছিল, তার সমাপ্তি ঘটাল।

আবিষ্কারধর্মী সৃজনশীলতার মাধ্যমে সুকৌশলে, অনেকটা ঘুষ প্রদান করার মতই তারা মানবকুলের উদর ও হৃদয়ে স্থান করে নিল। তারা এমন সব জিনিসপত্র আবিষ্কার করল, ধর্মীয় বিশ্বাস নির্বিশেষে আধুনিক জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী হিসাবে যে সবকে মানবকুল সাদরে গ্রহণ করল, উদাহরণস্বরূপ বিদ্যুৎ, রেডিও, টেলিফোন, হ্যান্ডফোন, টেলিভিশন, কম্পিউটার, বিমান, মোটরগাড়ি, ফ্যাক্স মেশিন, ফটোকপি প্রযুক্তি ইত্যাদি ইত্যাদি। যখনই কেউ আধুনিকতাকে তার সমস্ত বিস্ময়কর আবিষ্কার সহ গ্রহণ করল, তখন সে তার সাথে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও ধর্মনিরপেক্ষ জীবনযাত্রাও গ্রহণ করল। সেটা কোন ছোটখাট সাফল্য ছিল না!

আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বাস্তবতা

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের এই সব প্রকাশ্য গুণাবলী [যার কিছু কিছু রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনার নগর রাষ্ট্রেও বিদ্যমান ছিল], কুফ্‌র ও শির্কের মৌলিক

ভিত্তির কোন পরিবর্তন সাধন করে নাই। আসলে ঐ আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা ধীরে ধীরে ধর্মীয় জীবনযাত্রার উপর বিরামহীন যুদ্ধ পরিচালনার মাধ্যমে তার বৈরিতার সত্যিকার প্রচ্ছন্ন কার্যক্রম প্রকাশ করতে শুরু করল। সমাজ যতই ধর্মনিরপেক্ষতা আত্মীকরণ করতে লাগল, চার্চগামী মানুষের সংখ্যা ততই উত্তরোত্তর কমতে থাকল, আর শূন্য চার্চ ও সিনাগগগুলি বিক্রি হয়ে জুয়ার আড্ডায় পরিণত হতে লাগল। বাস্তবিকই নতুন নিশ্চিতভাবে স্রষ্টা-বিমুখ ধর্মনিরপেক্ষ জগতে ধর্ম ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়া শক্তিতে পরিণত হল।

আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের গণতন্ত্র এক চিনি-আবৃত বিষ-বড়ির রূপ ধারণ করল। রাজনৈতিক গণতন্ত্র এমনভাবে কাজ করল, যাতে সুদভিত্তিক অর্থনীতির মাধ্যমে গণমানুষের উপর নিপীড়ন ও শোষণ টিকে থাকল। ঐ অর্থনৈতিক নিপীড়নের সাথে প্রায় সর্বত্রই বর্ণবাদী ও জাতিগত নিপীড়ন যুক্ত হল। দরিদ্র জনসাধারণ কখনই লুণ্ঠনজীবী উচ্চশ্রেণীর ধনীদের কাছ থেকে, সত্যিকার রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে পারল না, আর তাই যে ক্ষমতাবলে অর্থনৈতিক নিপীড়নের সমাপ্তি ঘটানো যায়, তাও কখনো তাদের হস্তগত হল না। তার কারণ ব্যয়বহুল নির্বাচন প্রচারণার সাফল্য ও বিপর্যয়ের মধ্যে যে পার্থক্য তা নির্ধারণ করে ঐ লুণ্ঠনজীবী উচ্চশ্রেণীর ধনসম্পদ। (বাইবেলের ভাষার অনুকরণে) আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ সমাজের নতুন *সুখবর* হল, *ধনীরাই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে*। আর ঠিক তাই ঘটেছে।

অ-ইউরোপীয় মানবতার উপর প্রভাব বিস্তার করতে ও তাদের মগজ ধোলাই করতে, ঐ নতুন ইউরোপ তার অপরাজেয় সামরিক শক্তি ও ভয়ঙ্কর প্রতারণার ফন্দি প্রয়োগ করতে এগিয়ে যায়। তাদের নতুন স্রষ্টা-বিমুখ রাজনৈতিক দর্শন, সার্বভৌম রাষ্ট্র সম্পর্কে তাদের স্রষ্টা-বিমুখ ধ্যান-ধারণা, শোষণ-ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, এবং নৈতিকতা-বিরোধী সংস্কৃতি শেষ পর্যন্ত বাকী পৃথিবীকেই গ্রাস করল। বলা বাহুল্য, সেটা কোন ছোটখাট সাফল্য নয়!

মুসলিমসহ বাকী মানবকুলের উপর পশ্চিমা ও ঔপনিবেশিক শাসন চাপিয়ে দেয়া হল। আর তারই মাধ্যমে ধূর্ততা ও সূক্ষ্মতার সাথে কুফর ও শির্কের উপর প্রতিষ্ঠিত নতুন স্রষ্টা-বিমুখ রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রচলন করা হল। ওসমানী ইসলামি খেলাফত ধ্বংস করা হল, এবং তার ভস্ম থেকে আধুনিক ধর্ম-বিমুখ ধর্মনিরপেক্ষ তুর্কী রাষ্ট্রের উন্মেষ ঘটল। ঠিক তেমনই আরব উপদ্বীপে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিজ হাতে প্রতিষ্ঠিত দারুল-ইসলাম ধ্বংসপ্রাপ্ত হল, আর তার ভস্ম থেকে স্রষ্টা-বিমুখ পশ্চিমের তাঁবেদার রাষ্ট্র হিসাবে (ভৌগোলিক সার্বভৌমত্ব, নাগরিকতার কড়াকড়ি ইত্যাদি সকল বৈশিষ্ট্য সমেত) আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ সৌদি আরব রাষ্ট্র বেরিয়ে এল। এভাবেই রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অশুভ ইঙ্গিতবহ ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হল। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী

করেছিলেন যে, তাঁর সম্প্রদায় (অর্থাৎ মুসলিমরা) ইহুদী ও খৃস্টানদের এমনভাবে অনুকরণ ও অনুসরণ করবে যে, যদি তারা সরীসৃপের গর্তে ঢোকে, তবে তাঁর সম্প্রদায়ও একই কাজ করবে!

এর ফলাফল দাঁড়িয়েছে এই যে, সম্মিলিতভাবে ইহুদী, খৃস্টান ও মুসলিমদের জগত সকল পরীক্ষার বৃহত্তম পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছে, এবং ন্যাক্কারজনকভাবে ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতা আল্লাহ্ তা'আলার সেই আদেশ পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে যেখানে তিনি বলেছেন:

اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾

"যা কিছু তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে নাযিল হয়েছে তাই অনুসরণ কর; আর তিনি ব্যতীত আর কোন সাথীকে অনুসরণ কর না। কত অল্পই না তোমরা তা মনে রাখ!"

(কুর'আন, সুরা আ'রাফ ৭:৩)

নতুন আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা, সংসদ ও সরকার গঠনের জন্য, এবং মাঝে মাঝে বিচারকদের নির্বাচনের জন্য, ভোটভিত্তিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটাল। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নাগরিকগণ তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস নির্বিশেষে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে ভোট দিল। এমনকি ঐ নির্বাচিত সরকার যদি এমনসব ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত হয়, যারা খোদ শয়তানকে তাদের প্রভু হিসাবে উপাসনা করে, তবু গণতান্ত্রিক নির্বাচনের নীতিমালার এটাই দাবী যে, যে সমস্ত খৃস্টান, ইহুদী ও মুসলিমগণ ঐ ধরনের নির্বাচনে ভোট দিল, তারা ঐ সরকারকে তাদের উপর শাসন করার ব্যাপারে আইনসিদ্ধ ও বৈধ বলে গ্রহণ করতে বাধ্য। ঐ সরকারের কর্তৃত্বের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে ও তাদের আনুগত্য স্বীকার করতেও তারা বাধ্য। যদি ঐ নির্বাচন এমন একটা সরকার উপহার দেয়, যাতে মূর্তিপূজক হিন্দুদের প্রাধান্য রয়েছে, যারা খোলাখুলিভাবে ঐ সকল মানুষের প্রতি বৈরীতা পোষণ করে যারা ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতার উপাসনা করে, অথবা সেই নতুন সরকার আল্লাহ্ তা'আলা যা কিছুকে 'হারাম' বলে ঘোষণা করেছেন তার সবকিছুকে 'হালাল' বলে ঘোষণা করে, তবুও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মূলনীতির দাবী অনুযায়ী, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ইহুদী, খৃস্টান ও মুসলিম নাগরিকরা ঐ সরকারকে আইনসিদ্ধ বলে স্বীকৃতি দিতে, তার কর্তৃত্বের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে, এবং তার আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য হবে।

কিতাবসমূহে (তৌরাত, ইঞ্জীল, কুর'আন) এবং নবীদের সুন্নাহ্ অর্থাৎ তাদের উদাহরণ বা আচরণের মধ্যে এমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না যার ভিত্তিতে ইহুদী, খৃস্টান, মুসলিম ইত্যাদি জনগণ ঐ ধরনের নির্বাচনে অংশগ্রহণকে যুক্তিযুক্ত মনে করতে

পারে, এবং তাদের উপর শাসন করার জন্য ঐ ধরনের সরকারকে বৈধ মনে করতে পারে। বরং এর বিপরীতে এধরনের আচার-আচরণের বিরুদ্ধে অত্যন্ত স্পষ্ট তিরষ্কার রয়েছে। অথচ বিখ্যাত ফিক্‌হ্ শাস্ত্রবিদ, ড. তাহা জাবির আল-আলওয়ানি এমনই একটা ফতোয়া প্রদান করলেন (যা 'একচক্ষু'-বিশিষ্ট মুসলিমগণ সাদরে গ্রহণ করলেন), যাতে তিনি ২০০০ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মুসলিমদের ভোট প্রদানকে *ওয়াজিব* (অবশ্য করণীয়) বলে ঘোষণা করলেন। তাদের বেশীর ভাগই জর্জ বুশের পক্ষে ভোট দেন যার ফলে তাদের মুখে চুনকালি পড়েছে। তারা যদি তার প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যালবার্ট গোরের পক্ষে ভোট দিতেন তাতেও পরিস্থিতি ভিন্ন কিছু হত না! তারা তখন বুশের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন 'পবিত্রভূমিতে' সেই সকল মুসলিমদের জন্য অশ্রু বিসর্জন দেন যারা বুশ সরকারের অনড় সমর্থনে ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের অবিরাম ও নিষ্ঠুর নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন। এই নির্যাতন উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেয়ে চলেছে! তারা আফগানিস্তানের মুসলিমদের জন্য অশ্রু বির্সজন দেন, যাদের ঐ একই বুশ প্রশাসন কোন দয়া-মায়া ছাড়া বর্বরোচিতভাবে হত্যা করেছে। (দেখুন দ্বিতীয় সংযোজন: "আমেরিকার উপর আক্রমণের প্রেক্ষিতে মুসলিম প্রতিক্রিয়া")।

বিশ্বাসীদের জন্য আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নির্বাচন-সংক্রান্ত রাজনীতির বিকল্প

ইহুদী, খৃস্টান ও মুসলিম পাঠক জিজ্ঞাসা করতে পারে: ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে বিশ্বাসীদের জন্য নির্বাচন-সংক্রান্ত রাজনীতির কোন বিকল্প আছে কি? উত্তর হচ্ছে: হ্যাঁ! আছে। বিকল্প হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতা আল্লাহ্ তা'আলার সার্বভৌমত্বকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রাম করে যাওয়া – তাঁর কর্তৃত্বকে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব এবং তাঁর আইনকে সর্বোচ্চ আইনের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রাম করে যাওয়া। সকল সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার তুলনায় এটাই হচ্ছে সবচেয়ে মহৎ, এটা এমনই একটা সংগ্রাম, যা পৃথিবীর শেষ সময় পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়া অবশ্য করণীয়। এই সংগ্রামে সাফল্য বা ব্যর্থতা কোন বিবেচনার বিষয় নয়। অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা এই নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, ঐ সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয়ের আগে সময়ের সমাপ্তি ঘটবে না।

বিশ্বাসীদের জন্য বিকল্প হচ্ছে আল্লাহ্ যাকে হালাল করেছেন, তাকে হালাল বলে তুলে ধরা, আর আল্লাহ্ যাকে হারাম করেছেন, তাকে হারাম বলে গণ্য করা, তা করতে গিয়ে যত মূল্যই দিতে হোক না কেন। এ ছাড়াও যখন কোন জনগোষ্ঠী শির্ক, কুফ্‌র, জুলুম ও ফিস্‌ক-এ জড়িয়ে পড়ে, বিশ্বাসীরা ঐ ধরনের আচরণের নিন্দা করবেন, বিরোধিতা করবেন, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন এবং ঐ জনগোষ্ঠী থেকে নিজেদেরকে পৃথক রাখার কামনা করে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করবেন:

فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٥﴾

"সুতরাং এইসব পাপী বিদ্রোহীদের কাছ থেকে আমাদেরকে দূরে রাখুন!"
(কুর'আন, সুরা মায়িদাহ্ ৫:২৫)

পবিত্র কুর'আন মুমিনদের মিশনকে *সৎকাজে আদেশ* ও *মন্দকাজে নিষেধের* মিশন বলে উল্লেখ করে। আল্লাহ্ তা'আলার সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার ও তাঁর কর্তৃত্ব ও আইনের সর্বোচ্চ অবস্থান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম যদি কোন ভূমিতে সফল হয়, তবে সেই ভূমি দারুল-ইসলামে পরিণত হবে। মুসলিমরা ঐ ভূমি শাসন করবে। কিন্তু তার বিকল্প হিসাবে, একটি বহুজাতিক রাষ্ট্রের মডেল চিন্তা করা যায়, যেখানে মুসলিমরা অমুসলিমদের সাথে রাজনৈতিক সমতার ভিত্তিতে এবং এমন এক সাংবিধানিক চুক্তির ভিত্তিতে – যা মুসলিমদের নিজেদের উপর আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ও তাঁর কর্তৃত্ব ও আইনের সর্বময় ক্ষমতার স্বীকৃতি দেবে – একটি ভূখণ্ডের উপর নিয়ন্ত্রণ ভাগাভাগি করে নেবে। মদীনার নগর রাষ্ট্রে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) ঐ ধরনের এক বহুজাতিক মডেল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যেখানে মুসলিম, ইহুদী এবং মূর্তিপূজকরা রাজনৈতিক সমতার ভিত্তিতে ভূখণ্ড এবং রাষ্ট্রের উপর নিয়ন্ত্রণ ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন।

ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মকে গ্রহণ করবে না প্রত্যাখ্যান করবে, সে ব্যাপারে মানবকুলের স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু একবার ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মকে গ্রহণ করে নেয়ার পর যদি সরকার বেছে নেবার স্বাধীনতা থাকে তাহলে, বিশ্বাসীরা নিজেদের উপর শাসন করার জন্য শুধুমাত্র বিশ্বাসীদেরকেই বেছে নিতে পারে। যখন কোন ভূখণ্ডে তাদের ঐ স্বাধীনতা হরণ করা হয়, তখন তাদের উচিত এমন ভূখণ্ডের খোঁজ করা যেখানে ঐ স্বাধীনতা রয়েছে, এবং তারপর সেখানে হিজরত করা! আর সেজন্যই ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতা আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বাসীদেরকে আদেশ করেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্র আনুগত্য কর, এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, এবং তোমাদের মধ্যে যাদের হাতে কর্তৃত্ব রয়েছে তাদের (আনুগত্য কর) . . ."।
(কুর'আন, সুরা নিসা ৪:৫৯)

ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মে যারা বিশ্বাসী, তাদের যদি কোথাও নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠা করার মত স্বাধীনতা অবশিষ্ট না থাকে এবং সেকারণে যদি তাদেরকে অবিশ্বাসীদের অধীনে বসবাস করতে হয়, তাহলে তারা ততদিন সেই *অধীনতা* মেনে চলবে যতদিন না তাদের উপর শাসন করার জন্য বিশ্বাসীদেরকে বেছে নিতে পারছে। তবে শর্ত এই যে, অবিশ্বাসী শাসনের অধীনতা মেনে নেয়ার সাথে ঐ অবিশ্বাসী সরকার

প্রতিষ্ঠায় তাদের কোন ভূমিকা থাকবে না। বিশ্বাসীগণ ধর্মীয় স্বাধীনতার শর্তে, ঐ ধরনের শাসনের কাছে নিজেদের 'সমর্পণ' করবে। অর্থাৎ এমন কিছু তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না যা ইব্রাহীমের (আঃ)-এর বিধাতার আইনের বিরোধীতা করে; উদাহরণ স্বরূপ, যুদ্ধ করার (আল-কিতাল) ধর্মীয় অধিকার আর সেই প্রয়োজনে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ। (বর্তমানে মুসলিমদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে থাকা এবং সেই সাথে ঈমান সংরক্ষণ করা অসম্ভব। আর তাই এই লেখক এখন নতুন বাসস্থানের সন্ধানে আছেন)। ঐ ধরনের সরকার যদিও তাদের 'নিজেদের' সরকার হবে না, তবুও তারা ঐ সরকারকে যা কিছু সত্য, মঙ্গলজনক ও সৎ সেসব ব্যাপারে উপদেশ ও সহায়তা দিতে পারে এবং একই সময়ে যা কিছু মিথ্যা, মন্দ ও ক্ষতিকর সেসব ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে সেগুলোকে প্রতিরোধ করতে পারে এবং সেগুলো থেকে বিরত থাকতে পারে।

এটা আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য যে, তা কখনই নির্বাচনকে অন্য কোন ব্যবস্থার রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হবার কাজে ব্যবহৃত হতে দেবে না; যা ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতার সার্বভৌমত্ব ও তাঁর সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব ও তাঁর আইনকে স্বীকৃতি দেয়। নির্বাচনী প্রক্রিয়া বানানোই হয়েছিল স্রষ্টা-বিমুখ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আনুগত্য করার জন্য।

রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) ঘোষণা করেছিলেন যে, কুফরের জগত কার্যত একটি একতাবদ্ধ শক্তি (*আল-কুফরু মিল্লাতুন ওয়াহিদা*)। এবং এই মুহূর্তে পৃথিবীতে ঠিক এই ব্যাপারটাই আত্মপ্রকাশ করেছে। ইহুদী ও খৃস্টানদের এ ব্যাপারটা নিয়ে ভেবে দেখা উচিত যে, 'নির্বাচন প্রক্রিয়াকে' কাজে লাগিয়ে আলজিরিয়ার মুসলিমগণ যখন ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করল এবং জাতীয় নির্বাচনে শতকরা ৮৫ ভাগ ভোট পেয়ে জয়লাভ করল, স্রষ্টা-বিমুখ পৃথিবীর সবাই নিষ্ঠুর ভাবে ভোটারদের ঐ শতকরা ৮৫ ভাগকে শায়েস্তা করতে এগিয়ে এল, যারা স্রষ্টা-বিমুখ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ভিত্তি পরিবর্তন করতে চাওয়ার সাহস দেখিয়েছিল। ঐ দুর্ভাগ্যজনক নির্বাচনের বহুবৎসর পরেও, গোটা স্রষ্টা-বিমুখ ধর্মনিরপেক্ষ পৃথিবী আলজিরিয়ার নিষ্ঠুর ও নির্লজ্জ ধর্ষণকে অব্যাহত রেখেছে।

সেজন্যই শির্কের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মনিরপেক্ষ ধাঁচের কোন রাষ্ট্রের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভোট দেয়া এবং তাকে বৈধতা দানের চেয়ে বরং মুসলিমদের উচিত ঐ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদেরকে শির্ক থেকে বাঁচানো। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ঐ যুক্তি উত্থাপন করা উচিত যে, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বহুজাতিক রাষ্ট্রের মডেল আধুনিক স্রষ্টা-বিমুখ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের তুলনায় শ্রেয়।

আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বিশ্বজনীন শির্কের ব্যাপারে কুর'আনিক ব্যাখ্যা

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, একমাত্র কুর'আনই ঐ বিশাল রাজনৈতিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যা দিতে পারে এবং দিয়েছে, যা ইউরো-খৃস্টান ও ইউরো-ইহুদী জগতকে গ্রাস করেছে এবং যা বাকী মানবতাকেও গ্রাস করেছে। সেই ব্যাখ্যাটা কি?

পবিত্র কুর'আন এই শিক্ষা দেয় যে আল্লাহ্ তা'আলা যখন নির্ধারণ করবেন, তখন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটবে, অর্থাৎ মানবকুল ও পৃথিবীর উপর 'শেষ দিবস' নেমে আসবে। যাহোক, ঐ শেষ দিবস বাস্তবতা লাভ করার পূর্বে, একটা শেষ যুগ আসবে যা আল্লাহ্র তরফ থেকে বহুবিধ নিদর্শনে পরিপূর্ণ থাকবে, যা ইঙ্গিত করবে যে সেটাই হচ্ছে শেষ যুগ। শেষ যুগে যে সমস্ত ঘটনাবলী ঘটবে তার মাঝে রয়েছে পৃথিবীতে ভণ্ড-মসীহ্ দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ-মাজুজের মুক্তি লাভ। পৃথিবীতে মুক্তিলাভ করে তারা শেষ পর্যন্ত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করবে, এবং পৃথিবীতে মানবকুলের এই অদ্বিতীয় এবং অশুভ রূপান্তরকে বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে তারাই হবে প্রধান পরিকল্পনাকারী। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) ঘোষণা করেছেন যে 'ভণ্ড-মসীহ্' দাজ্জালের যুগে পৃথিবী ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক নিপীড়ন সমেত বিশ্বজনীন সুদের প্রচলন দেখবে। ঐ যুগটা একটা কুফরের যুগও হবে, কারণ দাজ্জালের দুই চোখের মাঝখানে 'কাফির' কথাটি লিখিত থাকবে। দাজ্জাল যেহেতু বিধাতার ভূমিকায় অভিনয় করবে, এবং মানবকুল ধোঁকা খেয়ে তাকে সেভাবেই গ্রহণ করবে, সুতরাং ঐ যুগটা হবে শির্কের যুগ। দাজ্জাল যে আধুনিক স্রষ্টা-বিমুখ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং এর নির্বাচনী রাজনীতির ব্যবস্থার পেছনে মহাপরিকল্পনাকারী, সে ব্যাপারটি এই লেখকের কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট।

পবিত্র কুর'আন ও হাদীসের উপর ভিত্তি করে এই লেখক এই মর্মে তার যুক্তি উত্থাপন করেছেন যে, আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নির্বাচন রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা শির্ক ও কুফরের সামিল। এই গ্রন্থে প্রকাশিত মতামতের সাথে পণ্ডিতগণ যদি একমত না হন, তবে পবিত্র কুর'আন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে তারা যেন তাদের যুক্তি উপস্থাপন করেন। তাদের উচিত সুনির্দিষ্টভাবে ঐ সমস্ত পরিস্থিতিকে চিহ্নিত করা, যখন জাতীয় নির্বাচনে ভোট দেয়াটা বিশ্বাসীদের জন্য হালাল হবে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন বিশ্বাসী কি মূর্তিপূজক কোন হিন্দু অথবা ইসলামের কোন শত্রু, একজন মিথ্যুক, মদ্যপায়ী, চোর, ব্যভিচারী, লম্পিকারী, ব্যাঙ্কের অংশীদার বা ব্যাঙ্কের পরিচালক – এ ধরনের কারো পক্ষে ভোট দিতে পারে? সে কি কোন বর্ণভিত্তিক সংহতির ভিত্তিতে অথবা এমন কোন চুক্তির ভিত্তিতে ভোট দিতে পারে যে: *"আমরা তোমার কাছ থেকে এমন এমন সুবিধা লাভ করার শর্তে তোমাকে ভোট দেব?"* 'পবিত্রভূমিতে' ও মসজিদ আল-আক্সায় অব্যাহত

দখলদারিত্ব ও নিপীড়নে নিয়োজিত যায়োনিস্ট রাষ্ট্র ইসরাঈলকে সমর্থন দিতে সংকল্পবদ্ধ এমন কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে কি সে ভোট দিতে পারে? একইভাবে যে রাজনৈতিক দল সমকামীতা ও গর্ভপাতের বৈধকরণকে সমর্থন করে তাদেরকে কি সে ভোট দিতে পারে?

রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) ঘোষণা করেছিলেন: *'যা কিছু হালাল তা পরিস্কার এবং যা কিছু হারাম তাও পরিস্কার, যা কিছু সন্দেহজনক তা থেকে বিরত থাক'*। আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা হালাল কিনা তা ঘোষণা করার দায়দায়িত্ব আলেমগণের উপর বর্তায়, যারা মুমিনদের পথপ্রদর্শক। একটা সন্তোষজনক হ্যাঁ-বোধক উত্তর দিতে হলে আলেমগণকে প্রমাণ করতে হবে যে ভোটদানের কাজটি হারামও নয় এবং সন্দেহজনকও নয়। আর তাদের ঐ মতামত অবশ্যই পবিত্র কুর'আন এবং সহীহ হাদীসের প্রামাণিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

'পবিত্রভূমিতে' ধর্মনিরপেক্ষ ইসরাঈল রাষ্ট্র

'পবিত্রভূমিতে' যে ধর্মনিরপেক্ষ ইসরাঈল রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার বৈধতা নিয়ে একটা উপসংহারে পৌঁছান এখন আমাদের পক্ষে সম্ভব। ইসরাঈল রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় যায়োনিস্ট আন্দোলনের সাফল্য কি *"সত্য"* সম্বন্ধে ইহুদীদের দাবীর যথার্থতাকে প্রমাণ করে? সেটা কি আল্লাহ্‌র দয়ার নিদর্শন ছিল?

যে কোন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মতই, ধর্মনিরপেক্ষ ইসরাঈল রাষ্ট্র একটা ঘৃণ্য ব্যাপার, কেননা তা শির্‌কের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মের সবচেয়ে মৌলিক বৈশিষ্ট্য এই যে, তা শির্‌কমুক্ত। 'পবিত্রভূমির' উত্তরাধিকারের ব্যাপারে যে ঐশ্বরিক শর্ত রয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষ ইসরাঈল তা একেবারে নিশ্চিতভাবেই লঙ্ঘন করেছে। 'পবিত্রভূমিতে' তাই সে টিকে থাকতে পারে না। সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) ব্যাখ্যা করেছেন যে, খোরাসান থেকে আসা এক মুসলিম বাহিনী ইসরাঈল রাষ্ট্রকে ধ্বংস করবে। ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশের পর এবং সেই সাথে ইসলামি খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর, ঐ মুসলিম বাহিনী বেরিয়ে আসবে:

"আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন যে, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: খোরাসান (আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং স্বল্পমাত্রায় ইরান ও মধ্য এশিয়ার মাঝে বিভক্ত অঞ্চলসমূহ নিয়ে গঠিত একটি এলাকা) থেকে কালো পতাকা দৃশ্যমান হবে, এবং কোন শক্তি তাদেরকে Aelia (জেরুজালেম) পৌঁছান পর্যন্ত রোধ করতে পারবে না।"

(সুনান, তিরমিজী)

ইসলামি খেলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা তাই ইসরাঈল রাষ্ট্রের ধ্বংস সাধন করবে। এটা হবে ঐ ধরনের তৃতীয় ও শেষ ঘটনা। প্রথম ঘটনায় একটা ব্যবিলনীয় বাহিনী ইসরাঈলকে ধ্বংস করার কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল। দ্বিতীয় ঘটনার বেলায় তা ছিল এক রোমান বাহিনী। এবং এখন শেষবারের মত সেটা হবে এক মুসলিম বাহিনী।

'পবিত্রভূমিতে' ইসরাঈল রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা আল্লাহ্‌র দয়ার একটা ব্যাপার ছিল এবং তা *সত্যের* উপর ইহুদীদের দাবীর যথার্থতা প্রমাণ করে — এ সকল দাবীকে প্রত্যাখ্যান করার আরও বহুবিধ রাজনৈতিক কারণ রয়েছে। প্রথমত ধর্ম-বিমুখ আধুনিক ইউরোপের জনগণ, যারা একটা ক্ষয়িষ্ণু জীবন যাপন করে এবং যারা অন্যদের উপর নিপীড়ন চালায়, ইহুদীদের কাছে আল্লাহ্‌র দয়া পৌঁছানোর জন্য এবং *সত্যের* যথার্থতা প্রমাণের জন্য এই ধরনের মানুষদেরকে 'মাধ্যম' হিসাবে ব্যবহার করা হবে — মৌলিকভাবে একটা বিপরীতধর্মী কল্পনা। 'মাধ্যম' এবং 'পরিণাম', এদুটোর মাঝে সামঞ্জস্য থাকতে হবে।

দ্বিতীয়ত যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইসরাঈল পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল, তার সাথে 'পবিত্রভূমি' থেকে এমন এক জনগোষ্ঠীর বিতাড়ন সংশ্লিষ্ট ছিল, যারা ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতার উপাসনা করত। তারা ইহুদী ছিল না, এটুকু ছাড়া তাদের বহিষ্কারের আর কোন কারণ ছিল না। তাদের ঘরবাড়ি থেকে এবং 'পবিত্রভূমি' থেকে বহিষ্কারের পর পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে, তারা শরণার্থী শিবিরে বসবাস করে আসছে। এটি একটি নিষ্ঠুর নির্যাতন। এছাড়া ইসরাঈল রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকে 'পবিত্রভূমি' এবং এর আশেপাশে বসবাসরত মুসলিম এবং খৃস্টান উভয় শ্রেণীর আরবদের বিরুদ্ধে অত্যাচার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। এরকম নির্যাতনের সাথে আল্লাহ্‌র দয়ার ব্যাপারটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ!

তৃতীয়ত, যারা ইসরাঈল রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছিল, তাদের চেতনায় পবিত্রতার প্রতি স্পষ্টতই কোন সম্মানবোধই ছিল না। ইসরাঈল রাষ্ট্রের ধর্ম-বিমুখতা, পাপাচার, যৌন-অনৈতিকতা ও ক্ষয়িষ্ণুতা স্রষ্টা-বিমুখ ইউরোপীয় সভ্যতার চেয়ে কোনভাবেই ভিন্নতর কিছু নয়। এটাকে আল্লাহ্‌র করুণা বলে ধারণা করা যায় না। বাস্তবিকই ধর্মনিরপেক্ষ ইসরাঈল রাষ্ট্র 'পবিত্রভূমিতে' এমন অতুলনীয় পাপাচার এবং ক্ষয়িষ্ণুতা আমদানী করেছে যে, সেখানে এখন যৌন-দাসত্বও বিরাজ করছে। এটা সদাচারের সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপার। আসলে 'পবিত্রভূমিতে' এখন যা রয়েছে, তা হচ্ছে এক পৌত্তলিক (pagan) সমাজ।

'পবিত্রভূমিতে' পৌত্তলিক রাষ্ট্র

ইহুদী ইসরাঈল রাষ্ট্র আসলে একটা অবিশ্বাসী রাষ্ট্র, যা তার কর্মে ও নীতিতে অবিশ্বাস প্রদর্শন করে। যে কোন ইহুদী, যে বিশ্বাস করে যে 'পবিত্রভূমিতে' ইহুদীদের প্রত্যাবর্তন ও ইসরাঈল রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার ঘটনাবলী, স্বর্ণযুগে ফিরে যাওয়াকে ও সত্য বলে ইহুদীধর্মের স্বীকৃতির দিকে অগ্রগতিকে নির্দেশ করে, তার অবশ্যই জেরুজালেম পোস্টে প্রকাশিত নিম্নলিখিত সাম্প্রতিক প্রবন্ধ দেখে আঁতকে উঠার কথা যা নিশ্চিত করে যে, 'পবিত্রভূমিতে' বর্তমানে পৌত্তলিক (pagan) বা অবিশ্বাসী জীবনযাত্রা বিরাজ করছে:

"পুলিশ পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে দু'শোরও বেশি পতিতালয়, দু'শোরও বেশি যৌনসজ্জা, এবং অসংখ্য পরিমাণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যারা সারাদেশে বারবণিতা যোগান দেয়। নারীর মর্যাদা সংক্রান্ত knesset [১] কমিটির সভাপতি Yael Dayan অনুমান করেন যে, প্রায় দশ লক্ষ মানুষ প্রতি মাসে বাজারের সামনে বা রাস্তার ধারে কর্মরত অথবা উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গদানকারীনী হিসাবে কর্মরত বেশ্যাদের কাছে গমন করে। তেল আবিবের পুরনো কেন্দ্রীয় বাসস্টেশনের আশেপাশের ব্লকে প্রায় ৫০ থেকে ৬০টি 'হেলথ ক্লাব' তৎপর রয়েছে। এছাড়া হাইফা, জেরুজালেম, নেতান্‌ইয়া, বিরশেবা, আশকেলন, আশদদ ও ইলাত ইত্যাদি অঞ্চলেও এদের জমজমাট ব্যবসা চলছে। অনেক শহরের স্থানীয় খবরের কাগজের পেছনের পাতা, যৌনসেবার বিজ্ঞাপন এবং বিশেষভাবে আকর্ষণীয় 'সাহায্য চাই' বিজ্ঞাপনে ভরা থাকে, যেগুলো নতুন নতুন মেয়েদেরকে এই ব্যবসায় নামানোর প্রচেষ্টা।"

(জেরুজালেম পোস্ট, আগস্ট ২৮, ২০০০)

"তেল আবিবের জেলা পুলিশ মুখপাত্র বলেন, পুলিশের গোয়েন্দাগণ সোমবার রাত্রে Bat Yam-এর একটি পতিতালয় ঘেরাও করেন, যে সময় তার মালিক চারজন বিদেশী নারীকে অন্য একটি পতিতালয়ের ব্যবস্থাপকদের কাছে বিক্রি করতে যাচ্ছিল। ঐ Bat Yam পতিতালয়ের কর্মরত একজন মহিলা তার মনিবকে মলদাভিয়ার একটি চক্রের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা করেছিল, যে চক্রটি পতিতা হিসাবে কাজ করার জন্য, দক্ষতার সাথে ইসরাঈলে নারী পাচার করে। পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করে, সেই সাথে উপস্থিত সাতজন নারীকেও গ্রেফতার করা হয়। ঐ সাতজন নারীকে জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেয়া হয়, যাদের অন্তত চারজন ছিল মলদাভিয়ান নাগরিক এবং অবৈধভাবে ইসরাঈলে কাজ করছিল। অন্যদেরকে গতকাল সকালে, তেল আবিবের ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে রিমান্ড শুনানীর জন্য আনা হয়... তারা ঐ চক্রকে নাকি চারজন নারী পাঠানোর জন্য সাত হাজার ডলার দিয়েছিল যাদেরকে তারা স্থানীয় দালালদের কাছে মাথাপিছু পাঁচ থেকে দশ হাজার ডলার মূল্যে বিক্রি করার পরিকল্পনা করেছিল।"

(জেরুজালেম পোস্ট, ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ২০০১)

[১] ইসরায়েলের সংসদ। হিব্রু ভাষায় ক্নেসেট মানে সমাবেশ।

"ইসরাঈলে শ্বেত-ক্রীতদাসত্বের মাত্রা সম্বন্ধে প্রকাশিত খবরে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে মিডিয়া ছেয়ে গেছে। নারীদেরকে অস্থাবর সম্পত্তির মত এক দালালের কাছ থেকে অন্য দালালের কাছে বিক্রি করা হয়। ইসরাঈলে প্রতিদিন টাকার জন্য প্রায় ২৫০০০ যৌন আদান-প্রদান ঘটে থাকে। মাত্রাধিক যৌন নির্যাতনের জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রী Yitzhak Mordechai-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন এবং পরবর্তীতে তার প্রতি বিচার বিভাগীয় ক্ষমা প্রদর্শন ইত্যাদি খবর ইসরাঈলী সমাজে নারীদেহের মূল্যের বিষয়ে ব্যাপক আলাপ আলোচনার সৃষ্টি করেছে। যদিও ইসরাঈলী সমাজ বিপ্লবের শুরুতে এসব ব্যাপারে পিছিয়ে ছিল, ধর্মপ্রাণদের ব্যতিক্রম ছাড়া আজ তাদের সাথে পশ্চিমা দেশগুলোর নাগরিকদের বলতে গেলে কোন পার্থক্যই নেই। সাধারণ জনগণের নিত্যনৈমিত্তিক যৌনাচারের তুলনায় Mordechai এবং অন্যান্য যারা নিলামে নারীর কেনাবেচা করেন এবং পূর্বসম্মতি ছাড়াই যৌন নিপীড়ন চালান, তা নৈতিক ও আইনগত দিক থেকে অনেক বেশি নিন্দনীয়। অথচ তাদেরই কার্যকলাপের ভিতর দিয়ে অন্যদেরকে কিভাবে দেখা হয় তার প্রতিফলন ঘটে।"

(জেরুজালেম পোস্ট, ১০ই মে, ২০০১)

আরেকজন ইসরাঈলী যিনি ঐ সমাজে একটি উচ্চ স্থান দখল করে আছেন, তার দেয়া রিপোর্টে ইহুদী রাষ্ট্রে নিপীড়নের আসল প্রকৃতি ও মাত্রা আরো স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়:

"... ইসরাঈলের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংস্থার প্রাক্তন প্রধান, তার এক খোলাখুলি বক্তব্যে ফিলিস্তিনী বিদ্রোহ উস্‌কে দেয়ার জন্য সরকারী নীতিমালাকে দোষারোপ করেন, যা ইসরাঈলীদের হতবাক করে দেয়।

"Ami Ayalon, শিন বেত নিরাপত্তা সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত প্রধান, ইসরাঈলকে 'Apartheid' বা বৈষম্যকারী নীতি গ্রহণের অভিযোগে অভিযুক্ত করেন, যা তার মতে ইহুদী ধর্মের চেতনার বিরুদ্ধে যায়। তার মতে ফিলিস্তিনী জনগণ সংঘাত বেছে নেয়ার জন্য একটা যুক্তি অনুসরণ করছে। ফিলিস্তিনী শ্রমিক ও অন্যান্য যারা ইসরাঈলে ঢুকতে চায়, তাদেরকে ইসরাঈল যেভাবে নিগৃহীত করে তিনি তার কথা বলেন। এ ধরনের মন্তব্য প্রায়শই ফিলিস্তিনীদের কাছ থেকে ও বাইরের লোকজনের মুখ থেকে শোনা যায়। কিন্তু নিরাপত্তা সংস্থার উচ্চপদে আসীন ছিলেন এমন কোন ইসরাঈলীর মুখে কদাচিতই শোনা যায়।"

(জেরুজালেম পোস্ট, ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০০০, মঙ্গলবার)

ইন্তিফাদার[১] মাধ্যমে ইহুদী রাষ্ট্রকে প্রতিরোধ করায় আশাহত ফিলিস্তিনী জনগণের উপর যে নিপীড়ন চালান হয়, ইসরাঈলী প্রেসিডেন্ট অসতর্কভাবে নিজেই এক বক্তব্যে তার সত্যতা স্বীকার করেন:

"ফিলিস্তিনী জনগণের যদি কোনরকম যুক্তিবোধ থেকে থাকে, তবে তারা তাদের চক্ষু খুলে দেখবে এবং বুঝতে পারবে যে এই অশুভ পথ তাদের কোথায় নিয়ে গিয়েছে: আমরা সংযম দেখান সত্ত্বেও, তাদের শত শত মৃত্যুবরণ করেছে এবং হাজার হাজার আহত হয়েছে, দারিদ্র ও বঞ্চনা, বিশাল বেকারত্ব, অপূরণীয় অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি, ধ্বংসপ্রায় প্রশাসনিক কাঠামো, তদুপরি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অনগ্রসরতা।"

(ইসরাঈলী প্রেসিডেন্ট কাট্সাভ, জেরুজালেম পোস্ট, ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০০১)

আরবদের প্রতি তার ঘৃণাকে প্রেসিডেন্ট এমন ভাবে লুকানোর চেষ্টা করেছেন, যা স্রষ্টা-বিমুখ আধুনিক জগত ভালমতই রপ্ত করেছে:

"তারা এখানে আমাদের প্রতিবেশী, কিন্তু মাত্র কয়েকশ গজ দূরে অবস্থিত এই মানুষদের মনে হয় তারা যেন আমাদের মহাদেশ বা আমাদের পৃথিবীর অধিবাসী নয় বরং সত্যি সত্যি একটা ভিন্ন গ্যালাক্সীর অধিবাসী।"

(প্রেসিডেন্ট মোশে কাট্সাভ, জেরুজালেম পোস্ট, ১১ই মে, ২০০১)

তেল আবিব ইউনিভার্সিটির এক অধ্যাপক, ড্যান জ্যাকবসন, ইসরাঈলী ন্যায়বিচার সম্বন্ধে বলেন:

"বাহান্ন বৎসর ধরে সংখ্যালঘু আরবগণ লজ্জাজনকভাবে বৈষম্যের শিকার হয়েছে। তাদের ভূমির অব্যাহত অধিগ্রহণ হচ্ছে কঠোর বৈষম্যের অনেকগুলো অভিব্যক্তির মধ্যে একটি। বড় বড় সরকারী ও পাবলিক কোম্পানীগুলোতে তথা সরকারী চাকুরীতে তাদের চাকুরী দিতে অস্বীকার করা, আরবদের মাঝে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে তহবিলের স্বল্পতা, আরব পৌরসভাগুলোতে রাষ্ট্রীয় বাজেটের ব্যয়কৃত অংশের অস্বস্তিকর স্বল্পতা ইত্যাদি হচ্ছে ইসরাঈলী আরব নাগরিকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদার আরও কিছু বহিপ্রকাশ। ডানপন্থী সরকারগুলিসহ পর পর বেশ কতগুলি সরকারই এই বাস্তবতাগুলো বার বারই সনাক্ত করেছে। কিন্তু পাঁচ দশক ধরে এই সমস্যাগুলো সমাধান করতে খুব সামান্যই কিছু করা হয়েছে।"

(জেরুজালেম পোস্ট, ৩রা এপ্রিল, ২০০১)

[১] বিদ্রোহ, অভ্যুত্থান।

আমরা এখন পবিত্র কুর'আনের ঐ সাবধানবাণী অবলোকন করছি যাতে বলা হয়েছে যে, জাহান্নাম তাদের চোখের সামনে চলে আসবে। উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো তারই সত্যতাকে ফুটিয়ে তোলে!

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿١٠٠﴾

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾

"আর সেদিন আমরা অবিশ্বাসীদের কাছে জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব।

"(তারা হবে ঐ সকল অবিশ্বাসী) যাদের চোখের উপর পর্দা ছিল যা তাদেরকে আমার দিক নির্দেশনা (সনাক্ত করা থেকে, এবং গ্রহণ করা) থেকে বিরত রেখেছিল, এমনকি তারা তা শুনতেও অক্ষম ছিল।"

(কুর'আন, সুরা কাহাফ ১৮:১০০-১০১)

আসুন আমরা আর দেরী না করে ব্যাপারটা বুঝতে শিখি যে, আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিমা সভ্যতার প্রভাবের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট *'নতুন বিশ্বব্যবস্থা'* হচ্ছে স্রষ্টা-বিমুখতা, বর্ণবাদী, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় নিপীড়ন, অনৈতিকতা ও যৌন দাসত্বের এক ব্যবস্থা, যা সারা বিশ্বজুড়ে মুসলিমগণ সহ গোটা মানবকুলকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। কিন্তু 'পবিত্রভূমি' হচ্ছে বিশেষ ভূমি। এবং পবিত্র কুর'আন গুরুত্ব সহকারে ঘোষণা করেছে যে কেবলমাত্র যাদের {ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিধাতার উপরে} ঈমান রয়েছে এবং যারা সদাচারী, তাদেরই 'পবিত্রভূমির' উত্তরাধিকার লাভ করতে দেয়া হবে (দেখুন, কুর'আন, সুরা আম্বিয়া ২১:১০৫)। আধুনিক যুগের ইসরাঈল অথবা ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী ফিলিস্তিন লিবারেশন অর্গানাইজেশন কাউকেই এই সমস্ত শর্তের সামান্যতম পূরণ করতে সমর্থ বলে মনে হয় না। 'পবিত্রভূমির' নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ব্যাপারে অর্থাৎ জেরুজালেমের শেষ অধ্যায় সম্বন্ধে, কুর'আনিক ধারণা এই যে ইয়াসির আরাফাতের ধর্মনিরপেক্ষ পি-এল-ও অথবা ধর্মনিরপেক্ষ ইসরাঈল রাষ্ট্র কোনটাই টিকে থাকবে না। একই পথের পথিক একসাথেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে!

'পবিত্রভূমির' উত্তরাধিকার প্রশ্নে ইসরাঈলের রাজনৈতিক দাবীর বৈধতার অসারতা উপরোক্ত যুক্তি থেকে স্পষ্ট। বিশ্বাসী ইহুদী ও খৃস্টানদের কাছে বিষয়টি সনাক্ত করা ও গ্রহণ করা খুব একটা কঠিন হবার কথা নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

‘পবিত্রভূমি’ এবং ইসরাঈলের সুদ-ভিত্তিক অর্থনীতি

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ
وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾
وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

“বস্তুতঃ ইহুদীদের জন্য আমি হারাম করে দিয়েছি বহু পূত-পবিত্র বস্তু যা তাদের জন্য হালাল ছিল —

“তাদের পাপের কারণে এবং আল্লাহ্‌র পথে অধিক পরিমাণে বাধা দানের দরুন।

“আর এ কারণে যে তারা সুদ গ্রহণ করত, অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল, এবং (তা করতে গিয়ে) তারা অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ হরণ করত।

“(এই সমস্ত দুষ্কর্মের কারণে) তাদের মধ্যে যারা ঈমানকে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের জন্য আমি ভয়ঙ্কর শাস্তির ব্যবস্থা করেছি।”

(কুর’আন, সুরা নিসা ৪:১৬০-১৬১)

ভূমিকা

ইসরাঈল হচ্ছে ‘পবিত্রভূমিতে’ অবস্থিত এক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। আজকের পৃথিবীর অন্য সকল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মতই এর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রিবার উপর প্রতিষ্ঠিত। রিবাকে সাধারণত সুদ হিসাবে অনুবাদ করা হয়, অর্থাৎ সুদের হার যাই হোক না কেন, সুদের ভিত্তিতে যে কোন অর্থঋণকে রিবা বলা হয়। অবশ্য, বর্ধিত অর্থে প্রতারণার ভিত্তিতে যে কোন লেনদেন, যা প্রতারককে এমনভাবে লাভবান করে, যা ন্যায়সঙ্গত নয়, সে সবই ইসলামে রিবার সংজ্ঞার আওতাভুক্ত। (দেখুন আমাদের গ্রন্থ: The Prohibition of Riba in the Quran and Sunnah)। আমেরিকান পরিভাষায় ঐ ধরনের লেনদেনকে ‘Rip-off’ বা ‘লুটে নেওয়া’ বলা হয়! যদি ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্ম অনুযায়ী বিচার করতে হয়, তাহলে আমরা জিজ্ঞাসা করি ‘পবিত্রভূমিতে’ অবস্থিত এই

ইসরাঈলের ধর্মীয় বৈধতা কতটুকু হবে যার অর্থনীতি সুদের উপর প্রতিষ্ঠিত? 'পবিত্রভূমি' উত্তরাধিকারের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত শর্তগুলি সে পূরণ করে, না ভঙ্গ করে? এই অধ্যায়ে ঐ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

আজকের পৃথিবীর অর্থনীতি

বর্তমানে পৃথিবী জুড়ে অর্থনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য এই যে, সম্পদ এখন আর গোটা সমাজে প্রবাহিত হয় না। বরং এখন কেবলমাত্র ধনাঢ্যদের মধ্যেই সম্পদ প্রবাহিত হয়। যার ফলশ্রুতিতে গোটা বিশ্বজুড়ে ধনাঢ্যরা এখন স্থায়ীভাবে ধনী আর দরিদ্ররা এখন স্থায়ীভাবে দরিদ্রতার কারাগারে বন্দী। দ্বিতীয়ত ধনীরা কার্যত জনসাধারণের রক্ত শোষণ করে আরো ধনী হতে থাকে, একই সময়ে দরিদ্র জনগণ এমন নিঃস্ব অবস্থায় উপনীত হয় যে, তারা বিশৃঙ্খলা, সন্ত্রাস, অসীম দুর্ভোগ এবং ঈমান ও মূল্যবোধ ধ্বংস হবার অবস্থার মুখোমুখি হয়। সমগ্র মানবকুলকে একটা জাহাজে চড়া অবস্থায় কল্পনা করুণ। একটা ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু অংশ যারা স্থায়ীভাবে ধনী ও যারা প্রতিনিয়ত আরো ধনী হয়েই চলেছে, তারা অভূতপূর্ব বিলাসিতা ও নিরাপত্তার মাঝে 'প্রথম শ্রেণীতে' ভ্রমণ করছে। তাদের রয়েছে প্রথম শ্রেণীর চিরস্থায়ী টিকেট। ধনীরা জাহাজখানি পরিচালনা করে। তারা তাদের সম্পদ ব্যবহার ক'রে রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। ঐ জাহাজের উপর গণতন্ত্র হয়ে যায় *ধনীদের শাসন কেবল ধনীদের জন্য*, যার অর্থ দাঁড়ায় এক ধরনের অর্থনৈতিক বেশ্যাবৃত্তি। কিন্তু ধনীরা নিজেরা সরাসরি শাসন করে না। বরং তারা নিজেদের অনুপস্থিতিতে প্রতারণার মাধ্যমে, জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক দলসমূহ, যাদেরকে তারা সমর্থন করে এবং যাদের উপর তারা অদৃশ্যভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে, তাদের মাধ্যমে তারা তা কার্যকরী করে। আজকের পৃথিবীর রাজনৈতিক অর্থনীতির এটাই হচ্ছে সত্যিকার বর্ণনা। আর জনগণের উপর ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার এই পদ্ধতিতে ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের ইউরোপীয় ইহুদীরা পারদর্শিতা লাভ করেছে। মানব ইতিহাসের এই বিপর্যয়কর পরিণতি সনাক্ত করতে পারার জন্য হেনরী ফোর্ড প্রশংসার দাবীদার।

বাকী মানবকুলের অধিকাংশই স্থায়ী দারিদ্র্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং ডেকের নিচে জাহাজের মালামাল বহনের স্থানে থেকে উত্তরোত্তর বর্ধিষ্ণু দারিদ্র্য, বিপর্যয়, দুর্ভোগ ও কষ্টের ভিতর নিজেদের যাত্রা অব্যাহত রাখতে বাধ্য। অন্যরা যাতে তাদের পরিশ্রমের ফসলের উপর জীবন ধারণ করতে পারে এবং ধনীরা যাতে বিলাসবহুল জীবন যাপন করতে পারে, সেজন্য তারা ক্রীতদাসের পারিশ্রমিকে পরিশ্রম করতে বাধ্য হয়। মাদকদ্রব্য ও মাদক-ব্যবসায়ী সঙ্কুল প্রতিবেশে তারা ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তাহীনতার সাথে চুরি, সন্ত্রাস, গোলাগুলি, হত্যা ও নারী ধর্ষণের পরিস্থিতিতে জীবন যাপন করে।

যারা প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করে তাদের জন্য পরিস্কার পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং পয়সা দিয়ে লাভ করা যায় এমন সর্বোত্তম স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা থাকে। আর আধুনিক চিকিৎসাবিদরা 'মৃতকে জীবনে ফিরিয়ে আনতে' আক্ষরিক অর্থেই অলৌকিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ডেকের নিচে মাল পরিবহনের জায়গায় যারা রয়েছে, তারা ব্যাকটেরিয়াপূর্ণ দূষিত পানি পানে বাধ্য হচ্ছে। রাসায়নিক দ্রব্য ও হরমোন-সম্বলিত খাবার খেতে ও দুধ পান করতে তাদের বাধ্য করা হচ্ছে। পরিবর্তিত জীনের খাবারও তাদের আরো বেশি মাত্রায় খেতে হচ্ছে। তারা অসুস্থ হয় কিন্তু চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করতে পারে না। তারা করুণ জীবন যাপন করে এবং করুণ মৃত্যুবরণ করে। সত্যি বলতে কি আজকের পৃথিবীর অর্থনীতি হচ্ছে এক নতুন ও শিল্পসম্মত অর্থনৈতিক দাসত্ব। কিন্তু তা ভয়ঙ্কর ধোঁকার মাধ্যমে কাজ করে।

সর্বাগ্রে, যারা বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, এবং যদিও 'মুক্ত ও সৎ বাজারের' বেদবাক্য প্রচার করে থাকে, তারা নিজেরাই মানুষের উপর প্রতারণামূলক কৃত্রিম কাগুজে নোটকে মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার করার আইনগত বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দিয়ে ঐ 'মুক্ত বাজারের' শর্ত ভঙ্গ করে। কাগুজে মুদ্রা প্রতিনিয়ত তার মূল্য হারায়। যখন দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায় এবং গভীরতর হয়, তখন তারা মৌলিক চাহিদার দ্রব্যাদি, যেমন খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদির উপর এবং শ্রমবাজারের সর্বনিম্ন মজুরীর আইনের উপর মূল্যনিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। সরকার ও লূণ্ঠণজীবী উচ্চশ্রেণী যারা স্থায়ীভাবে ধনী তাদের বিরুদ্ধে যেন ক্ষুধায় জর্জরিত জনসাধারণ বিদ্রোহে জেগে না ওঠে, সেজন্য তারা [ধনীরা] এটা করে থাকে। জনসাধারণ যেন তাদের এই নতুন ধাঁচের দাসত্ব সনাক্ত করতে না পারে, সেজন্যও তারা এটা করে থাকে।

ঐ প্রতারণা উপরোক্ত বর্ণনাকেও ছাড়িয়ে যায়। যারা প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করে তাদের দিকে অনেক গরীব মানুষই চেয়ে থাকে এবং নিশ্চিত ভাবে মনে করে যে ঐসব মানুষ এবং তাদের জীবনযাত্রার ধরনই হচ্ছে জান্নাতের জীবন যাপন। এবং তারা ঐ জান্নাতে যাওয়ার আশা পোষণ করে। তারা নিপীড়নের ঐ অবস্থা এবং তা যে ব্যবস্থায় কাজ করে তা বুঝতে অক্ষম। গরিব জনগণের অনেকে তাদের উপর চালানো অর্থনৈতিক নিপীড়নের প্রতিক্রিয়া দেখাতে গিয়ে ক্রোধে অন্ধ হয়ে যায়, এবং যাদের কিছু সম্পদ আছে অথবা যাদের হাতে কর্তৃত্ব রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের শরণাপন্ন হয়। যারা গরীব তারা বিশ্বাস করে যে তারা জাহান্নামে বসবাস করছে এবং যারা প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করছে তাদের জীবন জান্নাতের প্রতিচ্ছবি ভেবে তাদের জীবনযাত্রাকে অনুকরণ করে। ঐ ধরনের একটি জাহাজ সকল যাত্রী সমেত ডুবিয়ে দেয়ার উপযোগী!

Energy and Equity-র লেখক ইভান ইলিচের[১] মত কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিডেল ক্যাস্ট্রো পৃথিবীর অর্থনীতিকে একই ধরনের ভাষায় বর্ণনা করেছেন:

*"এর আগে কখনো মানবকুলের এমন বিশাল বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বৈভব, সম্পদ ও ঐশ্বর্য তৈরি করার এমন অভাবনীয় সামর্থ ছিল না, কিন্তু এর আগে পৃথিবীতে এমন বৈষম্য ও অসমতাও কখনো বিরাজমান ছিল না।"*এই অর্থনৈতিক নিপীড়নের ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তিনি ঘোষণা করেন: *"এই অন্যায্য অর্থনৈতিক বিন্যাসের বিচার করতে আরেকটি নুরেমবার্গের প্রয়োজন।"*

(সেপ্টেম্বর ২০০০ সালে Group of 77-এর হাভানায় শীর্ষ সম্মেলনে দেয়া প্রেসিডেন্ট ফিডেল ক্যাস্ট্রোর বাণী)

রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) পৃথিবীকে অর্থনৈতিক অবিচার ও নিপীড়ন মুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দিয়ে যান। কেউ ক্রীতদাসের পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করত না। সম্পদ কেবল ধনীদের মাঝেই প্রবাহিত হত না, বরং গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা জুড়েই প্রবাহিত হত। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা স্থায়ীভাবে ধনী থাকত না এবং দরিদ্ররাও স্থায়ীভাবে দরিদ্র থাকত না। আর তাই তখন সর্বনিম্ন মজুরী নির্ধারণ করার জন্য আইনেরও কোন প্রয়োজন ছিল না। তখনকার বাজার ছিল মুক্ত ও সুবিচারমূলক। বীজ বপন না করে কেউ ফসল ঘরে তুলতে পারত না। মুদ্রার নিজস্ব মূল্য বা স্বকীয় মান ছিল, আর তাই ব্যাঙ্কসমূহ বা লুণ্ঠনজীবী উচ্চশ্রেণী মুদ্রার মূল্যমান কমানোর জন্য ফন্দি-ফিকির করতে পারত না। যার পরিণতিতে ঐ ধরনের বাজার এবং অর্থনীতি কখনই মুদ্রাস্ফীতির শিকার হত না। মজুরীসহ বাকী কোন দ্রব্যমূল্যই নির্ধারণ করে দেয়া হত না। যাদের জীবনের দৈনন্দিন মৌলিক চাহিদাগুলি মিটানোর সামর্থ্য ছিল না, তাদের কাজে লাগাবার জন্য সম্পদের উপর বাধ্যতামূলক করের মাধ্যমে সমাজকল্যাণের লক্ষ্য অর্জিত হত। কিন্তু তখনকার সমাজের মূল্যবোধ এটা নিশ্চিত করত যে, যাদের [পরিশ্রমের] সামর্থ্য রয়েছে, তারা সবসময়ই দানদক্ষিণার উপর বেঁচে থাকার অবস্থা থেকে নিজেদের বের করে আনার চেষ্টা চালাবে।

আজকের পৃথিবীর প্রতিটি সরকার যেখানে বিফল হয়েছে, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) সেখানে সফল হয়েছিলেন। তিনি সফল হয়েছিলেন কারণ তিনি রিবার উপর আল্লাহ্ প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করেছিলেন, তখন কোন বীমা কোম্পানী (অর্থাৎ রিবার পরিচারিকা) ছিল না, এবং তিনি কৃত্রিম (অর্থাৎ পেপার, প্লাস্টিক ও ইলেকট্রনিক) মুদ্রার পরিবর্তে আসল মুদ্রা ব্যবহার করে মুদ্রার মূল্যমান বজায় রেখেছিলেন। উপরন্তু যাদেরকে

[১] ইভান ইলিচ (১৯২৬-২০০২), অস্ট্রিয়ার প্রগতিবাদী দার্শনিক। তিনি মনে করতেন আধুনিক প্রযুক্তি ও আমলাতন্ত্র কৃষকদের সহজাত দক্ষতা ও স্বনির্ভরতাকে ধ্বংস করে তাদেরকে বিশেষজ্ঞ ও পেশাদারী শ্রেণী এবং বস্তু সামগ্রীর উপর নির্ভরশীল করে তুলছে।

চুরির দোষে দোষী সাব্যস্ত করা হত, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মাধ্যমে অন্যদেরকে ঐ কাজ থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টায় তিনি আইন প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু পৃথিবী তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং মুসলিমগণ তাঁর অর্থনৈতিক সুন্নতকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আর তাই আমরা আজ যে পৃথিবীতে বাস করছি, তা জুলুম আর ফাসাদে পরিপূর্ণ হয়েছে, অর্থাৎ মুক্ত ও সৎবাজারের বিকৃতি, আর সেই সাথে *বা'ই* অর্থাৎ ব্যবসার ধ্বংস সাধনে নিমজ্জিত হয়েছে।

আজকের গোটা বিশ্ব জুড়ে যে অর্থনৈতিক নিপীড়ন বিরাজমান এবং যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাচ্ছে, সেখানে ধনীরা আরো ধনী হচ্ছে এবং দরিদ্ররা আরো দরিদ্র হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কালো আমেরিকা করুণ ও স্থায়ীভাবে দরিদ্র, অথচ সাদা আমেরিকা সেখানে স্থায়ীভাবে ধনী। নিপীড়ন ক্রমশ বেড়েই চলেছে, কেননা সাদা এবং কালো, ধনী এবং দরিদ্রের মাঝে ব্যবধান সেখানে ক্রমেই বেড়ে চলেছে। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি অ-শ্বেতাঙ্গ পৃথিবীর চোখ ধাঁধাঁয়, আর শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের জন্য অবস্থাটা কখনই এত ভাল ছিল না। কিন্তু এই দেশে সম্পদ কেবল সম্পদশালীদের মাঝেই প্রবাহিত হয়, অথচ কল্যাণভাতার উপর বেঁচে থাকা গরিব মানুষের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেয়ে চলেছে। পশ্চিমা শ্বেতাঙ্গ সভ্যতা আমাদের বিশ্বাস করাতে চায় যে, তাদের অর্থনীতির মডেল হচ্ছে স্মরণকালের সবচেয়ে উন্নত ও প্রগতিশীল মডেল যা মানবকুলের অভিজ্ঞতায় এ যাবৎ কালের শ্রেষ্ঠ অর্জন। সেই সাথে এক চোখা মগজ-ধোলাইকৃত মুসলমান *মেকি মানুষ*-গুলি এটা নিশ্চিত করতে চাচ্ছে যে, ইসলামি দুনিয়া যেন এ ব্যাপারে পশ্চিমের অনুসরণ করে। সত্যি বলতে কি ঐ আমেরিকান ও পশ্চিমা শ্বেতাঙ্গ লুণ্ঠনজীবী স্বপ্নেকে উর্বর রাখা হয় পৃথিবী জোড়া গণমানুষের রক্ত ঢেলে এবং অজ্ঞ ও অসচেতন মানবকুলের কাছ থেকে দোহন করা সম্পদের মাধ্যমে। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাপারটা কিভাবে সমাধা করা যায় তা ব্যাখ্যা করা! পশ্চিমা শ্বেতাঙ্গ সভ্যতা তথা বিশ্বের অ-শ্বেতাঙ্গ কর্মজীবী জনসাধারণ এবং অবশ্যই অ-ইউরোপীয় ইহুদীগণও কেবলমাত্র তখনই লাভবান হতে পারে যদি তারা এখানে প্রদত্ত ব্যাখ্যার প্রতি মনোযোগ দেয়, এবং পবিত্র কুর'আনকে আল্লাহ্‌র বাণী হিসেবে ও মোহাম্মদ (সাঃ)-কে আল্লাহ্‌র রাসূল হিসেবে খুব বেশী দেরী হবার আগেই গ্রহণ করতে পারে।

আমাদের গবেষণার ফল হচ্ছে এই যে, যারা ইউরোপীয় সভ্যতার রাজনৈতিক রূপান্তরের ও তার অনুকরণের মাধ্যমে বাকী গোটা পৃথিবীকে স্রষ্টা-বিমুখ পৃথিবীতে রূপান্তরিত করার কারিগর, তারাই হচ্ছে ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা ধোঁকা দিয়ে ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় অ-ইউরোপীয় ইহুদীদের সমর্থন আদায় করেছে। এরাই হচ্ছে ঐ সমস্ত ব্যক্তিবর্গ যারা প্রতারণামূলক আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও বিশ্বব্যাপী সুদভিত্তিক ব্যাঙ্কিং ও ইন্স্যুরেন্স ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে তাদের

অশুভ মেধাকে কাজে লাগিয়ে, পৃথিবীর সম্পদকে আরও বেশি হারে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। তারা নিজেদের সুদের খেলায় এমনকি গতানুগতিক অ-ইউরোপীয় ইহুদীদেরও {অর্থাৎ যে জনগোষ্ঠী ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশবিদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল} ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী এই যে, এ সবের মাঝে কর্মরত দুষ্ট মেধা হচ্ছে ঐ আজব ইউরোপবাসীর যে প্রথমে ইহুদী হয়ে গিয়েছিল এবং পরে ইহুদী ধর্মকে ছিনতাই করার কাজে এগিয়ে গিয়েছিল।

পবিত্র কুর'আন যে কেবল আজকের এই পৃথিবীকেই ব্যাখ্যা করে তা নয়, বরং এর অর্থনৈতিক নিপীড়নকেও ব্যাখ্যা করে। পবিত্র কুর'আন হচ্ছে এক প্রজ্ঞাপূর্ণ পুস্তক (যার মাঝে অর্থনৈতিক প্রজ্ঞাও অন্তর্ভুক্ত), যা এমন নিয়মাবলী প্রতিষ্ঠা করেছে যাতে নিশ্চয়তা আছে যে সম্পদ কেবলমাত্র ধনীদের মাঝে প্রবাহিত হবে না:

مَّا أَفَاءَ اللَّـهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّـهِ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ
وَاتَّقُوا اللَّـهَ ۖ إِنَّ اللَّـهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

"যাকিছু আল্লাহ্ জনপদবাসীদের কাছ থেকে নিয়ে তাঁর রাসূলকে দান করেছেন, তা আল্লাহ্র, তাঁর রাসূলের,

"তাঁর আত্মীয়স্বজনের, এতিমদের, অভাবী ও মুসাফিরদের জন্যে; যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই প্রবাহিত না হয়।

"সুতরাং রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর আর যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।

"আর আল্লাহ্কে ভয় কর, কারণ আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।"

(কুর'আন, সুরা হাশর ৫৯:৭)

মুসলিমগণ পবিত্র কুর'আনের নিয়ম-কানুন পরিবর্তন করেছে, যার ফলে এখন তারা কুর'আনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার জন্য এবং তাদের পাপের জন্য ভয়ঙ্কর মূল্য পরিশোধ করে চলেছে! এক নতুন, উন্নত ও প্রতারক অর্থনৈতিক দাসত্ব তাদের উপর তথা গোটা অ-ইউরোপীয় মানবতার উপর নেমে এসেছে। আমরা যখন স্মরণ করি যে ইসলামের মৌলিক লক্ষ্য হল পৃথিবীর নির্যাতিতদের মুক্ত করা তখন আমাদের লজ্জা ও দুঃখ আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বিশ্বজুড়ে এই অর্থনৈতিক নিপীড়নের কারণ কি? তা হচ্ছে রিবা! মূলত পশ্চিমের ইহুদী নিয়ন্ত্রিত ব্যাঙ্কিং কেন্দ্রসমূহ, এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও বিরাজমান

লুণ্ঠনজীবী উচ্চশ্রেণী প্রতিনিয়ত মানবকুলের সম্পদ ও রক্ত শোষণ করছে এবং শ্রমজীবী জনসাধারণকে রিবার মাধ্যমে দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অত্যাচারীরা নিখুঁত প্রতারণার মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থা, আইন ও বিচার ব্যবস্থা, এবং মিডিয়া ইত্যাদি গড়ে তোলে এবং নিশ্চিত করে যে ঐ সমস্ত ব্যবস্থা অর্থনৈতিক নিপীড়নের কার্যক্রম সংরক্ষণ করার মৌলিক কাজটুকু বাস্তবায়ন করবে। চিত্রজগত, টেলিভিশন, ভিসিআর, ইন্টারনেট, আধুনিক সঙ্গীত ও ডিজাইনার পরিচ্ছদ ইত্যাদি জনসাধারণকে কল্পলোকে নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়, যেন তারা আত্মপ্রসাদ সম্বলিত অজ্ঞতার মাঝে জীবন যাপন করে; এবং সেই সাথে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ও দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখার জন্য রিবাকে ব্যবহার করা হয়। তাদের দীক্ষাগুরু ভণ্ড-মসীহ্ দাজ্জালের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে গোটা মানবকুলকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা এবং তাদের দরিদ্র ও গৃহহীন করা, আর অসৎভাবে উপার্জিত অর্থের মাধ্যমে, আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এবং ধর্মীয় জীবন যাপনকে চূড়ান্ত পরীক্ষায় ফেলা। আজ পর্যন্ত যে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তাতে এটা নিশ্চিত যে বেশির ভাগ মুসলিম, লুণ্ঠনজীবী ধনী শ্রেণী আর দুস্থ ও গরিব শ্রেণী, সকলেই ঈমানের ঐ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে চলেছে। দাজ্জালের দ্বিতীয় লক্ষ্য হচ্ছে ইহুদীদেরকে ধোঁকা দেওয়া এবং তাদেরকে চূড়ান্ত ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়া। আধুনিক পৃথিবীর একটা বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন, বিশেষভাবে পবিত্র ভূমির মূল্যায়ন, আমাদের এই সিদ্ধান্তে নিয়ে যাবে যে, দাজ্জালের ঐ লক্ষ্য প্রায় বাস্তবায়িত হয়ে গেছে। সে তার ঐ মিশন সম্পন্ন করার পথে বহুদূর এগিয়ে গেছে, যাতে সে ইহুদীদের হাতে গোটা পৃথিবীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তুলে দেবে। ইসরাঈল যখন 'নিয়ন্তা রাষ্ট্র' হয়ে যাবে এবং এমন একটা সময়কাল অতিক্রান্ত হবে যখন দাজ্জালের *"একটা দিন হবে এক সপ্তাহের মত"*, তখন দাজ্জাল সশরীরে আত্মপ্রকাশ করবে – এবং জেরুজালেম থেকে পৃথিবীর উপর শাসন করবে। সে তখন আসল মসীহ্‌র ভূমিকায় অভিনয় করার তার মিশনকে সম্পন্ন করবে।

বিপদসঙ্কেতের ব্যাপার না হলেও, অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে ভেবে দেখার বিষয় এই যে, বর্তমান পৃথিবী, যা বহু সভ্যতার সমন্বয়ে গঠিত, যার কোন কোনটি হাজার বছরেরও বেশী পুরনো, তা যে শুধু একই শির্ক-ভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে আত্মস্থ করবে তাই নয়, বরং এক অভিন্ন রিবা-ভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ অর্থনীতিকেও গ্রহণ করবে। রিবার অর্থনৈতিক অস্ত্র, আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং জাতিসংঘের রাজনৈতিক অস্ত্রের সম্পূরক হিসেবে কাজ করছে, যার মাধ্যমে দাজ্জাল গোটা পৃথিবীর উপর তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মিশনকে সাফল্যজনকভাবে পরিচালিত করছে।

আমাদের পদ্ধতি হচ্ছে প্রথমে বিষয়টার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা এবং তারপর একই সাথে পবিত্র কুর'আনের ঐ সমস্ত আয়াতগুলোকে ব্যাখ্যা করা, যেখানে রিবার

বিষয়ে বলা হয়েছে এবং রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ঐ সমস্ত হাদীসগুলোকে ব্যাখ্যা করা, যার মাধ্যমে কুর'আনিক দিক নির্দেশনা বাস্তবরূপ লাভ করে। সর্বোপরি আমরা চেষ্টা করব আধুনিক অর্থনীতিতে কিভাবে রিবা কার্যরত রয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে। এর পরেই কেবল আমরা 'পবিত্রভূমিতে' এমন এক ইসরাঈল রাষ্ট্রের যথার্থতা পরীক্ষা করার চেষ্টা করব, যার অর্থনীতি রিবার উপর প্রতিষ্ঠিত।

রিবা কি?

রিবা হচ্ছে সুদ। বর্তমানে সাধারণভাবে সুদ বলতে উচ্চহারে *অবৈধভাবে* অর্থ ঋণদানকে বুঝান হয়। খৃস্টান চার্চকে উপেক্ষা করে অর্থ ঋণদাতাদিগকে (এখন যাদেরকে ব্যাঙ্কার বলা হয়) অনুমতি দেবার জন্য, এবং রিবার উপর চার্চের সব ধরনের আপত্তিকে এড়িয়ে যাবার জন্য শব্দার্থের এই ইচ্ছাকৃত বিকৃতি ইউরোপে সাধিত হয়েছে। ১৯৩৫ সালে R.W. Tawney একখানা সুন্দর গ্রন্থ লিখেছিলেন যার নাম ছিল Religion and the Rise of Capitalism, যাতে তিনি রিবার প্রতি প্রলম্বিত ইউরো-খৃস্টান বিরোধিতার কথা বর্ণনা করেন। উইলিয়াম শেক্সপিয়ার তাঁর বিখ্যাত নাটক 'মার্চেন্ট অফ ভেনিসে' একই কাজ করেছিলেন।

ইসলামে রিবা হচ্ছে সুদের হার ব্যতিরেকে, সুদের ভিত্তিতে অর্থের ঋণ দান (যেমনটা মধ্যযুগীয় খৃস্ট ধর্মেরও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল)। যখন 'অর্থ ঋণদানকারী' সুদের ভিত্তিতে টাকা ধার দেয়, তখন তার নিজস্ব কোন শ্রম বা চেষ্টা বা ঝুঁকি ছাড়াই, সময়ের সাথে সাথে ঐ টাকা আপনা আপনি বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধি কিভাবে ঘটে? এই বৃদ্ধি প্রতারণার মাধ্যমে শ্রম, মালামাল এবং সম্পত্তির শোষণ দ্বারা বাস্তবায়িত হয়। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ তা'আলা দ্ব্যর্থহীনভাবে যে ঘোষণা দিয়েছেন তার দিকে মনোযোগ দিলেই ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে যাবে:

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

"মানুষ যার জন্য পরিশ্রম করেছে সেটা ছাড়া কোন কিছুরই উপর তার অধিকার নেই।"

(কুর'আন, সুরা নাজ্‌ম ৫৩:৩৯)

এভাবেই পবিত্র কুর'আন এই দাবীকে প্রত্যাখ্যান করে যেখানে বলা হয় যে, 'অর্থের' সাথে 'সময়'-এর সম্পর্ক রয়েছে, অথবা সময়ের সাথে টাকা বৃদ্ধি পায়!

যে সমস্ত পন্থায় ঐ শোষণ সাধিত হয় তার ফলস্বরূপ শ্রম, পণ্যদ্রব্য ও সম্পত্তির *প্রকৃত মূল্য* 'সময়ের' সাথে ক্রমান্বয় কমতে থাকে। এটা এমন একটা ব্যাপার

যা পবিত্র কুর'আনের বেশ কয়েকটা আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সুনির্দিষ্টভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। নবী শো'আয়েব (আঃ) (যাঁর নাম বাইবেল থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে) প্রতিনিয়ত তাঁর জনগণকে তাদের অর্থনৈতিক অসাধুতার বিরুদ্ধে সাবধান করতেন। তিনি বিশেষভাবে তাদেরকে সতর্ক করতেন:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

"...জনগণকে যা তাদের প্রাপ্য তার কম দিও না (যেমন তাদের শ্রম, তৈজস, সম্পত্তি ইত্যাদির সামগ্রিক মূল্যমান কমিয়ে তাদেরকে বঞ্চিত করো না)।
(কুর'আন, সুরা আ'রাফ ৭:৮৫; হুদ ১১:৮৫; শু'আরা ২৬:১৮৩ ইত্যাদি)

পবিত্র কুর'আনকে দিক নির্দেশনার একখানা গ্রন্থ হিসাবে যারা প্রত্যাখ্যান করে, সংগঠিত শ্রমের ঐ সব ধর্মনিরপেক্ষ বিশারদগণ, হয়ত এখন বুঝতে শুরু করবেন কিভাবে শ্রমিক সমাজ প্রতিনিয়ত এক গর্দভকুলে রূপান্তরিত হচ্ছে, এবং ধনী ও তাদের ব্যাঙ্কের জন্য নিজেদের ঘাম ঝরিয়ে চলেছে।

মুসলিমদেরও অবশ্যই বুঝা উচিত, যদিও অনেকের জন্য এটা বুঝতে পারা অত্যন্ত কঠিন যে, নকল কাগুজে মুদ্রা ব্যবহারের আইনসিদ্ধ জালিয়াতির মাধ্যমে যখন জনসাধারণের কাছ থেকে সম্পদ শোষণ করে নেয়া হয়, তখন নেপথ্যে যে জিনিসটা কাজ করে সেটাই হচ্ছে *রিবা*। এই নকল মুদ্রা সেই সকল মুদ্রার জায়গা দখল করে নিয়েছে যেগুলি আল্লাহ্ তা'আলার প্রত্যেক নবীর সুন্নত ছিল, অর্থাৎ স্বর্ণ, রৌপ্য এবং অন্যান্য মূল্যবান ধাতব পদার্থ। কাগজ, প্লাস্টিক ও ইলেকট্রনিক মুদ্রার (অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ মুদ্রার) নিজস্ব কোন মূল্য নেই। বরং মুদ্রার একটা মূল্যমান ঠিক করে দেয়া হয়, যা *'সময়ের ব্যবধানে বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিনিয়ত তার মূল্য হারাতে থাকে'*। মুদ্রার এই অবমূল্যায়নের ক্ষেত্রে, ব্যাঙ্কসমূহ প্রধান ভূমিকা পালন করে এবং যখন তা ঘটে তখন তারাই [ব্যাঙ্কসমূহ] সবচেয়ে লাভবান হয়। মুদ্রা যখন তার মূল্যমান হারায়, তখন সবকিছুরই মূল্যমান কমে যায়। জিনিসের দাম বেড়ে যায়, আর পারিশ্রমিকও তার মূল্যমান হারায়। শ্রমশক্তি তখন ক্রীতদাস সুলভ মজুরীর শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে।

পবিত্র কুর'আনে শেষ ওহী

সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুর'আনের শেষ ওহীতে এমন একটা বিষয়ে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন যা পূর্ববর্তী ওহীসমূহে ইতোমধ্যেই আলোচিত হয়েছিল — শুধু কুর'আন কেন, তৌরাত, যবুর এবং ইঞ্জীলেও — আর সেটা ছিল *রিবার* উপর

নিষেধাজ্ঞার বিষয়। ইব্নে আব্বাস (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে আমরা জানতে পারি যে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওফাতের স্বল্পকাল পূর্বে যে শেষ ওহী তাঁর কাছে নাযিল হয়, তা ছিল সুরা বাক্বারার অংশবিশেষ (২:২৭৮-২৭৯) যাতে রিবা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে:

"ওমর ইব্নে খাত্তাব (রাঃ) বলেন: নাযিলকৃত শেষ আয়াতটি ছিল রিবার উপর, কিন্তু আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) আমাদের কাছে বিশদভাবে তা বর্ণনা করার আগেই চলে যান, সুতরাং কেবল রিবা-ই নয় রীবাহ্ (অর্থাৎ যা কিছু তার শুদ্ধতা সম্বন্ধে মনে সন্দেহের জন্ম দেয় তা)-ও পরিত্যাগ কর।"

(সুনান, ইব্নে মাজাহ; দারিমী)

"ইব্নে আব্বাস (রাঃ) বলেন: হে মুমিনগণ, আল্লাহ্কে ভয় কর এবং বকেয়া রিবা যা তোমাদের প্রাপ্য (এখন থেকে নিয়ে ভবিষ্যতে সবসময়ের জন্য) তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক... তোমরা কারো প্রতি অত্যাচার করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না। (আল বাক্বারা, ২:২৭৮-২৭৯)। ইব্নে আব্বাস (রাঃ) বলেন: রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে নাযিলকৃত এটাই ছিল শেষ আয়াত।"

(সহীহ বুখারী)

ঐ শেষ ওহী আরাফাতের মাঠে বিদায় হজ্জের সময় রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দেয়া খুতবায় সুদ বা *রিবা* নিষিদ্ধকরণের ঘোষণাকে নিশ্চিত করে। পবিত্র কুর'আনের নিম্নোক্ত অধ্যায়ে ঐ শেষ ওহী পাওয়া যাবে। আমরা আমাদের নিজস্ব ব্যাখ্যাসূচক মন্তব্য সহকারে গোটা অধ্যায়টি উদ্ধৃত করলাম।

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ
فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّـهِ ۖ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾
يَمْحَقُ اللَّـهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّـهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ ۖ
وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾
وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ
وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾
وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّـهِ ۖ
ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

"যারা নিজেদের সম্পদ থেকে দিনে ও রাতে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে তাদের জন্য তাদের প্রভুর কাছে উত্তম ফলাফল রয়েছে,

"তাদের ভয়ের কারণ নেই অথবা তারা চিন্তিতও হবে না।" (অবশ্য ঐ সম্পদ হালাল পথে ব্যয় করতে হবে, যে ব্যয় অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করবে এবং সম্পদকে প্রবাহিত করবে।)

"(অপর পক্ষে) যারা রিবা গ্রহণ করে, তারা শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ্‌র সম্মুখে সেই ব্যক্তির মত দাঁড়াবে যাকে শয়তান তার স্পর্শ দ্বারা মোহাবিষ্ট করে দিয়েছে। (এটা এজন্য যে রিবা হচ্ছে 'ব্যয়ের' বিপরীত — রিবার মাধ্যমে অর্থনীতি থেকে সম্পদকে শুষে নেয়া হয় যাতে জনসাধারণ দারিদ্র্য ও দুঃস্থতার কবলে পড়ে যায়)।

"এটা এজন্য যে তারা বলে ক্রয়-বিক্রয় তো সুদ নেয়ারই মত। (তারা যুক্তি দেখায় যে, 'সুদের ভিত্তিতে অর্থ ঋণদান' হচ্ছে ব্যবসারই এক আইনসিদ্ধ রূপ)। *অথচ আল্লাহ্‌ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং রিবাকে হারাম করেছেন।* (তাদের ঐ যুক্তি মিথ্যা। আল্লাহ্‌ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর *রিবা*কে হারাম করেছেন। আর তাই *রিবা* ব্যবসার আর একটা রূপ নয়। এটা এজন্য যে বৈধ ব্যবসায়িক লেনদেনের মূল ব্যাপার হচ্ছে এই যে সেখানে হয় লাভ অথবা ক্ষতির [দুটোরই] সম্ভাবনা থাকতে হবে। সুদের ভিত্তিতে যখন অর্থ ঋণদান করা হয়, তখন ক্ষতির সম্ভাবনা এতই হ্রাস পায় যে তা বলতে গেলে বাদই পড়ে যায়! সুতরাং সুদের ভিত্তিতে অর্থ ঋণকে ব্যবসায়িক লেনদেন হিসেবে চালিয়ে দেয়া যায় না)।

"আর তাই যার কাছে তার প্রভুর এই সাবধানবাণী এসেছে, এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তার। তার ব্যাপার আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল। (অর্থাৎ তার ব্যাপারে বিচার্য আল্লাহ্‌র হাতে — ইসলামি রাষ্ট্র তাকে অতীতে গৃহীত *রিবা* ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করবে না)।

"*কিন্তু যারা পুনরায় তাতে ফিরে যায়* (অর্থাৎ, কুর'আনের এই আয়াত অবতীর্ণ হবার পরেও সুদের ভিত্তিতে অর্থ ঋণ দান অব্যাহতভাবে চালিয়ে যায়) *তারা দোযখে যাবে, তারা সেখানেই চিরকাল অবস্থান করবে!*

"*(আর সেই সাথে) আল্লাহ রিবাকে নিশ্চিহ্ন করেন, এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন।* (কেননা রিবার মূলমন্ত্র হচ্ছে বিনিময় কিছু না 'দিয়ে' কেবল 'হরণ' করা, অথচ দানের মূলমন্ত্র হচ্ছে বিনিময়ে কিছু না 'নিয়ে' কেবল 'দিয়ে' যাওয়া)। *আর আল্লাহ্ তাকে ভালবাসেন না যে একগুঁয়ে ভাবে অকৃতজ্ঞ এবং পাপে নিমজ্জিত।* (এখানে রিবা গ্রহণের সুনির্দিষ্ট পাপের কথা বলা হচ্ছে।)

"*বাস্তবিকই যারা ঈমান স্থাপন করে এবং সৎকাজ করে এবং নিয়মিত নামায আদায় করে ও যাকাত দেয়, তারা তাদের প্রভুর কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করবে*

"*এবং তাদের ভয়ের কোন কারণ নেই, আর তারা দুঃখিত হবে না।*

"*তোমরা যারা ঈমান এনেছ, আল্লাহ্কে ভয় কর আর রিবার যা বকেয়া রয়েছে তা ছেড়ে দাও* (অর্থাৎ এখনও তোমরা প্রাপ্য বলে যা দাবী কর) *যদি তোমরা সত্যিই মুমিন হয়ে থাক।*

"*তোমরা যদি তা না কর* (অর্থাৎ তোমরা নিজেদেরকে মুসলিম হিসাবে ঘোষণা করার পরও, যদি সুদের ভিত্তিতে টাকা পয়সা ঋণ দেয়ার কাজ অব্যাহত রাখ) *তবে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা গ্রহণ কর* (অর্থাৎ এই মর্মে ঘোষণা শুনে নাও যে, যে সকল মুসলমানেরা ইসলামকে মেনে চলে, তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তাদের উদ্দেশ্য হবে তাদেরকে মুক্ত করা যারা রিবার মাধ্যমে নির্যাতিত)।

"*কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর* (অর্থাৎ তোমরা যদি রিবা পরিত্যাগ কর), *তাহলে তোমাদের মূলধন তোমরা ফিরে পাবে* (তোমরা তা দাবী করতে পারবে)। (তোমরা রিবার ভিত্তিতে যা ধার দিয়েছিলে অর্থাৎ, কেবল মূল অর্থটাই ফিরে পেতে পার, কিন্তু মূলধনের সাথে একটা যুক্তিযুক্ত পরিমাণ সুদ অথবা সার্ভিস চার্জ তোমাদের প্রাপ্য নয়)।

"*অন্যায়ভাবে লেনদেন করো না, এবং তোমাদের সাথেও অন্যায় ভাবে লেনদেন করা হবে না।* (এ অংশটুকুর আরো যথার্থ অনুবাদ হবে এরকম: ঋণ দেয়া মূল অর্থটুকু গ্রহণ করে তোমরা অন্যের প্রতি অন্যায় করার পাপ থেকে রক্ষা পাবে, আর তোমাদের পাওনা সুদ ত্যাগ করলে, তোমরা নিজেরা কোন অবিচারের শিকার হবে না।)

"*আর যদি ঋণগ্রহীতা কষ্টের মাঝে আছে, তাকে সময় দাও যতক্ষণ না ঋণশোধ করা তার জন্য সহজ হয়।*

"*কিন্তু যদি তোমরা তা ত্যাগ কর* (অর্থাৎ তোমরা যদি তার দেনা মাফ করে দাও) *দান হিসেবে, সেটা হবে সর্বোত্তম যদি তোমরা তা জানতে।*

"আর সেই দিনকে ভয় কর যেদিন তোমাদের (অর্থাৎ গোটা মানবজাতি, সুদখোরগণ সহ) *আল্লাহ্‌র কাছে ফিরিয়ে আনা হবে,*

"তখন প্রতিটি মানুষ যা উপার্জন করেছে, তাই লাভ করবে এবং কারো প্রতি অবিচার করা হবে না।"

(কুর'আন, সুরা বাক্বারা ২:২৭৪-২৮১)

সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌ কেন রাসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এর ওফাতের ঠিক পূর্বে আরেকটি ওহী প্রেরণ করাটা বেছে নিলেন? বলা বাহুল্য, ঐ সময়টা ওহী পাঠানোর জন্য সম্ভাব্য শেষ সময় ছিল। দ্বীনের সর্বাঙ্গ সুন্দরকরণ এবং মুমিনদের উপর তাঁর রহমতের পূর্ণতা ঘোষণা করে ওহী নাযিল করার পরও, কেন তিনি এটা করলেন? আর সবশেষে যখন তিনি তা করলেনই [অর্থাৎ ওহী নাযিল করলেন], তিনি কেন রিবা নিষিদ্ধকরণের বিষয়ে প্রত্যাবর্তন করাটাকে বেছে নিলেন, যে বিষয়ে পবিত্র কুর'আনে ইতোমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছিল?

এ সমস্ত প্রশ্নের নিশ্চয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উত্তর রয়েছে। আমাদের কাছে মনে হয় যে ঐ ধরনের একটা শেষ ওহীকে, কেবলমাত্র যথাযথভাবে এমন একটা বিষয়ের উপর পুনরায় গুরুত্ব আরোপের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে, যা আল্লাহ্‌র হেদায়েতের মূল খুঁটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। উপরন্তু এটা ঐশ্বরিক দিকনির্দেশনার এমন বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে, যে ক্ষেত্রে ইসলামের শত্রুদের পক্ষ থেকে ভবিষ্যত আক্রমণের সময়, মুমিনদের ঈমান সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় থাকবে। সবশেষে, এটা হয়ত সবার শেষে নাযিল হয়েছিল কেননা, শেষ যুগে ব্যাপারটা কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। অবশ্য, আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন!

শেষ ওহীর বিষয়বস্তু হিসাবে রিবাকে বেছে নেয়ার ব্যাপারটা মনে হয় সকল সতর্কবাণীর মধ্যে সবচেয়ে ভীতিপ্রদ, কারণ রিবা মুমিনদের ঈমান, স্বাধীনতা ও ক্ষমতার প্রতি কঠিনতম হুমকির কারণ হতে পারে। এই বিষয়টা সর্বোচ্চ গুরুত্বের, কেননা এর মাঝেই নিহিত রয়েছে সবচেয়ে বিপজ্জনক, ধ্বংসাত্মক এবং বিপর্যয়কর আক্রমণের সম্ভাবনা — মুমিনদের ঈমান ও রাসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর উম্মাহর একতা ও ক্ষমতার উপর আক্রমণের সম্ভাবনা। এটা হচ্ছে আমাদের ভাবনা এবং আবারও বলি, আল্লাহ্‌ই সবচেয়ে ভাল জানেন!

রিবার প্রধানতম বিপদকে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) চিহ্নিত করেছেন

আমাদের এই মতামতের ভিত্তি হল আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে সংগৃহীত একখানা হাদীস, যেখানে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) রিবার মাধ্যমে পরিচালিত ঠিক ঐ ধরনের এক আক্রমণের চূড়ান্ত সাফল্যের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ঐ আক্রমণ স্পষ্টতই ইসলামের শত্রুদের দ্বারা পরিচালিত হবার কথা, কিন্তু তা রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অনুসারীগণ সহ গোটা মানবকুলের মাঝে ছড়িয়ে পড়ার কথা:

"রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: 'এমন একটা সময় আসবে যখন তোমরা সারা মানবকুলের মধ্য থেকে একজন মানুষও খুঁজে পাবে না যে সুদ খায় না। আর যদি কেউ থাকে এবং দাবী করে যে, সে সুদ খায় না, তবে নিশ্চিতভাবে সুদের বাষ্প তার কাছে পৌঁছাবে।' আর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী *'সুদের ধুলো তার কাছে পৌঁছাবে'।"*

(সুনান, আবু দাউদ)

এভাবে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এটা একেবারেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তাঁর উম্মাহর অখণ্ডতা ও মুমিনদের ঈমানের সবচেয়ে বড় বিপদ আসবে *রিবা*কে কেন্দ্র করে। শেষ ওহীর বিষয়বস্তু হিসাবে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক রিবাকে বেছে নেয়ার মাঝে যে সাবধানবাণী স্পষ্ট হয়ে উঠে, এই হাদিস দ্বারা তাও নিশ্চয়তা লাভ করেছে।

বিশ্বজুড়ে রিবার আধিপত্য সম্বন্ধীয় রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বাণী আজ বাস্তবরূপ ধারণ করেছে। এবং তা আমাদের এই হতভাগ্য জীবদ্দশাতেই পূর্ণতা লাভ করেছে! ১৯২৪ সালে ওসমানী খেলাফত বিলুপ্ত হবার পর থেকে এ পর্যন্ত যে সময় অতিবাহিত হয়েছে, তার মাঝেই বিশেষভাবে একাজ সম্পন্ন হয়েছে। ১৯২৪ সাল পর্যন্ত সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী ইউরোপীয় অর্থনীতি, মুসলিম বিশ্বের অর্থনীতিতে ও বাজারে অনুপ্রবেশ করতে সফল হয়নি। কিন্তু যে সকল সরকার মুসলিমদের বিষয়াদি দেখাশোনা করত, ইউরোপ তাদেরকে প্রভাবিত ক'রে রিবায় জড়িয়ে ফেলে। উদাহরণ স্বরূপ ওসমানী খলিফা ইউরোপের কাছ থেকে সুদের ভিত্তিতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ঋণ গ্রহণ করেন। তাঁর আর্থিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা এমন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল যে, তাঁর সাম্রাজ্যের ধ্বস ঠেকাতে শেষ উপায় হিসাবে তিনি নতুন ইউরোপীয় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থার সদস্যপদ চাইতে বাধ্য হন। ১৮৫৬ সালে Paris Peace Agreement-এর সময় তিনি তা লাভ করেন। কিন্তু তাঁকে যে মূল্য দিতে হয়েছিল তা ছিল এই যে, ইউরোপীয়/ইহুদী আর্থিক ব্ল্যাকমেইলের কাছে পরাভূত হয়ে তাঁকে ওসমানী সাম্রাজ্যের সকল ভূখণ্ড থেকে *জিযিয়া* ও *আহলুয-যিম্মা* প্রথার অবসান ঘটাতে হয়। ঋণ ও সুদের অর্থ পরিশোধের ব্যাপারে ছাড় লাভ করার এটা একটা শর্ত ছিল। তা করতে গিয়ে খলিফা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন, যিনি নিজে পবিত্র কুর'আনে

জিযিয়া করকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন (সুরা তাওবা, ৯:২৯)। আসলে জিযিয়ার অবসান ঘটবে তখনই যখন ঈসা (আঃ) ফিরে আসবেন:

"আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: আমার এবং তাঁর {ঈসা (আঃ)} মাঝে আর কোন নবী নেই। তিনি (পৃথিবীতে) অবতীর্ণ হবেন। তোমরা যখন তাঁকে দেখবে তাঁকে শনাক্ত করতে পারবে, একজন মাঝারি উচ্চতার ও লাল চুলের পুরুষ যার পরনে দুই টুকরো হলুদ বস্ত্র থাকবে, এবং মনে হবে যেন তাঁর মাথা থেকে স্বেদবিন্দু ঝরে পড়ছে যদিও তা ভেজা থাকবে না। তিনি ইসলামের কারণে মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং জিযিয়া বিলুপ্ত করবেন। ইসলাম ছাড়া আর বাকী সকল ধর্ম ধ্বংস করে দেবেন। তিনি {ঈসা (আঃ)} দাজ্জাল (অ্যান্টি-ক্রাইস্ট)-কে ধ্বংস করবেন এবং পৃথিবীতে ৪০ বছরের জন্য বেঁচে থাকবেন এবং তারপর মৃত্যুবরণ করবেন। মুসলিমরা তাঁর জানাযা পড়বে।"

(সুনান, আবু দাউদ)

ওসমানী খলিফাকে লক্ষ্যবস্তু বানানোর ব্যাপারে ইউরো-ইহুদী ব্যাঙ্কারদের সাফল্য হচ্ছে আর্থিক সাম্রাজ্যবাদের এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ, যা রিবার মাধ্যমে সম্ভব হয়েছিল। হেনরী কিসিঞ্জার ছিলেন একই ধরনের কৌশলের হোতা, যার পথ ধরে আধুনিক সময়ের পরাশক্তি সোভিয়েট ইউনিয়নের পতন ঘটে। ঐ ঘটনা ইসলামের উলামাদের চোখ খুলে দেয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা হয়নি। যার ফলে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, বিশ্বব্যাঙ্ক এবং অন্য আরো অনেকে স্বচ্ছন্দে একই কৌশল ব্যাবহার করে চলেছে। ইসরাঈলের নিজস্ব অর্থনীতি তো সুদভিত্তিক বটেই, সেই সাথে ইসরাঈল আরাফাতের পি-এল-ও ও অন্যান্য আরব রাষ্ট্রগুলিকে একই ধরনের অর্থনৈতিক ফাঁদে ফেলে দরিদ্র, বাস্তুহারা ও অর্থনৈতিক দাসে পরিণত করছে। এভাবেই ইউরোপীয়/ইহুদী আর্থিক ব্ল্যাকমেইলের মাধ্যমে ইসলামি জগতে (দারুল ইসলাম) আল্লাহ প্রদত্ত মডেলের জনজীবনের (অথবা রাষ্ট্রের) অবলুপ্তির সূত্রপাত হয়েছে, এবং ইউরোপীয় মডেলের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রতিস্থাপন ঘটেছে। ফলস্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে সার্বভৌমত্ব হরণ করে রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। যা নিঃসন্দেহে এক শির্কপূর্ণ কাজ।

বাস্তবিকই ১৯২৪ সালের পর থেকে গোটা বিশ্বের মুসলিমদের সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক জীবনই রিবায় ছেয়ে গেছে। রিবার মাঝে যে সহজাত আর্থিক সাম্রাজ্যবাদ নিহিত, তা ইসলামি জগতের উন্মুক্ত গলদেশকে ধারালো অস্ত্রধারী শত্রুর হাতে সমর্পণ করেছে। আসলে গোটা মানবকুলই এখন রিবা ও শির্কের হাতে বন্দী। পৃথিবীর উপর সুদভিত্তিক ব্যাঙ্কিং-এর পূর্ণ বিজয়ের মাধ্যমে এবং কৃত্রিম কাগুজে মুদ্রা, প্লাস্টিক ও ইলেকট্রনিক মুদ্রার মাঝে যে রিবা নিহিত রয়েছে, তার মাধ্যমে যে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়েছে শুধু তাই নয়, বরং মুক্ত ও সৎ বাজারের পূর্ণ বিকৃতির

মাঝেও ঐ ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়েছে। আজকের তথাকথিত মুক্ত বাজার হচ্ছে আসলে 'চোরের আড্ডা', যার মাঝে সবল দুর্বলকে শোষণ করে, আলী ইব্নে আবি তালিব (রাঃ) যার আশঙ্কা করে বলেছিলেন:

"মানবকুলের জন্য এমন একটা সময় নিশ্চিতভাবেই আসছে যখন মানুষ একে অপরকে কামড়াবে।"

(সুনান, আবু দাউদ)

সবশেষে পবিত্র কুর'আনের ঐ ওহীতে যে গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, তার প্রতিধ্বনি আমরা রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কথায় শুনতে পাই, যখন তিনি রিবার ব্যাপারে কঠোর ভাষায় বলেছিলেন:

"আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) বলেছেন! রিবার ৭০টি ভাগ রয়েছে, তার ভিতর সবচেয়ে কম বিপজ্জনক ভাগটি হচ্ছে একজন মানুষের তার নিজের মাকে বিয়ে (অর্থাৎ সংসর্গ) করার সমতূল্য।"

(সুনান, ইব্নে মাজা; বায়হাকী)

"আবদুল্লাহ ইব্নে হানযালা (রাঃ) বলেন যে আল্লাহ্র রসূল (সাঃ) বলেছেন: এক দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) রিবা, যা মানুষ জেনেশুনে গ্রহণ করে তা ছত্রিশ বার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার চেয়েও বেশী জঘন্য।"

(মুসনাদ, আহমদ)

"ইব্নে আব্বাসের (রাঃ) রেওয়ায়াতে এই একই হাদীসের বর্ণনায় রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) আরো বলেন: যার শরীরের পুষ্টিসাধন হারাম দ্বারা হয়ে থাকে, জাহান্নামই তার জন্য অধিক উপযুক্ত।"

(বায়হাকী)

"আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) বলেছেন: যে রাতে আমাকে আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেখানে আমি এমন সব মানুষকে দেখি যাদের উদর ছিল গৃহের মত বিশাল, যা সাপে ভর্তি ছিল, যেগুলি বাহির থেকে দেখা যাচ্ছিল। আমি জিবরাইল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ওরা কারা? তিনি বললেন, ওরা ঐ সকল মানুষ যারা সুদ খেয়েছিল।"

(মুসনাদ, আহমদ; সুনান, ইব্নে মাজাহ্)

"আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন যে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: চার ধরনের মানুষকে বেহেশতে প্রবেশ করতে না দিয়ে বা তার নিয়ামতের স্বাদ গ্রহণ করতে না দিয়ে আল্লাহ্ যথার্থ কাজই করবেন: মদ্যপান যার অভ্যাস, যে রিবা গ্রহণ করে, যে বিনা অধিকারে এতিমের সম্পত্তি আত্মসাৎ করে, এবং যে পিতামাতার প্রতি অমনোযোগী।"

(মুসতাদরাক, আল-হাকিম, কিতাব আল-বুয়ু')

"সামুরা ইব্‌নে জুনদাব (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বলেছেন: আজ রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম দুজন মানুষ আসলো এবং আমাকে এক পবিত্র ভূমিতে নিয়ে গেল, যেতে যেতে আমরা এক রক্তের নদীর কাছে পৌঁছালাম যার মাঝে একটা লোক দাঁড়িয়েছিল এবং নদীর তীরে পাথর হাতে আরেকটা লোক দাঁড়িয়েছিল। নদীর মাঝে দাঁড়ানো লোকটি বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলে অপরজন তার মুখে একটা পাথর মারল এবং তাকে তার পূর্বস্থানে ফিরে যেতে বাধ্য করল। এইভাবে সে যখনই বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছিল তখনই অন্যজন তার মুখে একটি করে পাথর মেরে তাকে ফিরে যেতে বাধ্য করছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এই লোকটা কে"? আমাকে বলা হল: নদীর মাঝে দাঁড়ানো লোকটি এমন একজন যে রিবা গ্রহণ করত (বা সুদ খেত)।"

(সহীহ্ বুখারী)

রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) রিবা নিষিদ্ধকরণের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা পুনঃনিশ্চিত করেছেন নিম্নলিখিত হাদিসে:

"জাবির ইব্‌নে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূলকে (সাঃ) বলতে শুনেছি: তোমাদের মাঝে কেউ যদি মুখাবারাহ ত্যাগ না করে তবে সে যেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের তরফ থেকে যুদ্ধের ঘোষণার প্রতি খেয়াল করে। যায়েদ ইব্‌নে সাবিত (রাঃ) বলেন: আমি জিজ্ঞেস করলাম: মুখাবারাহ কি? তিনি বললেন: যে তুমি অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ, অথবা এক-চতুর্থাংশ উৎপন্ন ফসলের বিনিময়ে তোমার জমি চাষ করালে।" (এখানে বিপদ হচ্ছে এই যে, এ ধরনের ব্যবস্থা প্রতারণামূলকভাবে ক্রীতদাস সুলভ শ্রমের দিকে নিয়ে যায়।)

(সুনান, আবু দাউদ)

উপরে উপস্থাপিত উপমাগুলি থেকে এটা পরিস্কার হয়ে যাওয়া উচিত যে, রিবার ভিত্তিতে অর্থনীতিকে গড়ে তোলা একটা বিরাট পাপ। শিরক বাদে আর যে কোন পাপই এর তুলনায় তুচ্ছ। অতএব রিবার অর্থনীতি সর্বাপেক্ষা নিশ্চিতভাবে 'পবিত্রভূমির' উত্তরাধিকার প্রশ্নে আল্লাহ্ প্রদত্ত শর্তগুলিকে ভঙ্গ করে।

রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং কাগুজে মুদ্রার ধ্বস

মুসলিমদের জন্য রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ঐ ভবিষ্যদ্বাণী যাতে তিনি কৃত্রিম ধর্মনিরপেক্ষ মুদ্রার (অর্থাৎ কাগজ, প্লাস্টিক ও ইলেকট্রনিক মুদ্রার) ধ্বস সম্বন্ধে বলেছেন, তা সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করাটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়:

"আবু বকর ইব্‌নে আবি মরিয়াম (রাঃ) বলেন: তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন: মানবকুলের উপর এমন একটা সময় নেমে আসবে যখন একটা দীনার বা দিরহাম (স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা) ছাড়া এমন কিছু অবশিষ্ট থাকবে না যা কোন কাজে লাগতে পারে।" — (মুসনাদ, আহমদ)

রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ঐ ভবিষ্যদ্বাণী প্রায় বাস্তবায়িত হতে চলেছে। আজকের অর্থব্যবস্থা 'মুদ্রা' তৈরী করতে 'কাগজ' ব্যবহার করে। সেটা একটা খোলাখুলি জালিয়াতি! কৃত্রিম মুদ্রা আসল মুদ্রার চেয়ে বেশ আলাদা। আসল মুদ্রার নিজস্ব একটা মূল্য থাকে, কাগজের মুদ্রার যা থাকে না। বাজার নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিগুলি এটাকে যে মূল্য দেয়, সেটাই এর একমাত্র মূল্য। এর বাজার দর ততক্ষণ টিকে থাকবে, যতক্ষণ এর উপর জনগণের আস্থা থাকবে এবং বাজারে এর চাহিদা থাকবে। চাহিদা নির্ভর করে আস্থার উপর এবং আস্থা এমন একটা ব্যাপার যা গুটি চালাচালির মাধ্যমে কমানো-বাড়ানো যায় (যা মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিলেন, আর যা ইন্দোনেশিয়া খুব দেরীতে বুঝতে পেরেছে)। যতক্ষণ পর্যন্ত সরকারগুলি তথাকথিত উন্মুক্ত মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণ করবে, ততক্ষণ তারা নিজ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে জনগণের আস্থাকে অক্ষুণ্ন রাখতে পারে। কিন্তু মুদ্রাবাজার এখন সবচেয়ে দুষ্টচক্রি ফটকাবাজদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় – সর্বগ্রাসী লোভ যাদের ইন্ধন যোগায় এবং বিশ্বস্ততা ও দেশপ্রেমের সাথে যাদের কোন সম্বন্ধ নেই। যে সকল শক্তি বাজারের আস্থাকে নাড়িয়ে দিতে পারে, সেগুলি একসময় ফটকাবাজির আলোড়ন সৃষ্টি করবে, এবং রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ঐ ভবিষ্যদ্বাণীকে বাস্তবরূপে পরিণত করবে।

মুদ্রার সম্পূর্ণ অচলাবস্থা অর্থাৎ মুদ্রা-উধাও (Money Meltdown) আর বেশী দূরে নেই। যখন সেটা ঘটবে, সেটাই হবে ইউরোপীয়দের (যারা ইহুদী হয়ে গিয়েছিল), পৃথিবীর উপর ইহুদী শাসন প্রতিষ্ঠার হাজার বছরেরও বেশি পুরনো সংগ্রামের চূড়ান্ত সাফল্য। তখন যাদের কাছে আসল মুদ্রা থাকবে, তারা ঐ মুদ্রা-উধাও থেকে বেঁচে যাবে, এবং যে সকল ফটকাবাজ বর্তমান মুদ্রা-ব্যবস্থাকে গুঁড়িয়ে ফেলার কাজে অংশ নিবে তারা এই প্রক্রিয়া থেকে অকল্পনীয় পরিমাণ মুনাফা অর্জন করবে। জনসাধারণ তাদের সম্পদ হারাবে এবং দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হবে। তারা হাতে মূল্যহীন কাগজের মুদ্রা নিয়ে দিশেহারাভাবে ঘুরে বেড়াবে। এটা সেই অর্থনৈতিক প্রলয় যা নিশ্চিতভাবেই ঘটতে যাচ্ছে। আমাদের রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) ছাড়া, অন্যরাও এখন একইভাবে ঐ মুদ্রা-উধাও-এর ভবিষ্যদ্বাণী করছেন। উদাহরণ স্বরূপ, জুডি শেলটন তাঁর চমৎকার গ্রন্থের নামের মধ্যে এই নতুন পরিভাষাকে ব্যবহার করেছেন। তাঁর গ্রন্থের নামই 'Money Meltdown: Restoring Order to the Global Currency System' (New York, The Free Press, 1994)। আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত না, এবং বাকি পৃথিবীকেও ভুলে যেতে দেয়া উচিত না, কিভাবে ১৯৮০ সালের জানুয়ারি মাসে মার্কিন ডলারের নাটকীয়, অশুভ এবং অভূতপূর্ব ধ্বস নেমেছিল, যখন স্বর্ণের বিপরীতে ডলারের মূল্য আউন্স প্রতি ৮৫০ ডলারে নেমে গিয়েছিল! (১৯৭১ সালে সেটা ছিল আউন্স প্রতি ৩৫ ডলার। বর্তমানে সেটা আউন্স প্রতি ২৮০ থেকে ৩০০ ডলারের ভিতরে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে)। ডলারের ঐ ধ্বস সংঘটিত হয়েছিল ইরানে পশ্চিমা বিরোধী ইসলামি বিপ্লবের কারণে, যার মাধ্যমে ইরানের

বিশাল তেল সম্পদের নিয়ন্ত্রণ বিশ্বব্যবস্থা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ইসলামি সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল। ইরানে সংঘটিত ইসলামি বিপ্লব ধর্মনিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থায় ধ্বস নামানোর হুমকি উপস্থাপন করতে যাবে কেন? আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থার পণ্ডিতগণ অবশ্য এ ব্যাপারে নীরব।

১৯৭৩ সালে আরব-ইসরাঈল যুদ্ধের অব্যবহিত পরে আমেরিকার উপর আরব তৈল-অবরোধ আরোপিত হওয়ায় একই ধরনের ধ্বস নেমেছিল। তখন মার্কিন ডলারের মূল্যে ৪০০% এর বিশাল ধ্বস নেমেছিল, অর্থাৎ এক আউন্স সোনার মূল্য ৪০ ডলার থেকে ১৬০ ডলার হয়ে যায়।

আসলে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থার ধ্বস সেই ক্ষণে সংঘটিত হবে যখন ইহুদীরা সেটাকে ডলারের অপসারণের সঠিক ক্ষণ বলে বিবেচনা করবে। তারা অবশ্য সেটা যে কোন সময়েই করতে পারে। কেননা কাগজের তৈরি মার্কিন ডলার স্পষ্টতই জাল। সত্যিকার অর্থে তার কোন মূল্যই নেই। যখন মার্কিন ডলারের কথিত ঐ ধ্বস সংঘটিত হবে, তখন সেটা তার সাথে পৃথিবীর অন্যান্য কাগুজে মুদ্রাকে টেনে নিয়ে রসাতলে যাবে। ঐ ধ্বসের ফলে সবচেয়ে লাভবান হবে ইসরাঈল রাষ্ট্র, কেননা যারা ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ করে তারাই এখন মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ করবে। সরকারগুলি আর বাজারে মুদ্রা ছাড়তে সক্ষম হবে না। বরং ইহুদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্যাঙ্কগুলো তখন প্লাস্টিক (অর্থাৎ ইলেকট্রনিক) মুদ্রা বাজারে ছাড়বে! ঐ মুদ্রা-উধাও সম্ভবত তখনই ঘটবে যখন ইসরাঈল আরবদের বিরুদ্ধে ব্যাপক যুদ্ধ পরিচালনা করবে এবং গোটা বিশ্বকে সাফল্যের সাথে অবজ্ঞা করবে। সামরিক ও রাজনৈতিক পেশীর ঐ সফল প্রদর্শনী আর তার সাথে কাগুজে টাকার ধ্বসের পথ ধরে লাভ করা নতুন অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ইসরাঈলকে পৃথিবীর নিয়ন্তা রাষ্ট্রের মর্যাদায় উন্নিত করবে। এই লেখক মনে করেন যে, আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরের ভেতর অথবা তার চেয়ে কম সময়ে ঐ ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে অনেক বারই ইসরাঈল সফলভাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে অবজ্ঞা করেছে। ফিলিস্তিনী মানব-বোমার কারণে ইহুদীরা প্রাণ হারালে ইসরাঈল যে সমস্ত ফিলিস্তিনী শহর দখল করে নিয়েছিল, সেখান থেকে তিনি তাদেরকে বাহিনী প্রত্যাহার করার দাবী জানিয়েছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয় নি। আর আমরা যখন লিখে চলেছি তখন মনে হচ্ছে ইসরাঈল সফল ভাবে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকেও অবজ্ঞা করতে সক্ষম হয়েছে, যা দাবী করেছিল যে ইসরাঈল যেন জাতিসংঘের সত্য অনুসন্ধানী মিশনকে, পশ্চিম তীরের জেনিন উদ্বাস্তু শিবির পরিদর্শন করার অনুমতি দেয়, যাতে তারা ইসরাঈলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অপরাধের অভিযোগগুলি তদন্ত করে দেখতে পারে।

রিবার আক্রমণের বাস্তবতা কি?

সমকালীন ইতিহাসে যে শক্তিগুলির উত্থান ঘটেছে এবং যে শক্তিগুলি ইসরাঈল রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে সম্ভব করেছে, সেই শক্তিগুলিই গোটা মানবকুলের ভিতর রিবা ছড়িয়ে দিয়েছে। একদিকে পবিত্র কুর'আন ঐ সমস্ত শক্তিকে ইয়াজুজ-মাজুজের জনবল বলে চিহ্নিত করেছে, আর অপর দিকে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) ভণ্ড-মসীহ্ দাজ্জাল সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন যে, দাজ্জালের ঐ যুগে সারা পৃথিবী রিবায় ছেয়ে যাবে। বিশেষ ইসলামি চিন্তাবিদ ও সাধক ড. মোহাম্মদ ইকবাল মুসলিম বিশ্বকে স্তম্ভিত করে দিয়ে সেই ১৯১৭ সালে ঘোষণা করেছিলেন যে, কুর'আনে বর্ণিত ইয়াজুজ-মাজুজের মুক্তি ইতোমধ্যেই ঘটে গিয়েছে। সুতরাং ব্যাপারটি একেবারে পরিস্কার যে, রিবার শক্তিগুলির মুসলিম উম্মার ভিতরে অনুপ্রবেশ, আসলে আল্লাহ্ নিজে যে সব দুষ্টশক্তি সৃষ্টি করেছেন তাদেরই আক্রমণকে বুঝায়। ঐ সব আক্রমণকারীদের লক্ষ্য হচ্ছে মুসলিম জগত সমেত সবাইকে, আদম (আঃ) থেকে নিয়ে শেষ দিবস পর্যন্ত মানবকুল যে সব পরীক্ষার সম্মুখীন হবে, তার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষায় জড়িয়ে ফেলা। ঐ সব আক্রমণকারীদের লক্ষ্য হচ্ছে, ইহুদীদের ধোঁকা দেওয়া এবং তাদের চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়া। ঐ আক্রমণ ধারার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে রিবার পরীক্ষা! আমরা এখন সেই পরীক্ষার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছি। রিবার আক্রমণের বাস্তবতা এমনই। এ পর্যন্ত যা প্রমাণিত হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধ ইহুদী জগত এই পরীক্ষায় করুণভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। মুসলিম জগতও একইভাবে অন্ধ বলেই মনে হচ্ছে।

ইসরাঈলের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলার যুদ্ধ

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা রিবার বর্ণনায় এমন শক্তিশালী ভাষা ব্যবহার করেছেন যে শিরকের পরে বিশ্বাস ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে মনে হয় এটাই সর্বনিকৃষ্ট পাপকর্ম। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে (রিবার অত্যাচারের কারণে) আল্লাহ্র ক্রোধ এতই ব্যাপক যে, পুনরুত্থানের পরে তারা যখন আল্লাহ্র সামনে দাঁড়াবে তখন তাদের দেখে মনে হবে যে, শয়তানের স্পর্শের কারণে তারা উন্মাদ হয়ে গেছে। ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈল যখন রিবার পাপে লিপ্ত হয়, তখন আল্লাহ্ যে ঐ সকল মানুষকে কেবল পরবর্তী জীবনেই শায়েস্তা করবেন তাই নয়, বরং এই পৃথিবীতেও তিনি এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ ۖ
وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

"হে মুমিনগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর, এবং তোমাদের বাকী সুদের দাবী ত্যাগ কর, যদি তোমরা মুমিন হও।

"তোমরা যদি তা না কর তাহলে আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা গ্রহণ কর:

"তবে তোমরা যদি ক্ষান্ত হও তবে তোমাদের মূল অর্থ ফিরে পাবে; তোমরা অন্যায় আচরণ করো না এবং তোমাদের সাথে অন্যায় আচরণ করা হবে না।"

(কুর'আন, সুরা বাক্বারা ২:২৭৮-২৭৯)

এই গ্রন্থে এ ব্যাপারে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে, সারা পৃথিবী জুড়ে আজ ইহুদীরা ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তথাপি পবিত্র কুর'আনের উপরোক্ত আয়াতে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যে রিবার নিষিদ্ধতার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছেন তারই ইঙ্গিত রয়েছে। ঐশ্বরিক ওহীর গোটা ইতিহাসে, আমার জানা মতে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ এমন কঠিন ভাষা রিবা ছাড়া আর কোন ব্যাপারে ব্যবহার করেননি। কারো মনে যদি এই বিষয়ের সর্বোচ্চ গুরুত্বের ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে, এখন তা দূর হয়ে যাওয়া উচিত। রিবার বিষয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করার যে সামর্থ আল্লাহ্‌ তা'আলা তা'লার রয়েছে, তার নমুনা তিনি বনী ইসরাঈলকে ইতোমধ্যেই দেখিয়েছেন। তিনি যে শিক্ষা তাদেরকে দিয়েছেন, তা বিশেষভাবে পাকিস্তানের ভয় সহকারে স্মরণ করা উচিত!

সুলায়মান (আঃ)-এর মৃত্যুর পরে, ইসরাঈলীরা বহুবার তৌরাতকে পুনর্লিখিত করে বহু সংস্করণ প্রকাশ করেছে। হার্ভার্ড প্রশিক্ষিত আমেরিকান বাইবেল পণ্ডিত Richard Friedman তার গুরুত্বপূর্ণ লেখা: Who Wrote the Bible? (New York, Harper & Row, 1989) গ্রন্থে এটা যথার্থভাবে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। আরব ভূমিতে ইব্রাহীম (আঃ) এবং ইসমা'ঈল (আঃ) কর্তৃক নির্মিত উপাসনালয় (অথবা মসজিদ) সম্পর্কে সমস্ত উল্লেখ ইসরাঈলী বংশোদ্ভূতরা তৌরাত থেকে মুছে ফেলেছে। পবিত্র কা'বা ও হজ্জ সম্বন্ধে তৌরাতে এখন আর কিছুই পাওয়া যাবে না। এ ছাড়াও তারা কুরবানীকৃত পুত্র হিসাবে ইসমা'ঈল (আঃ)-এর নামের জায়গায় তার ভাই ইসহাক (আঃ)-এর নাম বসিয়ে দিয়েছে, যদিও যখন ঐ কুরবানীর পরীক্ষা নেয়া হয়, তখন ইসহাক (আঃ)-এর জন্মই হয়নি। উপরন্তু, কুরবানীর সন্তানকে পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্‌ হালীম (ধৈর্যশীল) বলে বর্ণনা করেছেন (সুরা সাফ্‌ফাত, ৩৭:১০১), অথচ সারার ঘরে জন্ম নেয়া পুত্রকে 'আলীম (জ্ঞানী) হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে (সুরা হিজর, ১৫:৫৩)। কুরবানীর স্থান হিসেবে তাঁরা আরব ভূমির পরিবর্তে, ফিলিস্তিনকে উল্লেখ করেছে।

মরুভূমির বালুতে জিবরাইল (আঃ) তাঁর পায়ের গোড়ালী ঘষলে জমজম নামের যে অলৌকিক ঝরণার মাধ্যমে পানি বেরিয়ে আসে, তাদের বর্ণনায় এখন সেটা হয়ে গেছে ফিলিস্তিনের এক কূপবিশেষ। তৌরাতে ইসমা'ঈল (আঃ)-কে তারা "এক বন্য গর্দভতূল্য মানুষ" হিসেবে বর্ণনা করে পিশাচে পরিণত করেছে এবং আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার থেকে তাঁকে উহ্য রেখেছে, যাতে তারা নিজেদেরকে একান্তভাবে আল্লাহ্‌র 'বাছাইকৃত' জনগোষ্ঠী হিসেবে দাবী করতে পারে। অবশ্য সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যে কাজটা তারা করেছে সেটা হল রিবার বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র নিষেধাজ্ঞাকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃতকরণ। তারা নিজেদের মধ্যে রিবার লেনদেনকে নিষিদ্ধ রেখে, অ-ইসরাঈলীদের মধ্যে সুদের ভিত্তিতে ঋণদানের অনুমোদন দিয়ে তৌরাতের লেখাকে বদলে ফেলেছে (তৌরাত, দ্বিতীয় বিবরণ ২৩:২০-২১)।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা এই জঘন্যতম পাপের প্রতি তাঁর প্রতিক্রিয়া দেখাবার জন্য তাঁর এক যুদ্ধবাজ বান্দাকে তাদের বিরুদ্ধে পাঠান। ব্যবিলনীয় রাজা বুখতা নসর ফিলিস্তিনকে তছনছ করে দেন, ইসরাঈলীদের পরাভূত করেন, ইসরাঈল রাষ্ট্র ও মসজিদ আল-আক্সাকে {যা সুলায়মান (আঃ) নির্মাণ করেছিলেন} ধ্বংস করে দেন এবং বন্দীদেরকে ক্রীতদাস হিসেবে ব্যবিলনে নিয়ে যান (সুরা ইসরা ১৭:৪,৫)। এটা অত্যন্ত নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্‌র যুদ্ধ পরিচালনার একটা শক্তিশালী প্রদর্শনী ছিল।

তাঁর শক্তির দ্বিতীয় প্রদর্শনী সংঘটিত হয় যখন রোমান সম্রাট টাইটাস জেরুজালেমকে লণ্ডভণ্ড করেন এবং উপাসনালয়টি (অর্থাৎ মসজিদটিকে) দ্বিতীয়বারের মত ধ্বংস করে দেন (সুরা ইসরা, ১৭:৭, ১০৪)। এই ঘটনার সাথেও রিবার সম্পর্ক ছিল। আল্লাহ্ ইসরাঈলীদের কাছে তিনজন নবী পাঠিয়েছিলেন: যাকারিয়া (আঃ), ইয়াহিয়া (আঃ) এবং ঈসা (আঃ)। ইসরাঈলীদের যে অংশ এই নবীদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারাই আজ ইহুদী হিসেবে পরিচিত (আল-ইয়াহুদ)। ইহুদীরা যাকারিয়া (আঃ)-কে মসজিদ আল-আক্সার ভিতরে হত্যা করল (মথি, ২৪:৩৫-৩৬; লূক, ১১:৫১), প্রতারণার সাথে ইয়াহিয়া (আঃ)-এর শিরোচ্ছেদ করা হল। আর সবশেষে কিভাবে ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করেছিল সে ব্যাপারে ইহুদীরা গর্বপ্রকাশ করল। তিনটি উদাহরণের সবকটিতেই, আল্লাহ্‌র নবীরা তাদেরকে আক্রমণ করেছিলেন এবং তাদের শয়তানীর জন্য তাদেরকে নিন্দা করেছিলেন। তৌরাতের বাণীতে পরিবর্তন এবং রিবা গ্রহণ সেই নিন্দার ভিতরে বিশেষভাবে অন্তর্ভূক্ত ছিল। উদাহরণ স্বরূপ ঈসা (আঃ) মসজিদ আল-আক্সাতে যান এবং তাদেরকে রিবায় লিপ্ত দেখতে পান। তিনি তাদের অভিসম্পাত করেন, তাদের টেবিল উল্টে দেন, মসজিদ থেকে তাদের তাড়িয়ে দেন এবং ঘোষণা করেন: "*তোমরা আল্লাহ্‌র ঘরকে দখল করে চোরের আড্ডায় পরিণত করেছ।*" আর এভাবেই আল্লাহ্‌র রাসুলগণ অন্যান্য পাপাচারের সাথে, রিবা গ্রহণের নোংরামির

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন, যেজন্য তারা তাঁদেরকে হত্যা করল {অবশ্য ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্ অলৌকিকভাবে রক্ষা করলেন}। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এই দুষ্কর্মের প্রতিক্রিয়ায় এক রোমান বাহিনী প্রেরণ করেন যা ইসরাঈল রাষ্ট্রকে দ্বিতীয় বারের মত ধ্বংস করে দেয়। (এবার এই রাষ্ট্র তৃতীয় ও শেষবারের মত ইমাম আল-মাহ্দীর নেতৃত্বে এক মুসলিম বাহিনীর হাতে ধ্বংস হবে)।

রিবা গ্রহণের কারণে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে যুদ্ধ ঘোষণার সতর্কবাণী আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে যখন আমরা দেখি যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতির সর্বপ্রথম মসজিদ (অর্থাৎ কা'বাকে) রক্ষার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। ঐ সময় আবরাহা তার হাতী সংবলিত বাহিনী নিয়ে সেটাকে ধ্বংস করতে এসেছিল (কুর'আন, সুরা ফিল ১০৫:১-৫)। যখন পবিত্র কা'বা মূর্তি দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, তখনও আল্লাহ্ তা'আলা সেটাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে হস্তক্ষেপ করেন। অথচ দ্বিতীয় মসজিদে (মসজিদ আল-আক্সাতে) কোন মূর্তিই ছিল না, তবুও আল্লাহ্ তা'আলা দু'দুবার সেটাকে ধ্বংস করতে শক্তিশালী বাহিনী পাঠান। রিবা দ্বারা সৃষ্ট নিপীড়নের ব্যাপারে আল্লাহ্র ক্রোধের মাত্রা এমনই।

ধর্মনিরপেক্ষ ইসরাঈল রাষ্ট্রের শির্ক ও এর অর্থনৈতিক জীবনের রিবা উভয়ই যে স্পষ্টত 'পবিত্রভূমির' উত্তরাধিকারের জন্য আরোপিত ঐশ্বরিক শর্তসমূহকে লংঘন করে, সেটা হচ্ছে ইহুদীদের জন্য এক ভয়ঙ্কর সতর্কবাণীর ব্যাপার। ঐ ধরনের শর্ত লঙ্ঘনের পরিণতি হবে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে শাস্তিদানের মাধ্যমে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবেন।

উপসংহার

উপসংহার

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ۗ
قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ
وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ
أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٤٤﴾

"আমরা যদি একে অনারব ভাষায় কুর'আন করতাম, তবে অবশ্যই তারা বলত: এর আয়াতগুলি পরিস্কার ভাষায় বিবৃত হয়নি কেন? কি আশ্চর্য যে, কিতাব অনারব ভাষায় আর রসূল আরবীভাষী!

"বলুন, এটা মুমিনদের জন্য হেদায়েত ও রোগের প্রতিকার।

"যারা মুমিন নয়, তাদের কানে আছে ছিপি, আর কুর'আন তাদের জন্যে অন্ধত্ব।

"তাদেরকে যেন দূরবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করা হচ্ছে!"

(কুর'আন, সুরা ফুস্‌সিলাত ৪১:৪৪)

এক্ষণে আমরা এই গ্রন্থের মূল বক্তব্যগুলিকে সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ করে সমাপ্ত করার পর্যায় এসেছি। বক্তব্যগুলি এরকম। আশ্চর্যজনক এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ইউরোপের পৌত্তলিক সমাজকে একটি ক্ষুদ্র ও প্রভাবশালী ইহুদী গোষ্ঠীসহ মূলত খৃস্টান সমাজে রূপান্তরিত করল, শেষ অবধি তার চেয়েও বেশী আশ্চর্যজনক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পথ ধরে আজ ঐ একই ইউরোপীয় জনগণ কার্যত ধর্ম-বিমুখ সমাজে পরিণত হয়েছে। খৃস্টান এবং ইহুদী হবার পরে, আধুনিক ধর্ম-বিমুখ 'শ্বেতাঙ্গ মানুষ' খৃস্টধর্ম এবং ইহুদীধর্ম উভয়কেই উৎখাত করেছে এবং এই ঐশী ধর্ম দুটির ভিতরে পবিত্র যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাও ধ্বংস করে দিয়েছে।

আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ শ্বেতাঙ্গ মানুষ এবং তার বাদামী, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ নকলবাজেরা এখন ইসলামকে নিয়ে তাই করতে চায় যা ইহুদীধর্ম ও খৃস্টধর্মের বেলায় ইতোপূর্বেই সংঘটিত হয়েছে। এটাই হচ্ছে এক হাজার বছর ধরে, ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধের মৌলিক ব্যাখ্যা যা ১১ই সেপ্টেম্বরের পরে সর্বাধিক ক্রোধের সাথে ব্যাপ্তি লাভ করেছে। মুসলিমরা এখন সুপরিকল্পিত ও সুচিন্তিত চাপের সম্মুখীন, যার ফলে তাদেরকে ইসলামের পুনর্মূল্যায়ন ও নিজের ধর্মকে পরিবর্তন করার চিন্তা করতে হচ্ছে, যাতে ইসলাম নতুন বিশ্বজনীন ধর্ম-বিমুখ সমাজে ঠাঁই পেতে পারে। ইসলামের নতুনভাবে সাজানো রূপ তুলে ধরতে হবে যা ইহুদীদেরকে পৃথিবীর নিয়ন্তা গোষ্ঠী হিসেবে

এবং ইসরাঈল রাষ্ট্রকে পৃথিবীর নিয়ন্তা রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নেবে। এটা অতি অবশ্যই এমন ইসলাম হতে হবে, যার মধ্যে জিহাদের কোন ধারণাই আর থাকবে না।

মুসলিমদের এখন বলা হচ্ছে যে, এই নতুন বিশ্বসমাজের মূল্যবোধ বাস্তবিকই নির্ভেজাল ইসলামের বিশ্বজনীন মূল্যবোধ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এই নতুন বিশ্ব সমাজ এবং এর নগরভিত্তিক উচ্চশ্রেণী হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিমা সভ্যতার ফসল, যারা ঐ ধর্ম-বিমুখ সভ্যতার মূল্যবোধকে আপন মনে করে। ঐ সমস্ত মূল্যবোধের ভিতর রয়েছে রাজনৈতিক শির্ক যা এখন সমগ্র মানবকুলকে তার মরণ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেছে। আর রয়েছে আধুনিক অর্থনীতির রিবা যা মানবকুলকে নতুন অর্থনৈতিক দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে।

ঈশ্বরবিবর্জিত পশ্চিমা সভ্যতা ইসরাঈলের ইহুদী রাষ্ট্র ও সৌদি আরবের সৌদি-ওহাবী রাষ্ট্র দুটোরই প্রতিষ্ঠাকে সম্ভবপর করেছে এবং ঐ একই পশ্চিমা সভ্যতা ইসরাঈল ও সৌদি আরব দুটি রাষ্ট্রেরই জন্মলগ্ন থেকে আজ অবধি টিকে থাকাকেও নিশ্চিত করেছে। (দেখুন আমাদের গ্রন্থ: The Caliphate, the Hejaz and the Saudi-Wahhabi Nation State)। আজকের পৃথিবীকে বুঝতে পারার চেষ্টায় মুসলিমদের জন্য এটাই হচ্ছে চাবিকাঠি। এই ব্যাপারগুলির কোনটিই, পবিত্র কুর'আনের সাহায্য ছাড়া ব্যাখ্যা করা যাবে না। এই গ্রন্থের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত যে কুর'আনিক ব্যাখ্যা ফুটে উঠেছে, তা এই যে, আজকের পৃথিবী ইয়াজুজ-মাজুজ তথা 'ভণ্ড-মসীহ্' দাজ্জালের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে।

রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) আল্লাহ্র ঐ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে গেছেন; সেটি অনুযায়ী ইহুদীরা (বনী ইসরাঈল) কুমারী মরিয়মের পুত্র ঈসা মসীহ্ (আঃ)-কে প্রত্যাখ্যান করার পর এবং তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করার চেষ্টা করার পর, 'পবিত্রভূমি' থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল। তারপর মহান দয়ালু আল্লাহ্ তাদেরকে তাঁর দয়া ভিক্ষা করার জন্য, একটা নির্দিষ্ট সময়ের অবকাশ দিয়েছিলেন: *"এমনও হতে পারে যে তোমাদের প্রভু এখনও তোমাদের প্রতি করুণা করতে পারেন।"* (কুর'আন, সুরা বনী ইসরাঈল ১৭:৮)। এবং তিনি তাদের জন্য করুণা লাভ করার মাত্র একটি দ্বারই উন্মুক্ত রেখেছিলেন। করুণা লাভের ঐ পথ ছিল আর একজন নবী যিনি শেষ নবী হিসাবে তখনও আবির্ভূত হননি। তিনি ছিলেন রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)। আল্লাহ্র করুণা লাভ করার জন্য ইহুদীদেরকে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হত এবং তাঁকে অনুসরণ, সম্মান ও সহায়তা করতে হত (কুর'আন, সুরা আ'রাফ, ৭:১৫৭)।

ইসরাঈলী ইহুদীরা, মোহাম্মদ (সাঃ)-কে প্রত্যাখ্যান করলে তার অর্থ হবে এই যে, আল্লাহ্র করুণার ঐ দ্বার বন্ধ হয়ে যাবে এবং শেষ যুগের সমাপনী ঘন্টা বেজে

উঠবে। আল্লাহ্ তা'আলা তখন তাদেরকে সেইখানে অর্থাৎ পবিত্রভূমিতে ফিরিয়ে আনবেন, যেখানে তাদের বৃহত্তম অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল (কুর'আন, সুরা বনী ইসরাঈল ১৭:১০৪)। 'পবিত্রভূমিতে' ইহুদীদের প্রত্যাবর্তন এই ইঙ্গিত দেয় যে, তাদের উপর আল্লাহ্র চূড়ান্ত শাস্তির সূচনা ঘটেছে। এই গ্রন্থে ঘোষণা করা হয়েছে যে, সেরকম সময় সমাগত। মদীনায় রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আগমনের পরের ১৭ মাস ছিল ইহুদী ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। ঐশ্বরিক করুণার দ্বার তখন উন্মুক্ত ছিল। ১৭ মাস পরে যখন এটা পরিস্কার হয়ে উঠল যে, ইহুদীরা যে মোহাম্মদ (সাঃ)-কে নবী হিসাবে প্রত্যাখ্যান করেছে শুধু তাই নয়, তারা ইসলামকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে রত, আল্লাহ্ তা'আলা তখন কিব্লা পরিবর্তনের নির্দেশ দিলেন। এর নিহিতার্থ এই যে, ইহুদীদের জন্য আল্লাহ্র করুণার দ্বার তখন বন্ধ হয়ে গেল। আর কখনই তারা 'পবিত্রভূমির' উত্তরাধিকার অর্জনের যোগ্যতা লাভ করতে পারবে না। তার পরিবর্তে মুসলিমদেরকে সেই উত্তরাধিকার দেয়া হয়েছে:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

"(ইহুদীদের পরে) তিনি তোমাদেরকে (মুসলিমদেরকে) (পবিত্র) ভূমির উত্তরাধিকার দান করেছেন এবং একে অন্যের উপর মর্যাদায় সমুন্নত করেছেন,

"যেন তিনি তোমাদের যা দান করলেন (উল্লেখ্য, অন্য যে কোন জনগোষ্ঠীর চেয়ে বনী ইসরাঈল অধিক মাত্রায় লাভ করেছিল) তা দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন। আপনার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদাতা এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।"

(কুর'আন, সুরা আন'আম ৬:১৬৫)

ঠিক এমনই এক সময়, অর্থাৎ কিবলা পরিবর্তনের পরে, কিন্তু রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওফাতের আগে, দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজকে মুক্তি দেয়া হয়। কেবলমাত্র একচক্ষুবিশিষ্ট মুসলিমরাই এখনও ইহুদীদের সাথে আন্ত-ধর্ম জমায়েত তথা যৌথ প্রার্থনা সভায় যোগ দিতে পারে! এটা বুঝতে হবে যে, অতীতের বহু দুষ্ট কার্যকলাপ এবং বর্তমানে তারা যা করে চলেছে, এসবের ফল ভোগ করতে আজ ইহুদীদেরকে 'পবিত্রভূমিতে' ফিরিয়ে আনা হয়েছে। অবশ্যই তাদের অন্যায়ের তালিকার শীর্ষে রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ।

ইহুদীরা ইতোমধ্যেই অনুধাবন করেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে অতীতে বহু বার শায়েস্তা করেছেন। এই গ্রন্থে ঐ ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে ইহুদীরা তাদের চূড়ান্ত শাস্তি না পাওয়া পর্যন্ত ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটতে পারে

না। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এ বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে গেছেন যে, একটা মুসলিম বাহিনী জেরুজালেম জয় করবে, ভণ্ড ইসরাঈল রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে দেবে এবং ইহুদীদেরকে শায়েস্তা করবে। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অনুসারীগণ এভাবে 'পবিত্রভূমিকে' মুক্ত করবে। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ঐ ভবিষ্যদ্বাণীকে আমরা এখানে আরেকবার তুলে দিলাম:

"আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন যে, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: খোরাসান (আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইরানের কিছু অংশ ও মধ্য এশিয়ার মাঝে বিভক্ত অঞ্চলসমূহ নিয়ে গঠিত একটি এলাকা) থেকে কালো পতাকা বেরিয়ে আসবে এবং কোন শক্তি তাদেরকে Aelia (জেরুজালেম) পৌঁছান পর্যন্ত রোধ করতে পারবে না।"

(সুনান, তিরমিজী)

এজন্যই *'পবিত্র কুর'আনে জেরুজালেম'* গ্রন্থখানি বার বার পড়া উচিত; এভাবেই তা প্রত্যেক পাঠককে পবিত্র কুর'আনের বিশ্লেষণধর্মী শিক্ষা ও রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) কর্তৃক প্রদত্ত তার ব্যাখ্যার দিকে নিয়ে যাবে। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) জেরুজালেম ও শেষ যুগে এর ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে গেছেন। তিনি যা বলে গেছেন তার মাঝে রয়েছে:

"আওফ ইব্নে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত: গাযওয়ায়ে তাবুকের সময় আমি রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে দেখা করতে গেলাম। তিনি চামড়ার তাঁবুতে বসে ছিলেন। তিনি বললেন কেয়ামত ঘনিয়ে আসার ছয়টি নিদর্শন লক্ষ্য কর: আমার মৃত্যু, জেরুজালেম বিজয়, একটা মহামারী যা তোমাদের আক্রমণ করবে (এবং তোমাদের মধ্যে বহু সংখ্যক এতে মৃত্যুবরণ করবে) যেমন ভেড়ার পাল মহামারীতে আক্রান্ত হয়, সম্পদের এমন পরিমাণ বৃদ্ধি যে যদি কাউকে একশ দীনারও দেওয়া হয় তবু সে তাতে তৃপ্ত হবে না, তারপর এমন এক ফিতনা আসবে যা থেকে কোন আরব গৃহ বাঁচতে পারবে না, এবং তোমাদের এবং বনী আল-আস্ফার (অর্থাৎ বাইজান্টিন)-এর মাঝে এক সন্ধি যা ভঙ্গ করে তারা ৮০টি বাহিনী নিয়ে তোমাদেরকে আক্রমণ করবে, প্রতিটি বাহিনীতে থাকবে ১২ হাজার সৈন্য।"

(সহীহ বুখারী)

"আবদুল্লাহ ইব্নে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত: তোমরা নিশ্চিতভাবে ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না পাথরসমূহ কথা বলবে (এই বলে): হে আব্দুল্লাহ্ (অর্থাৎ হে আল্লাহ্র বান্দা)! আমার পিছনে একজন ইহুদী লুকিয়ে আছে, তাকে হত্যা কর।"

(সহীহ বুখারী)

"আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত: আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) বলেন: মুসলিমরা ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত শেষ প্রহর আসবে না। মুসলিমগণ ইহুদীদের হত্যা করতে থাকবে এবং এমন অবস্থা আসবে যে, ইহুদীরা একটি পাথর অথবা একটি গাছের পেছনে লুকাবে এবং পাথর বা গাছ বলবে: হে মুসলিম, (অথবা, হে আল্লাহ্র বান্দা)

আমার আড়ালে একজন ইহুদী আছে, এস তাকে হত্যা কর; কেবল গারকাদ নামক বৃক্ষটি তা বলবে না, কেননা ওটা হচ্ছে ইহুদীদের বৃক্ষ।"

(সহীহ্ মুসলিম)

ইতিহাসে প্রথম বারের মত মনে হয় যুদ্ধে 'পাথর' ব্যবহার করা হচ্ছে। ফিলিস্তিনী মুসলিমদের ইন্তিফাদা (অভ্যুত্থান) ইসরাঈলী নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিক্রিয়া 'পাথরের' সাহায্যে ব্যক্ত করে চলেছে। ইসরাঈলের জন্য তা হচ্ছে একটি অশুভ ইঙ্গিত। উপরন্তু ইসরাঈল 'পবিত্রভূমিতে' নির্বিচারে 'বৃক্ষ' নিধনে আত্মনিয়োগ করেছে। মুসলিম তথা খৃস্টান ফিলিস্তিনী জনগণের উপর, অর্থনৈতিক দুর্ভোগ বাড়ানোর এক শয়তানী প্রচেষ্টায় ইসরাঈল ইতোমধ্যেই হাজার হাজার জলপাই বৃক্ষ ধ্বংস করেছে। এই সব ফাসাদপূর্ণ (চরম নিপীড়ন ও নীতিবিগর্হিত) কর্মের বিরুদ্ধে এমন ক্রোধের সৃষ্টি হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত করে *'পবিত্রভূমিতে' 'বৃক্ষরাজি' ও 'পাথরসমূহ' এখন কথা বলতে শুরু করেছে*। অবশ্যই বাহ্যিক কর্ণদ্বয়ের মাধ্যমে, বৃক্ষরাজি ও পাথররাশির বক্তব্য শোনা যায় না। তবে যার ঈমান আছে সে হৃদয়ে অন্তর্নিহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, বৃক্ষরাজি ও পাথররাশির বক্তব্য শুনতে পারে! সৌদি, মিসরীয়, তুর্কী, জর্ডানী ও পাকিস্তানী সরকার সহ সারা পৃথিবী ব্যাপী আরো অনেক সরকার যে 'পবিত্রভূমিতে' পাথরের বক্তব্য শুনতে অক্ষম বলে মনে হয়, তার একটা ব্যাখ্যা এখান থেকে পাওয়া যায়!

আমাদের মতে, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী ফিলিস্তিনী ইন্তিফাদার মাধ্যমে ইতোমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে। সময়ের সাথে সাথে পাথররাশি উত্তরোত্তর আরো বেশি বেশি শব্দ সহকারে কথা বলে উঠবে। কেবলমাত্র তারা যারা আধ্যাত্মিক দিক থেকে বধির ও মৃত, সেই শব্দ শুনতে ব্যর্থ হবে। ঐ পাথররাশি যদি এখন গোটা বিশ্বের মুসলিমদের কাছে চিৎকার ক'রে 'পবিত্রভূমিকে' ইহুদী জবরদখল ও নিপীড়ন থেকে মুক্ত করার আবেদন জানিয়ে থাকে, তার নিহিতার্থ হবে এই যে, মুসলিমদের উচিত নিজেদেরকে সুসংহত করা ও নিজেদের সমস্ত শ্রম ও সামর্থকে ঐ সংগ্রামের জন্য একত্রিত করা; এবং ঐ সংগ্রামকে সকল পার্থিব লক্ষ্য, তথা যেসব জনগণ ইতোমধ্যেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করছে, তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ইত্যাদির ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে। খুব যুক্তিযুক্ত ভাবেই এর অর্থ হবে এই যে, যেসব ভূমিতে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও ইসরাঈলের পক্ষে সমর্থন সবচেয়ে স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়, সেসব ভূমিতে মুসলিমরা বসবাস করতে পারে না। সেরকম দেশ হবে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ইত্যাদি। মুসলিমগণ অবশ্যই ঐ সব ভূমি থেকে হিজরত করবে এবং এমন ভূখণ্ডে বসবাস করতে যাবে, যেখানে তাদের ঈমানের উন্নততর সুরক্ষা সম্ভব এবং তাদের পক্ষে 'পবিত্রভূমি' মুক্ত করার সংগ্রামকে সমর্থন করা সম্ভব। সারা পৃথিবী ইসরাঈল কর্তৃক সৃষ্ট

ও টিকিয়ে রাখা নিপীড়নকে আরো বেশি বেশি করে অনুধাবন করতে বাধ্য হচ্ছে; এমন নিপীড়ন যা রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তখন পর্যন্ত বাড়তে থাকবে যখন:

"... কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মানুষ ধর্মীয় কারণে নয় বরং নিপীড়নের কারণে তার উপর গড়াগড়ি খেয়ে বলবে: আমি যদি এই কবরে (মৃত মানুষটির পরিবর্তে) থাকতে পারতাম।"

(সহীহ মুসলিম)

এই গ্রন্থে নির্দেশিত সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণী এই যে, যতই দিন যাবে ততই ইসলামের প্রতি বিশ্বস্ত প্রতিটি মুসলিমের উপর নিপীড়নের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে। বাস্তবিকই **১১ই** সেপ্টেম্বরের পর থেকে বিশ্ব জুড়ে মুসলিমদের উপর অত্যাচার-নিপীড়ন নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মুসলিমগণ এখন সকল পরীক্ষার বৃহত্তম পরীক্ষায় দিন অতিক্রান্ত করছে। পৃথিবীর বর্তমান নিয়ন্তা রাষ্ট্র (যুক্তরাষ্ট্র), পরবর্তী নিয়ন্তা রাষ্ট্রের (ইসরাঈল) জন্য পৃথিবীকে একটা নিরাপদ স্থান করে তোলার প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দিচ্ছে!

পবিত্র কুর'আন সুরা কাহাফে যে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে, একমাত্র তার সাহায্যেই মুসলিমগণ এই সর্বনাশী ঝড়ের মুখে দাঁড়িয়ে থাকার চিন্তা করতে পারে। শুধুমাত্র সেই পথ-প্রদর্শক এ যুগে মুসলিমদের সফল ভাবে দিক নির্দেশনা দিতে পারেন যিনি এই যুগকে বুঝতে পেরেছেন এবং যার অন্তর্দৃষ্টি পবিত্র কূর'আন এবং রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাদীসসমূহের ভিত্তিতে গঠিত। ঐরকম একজন পথ-প্রদর্শক আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ও তার নির্বাচন রাজনীতির শির্ককে বুঝতে সক্ষম হবেন, অতএব নিজে ধর্মনিরপেক্ষ শাসনতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকবেন, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নির্বাচন রাজনীতি থেকে বিরত থাকবেন, এবং মুসলিমদেরকে শির্ক থেকে বেঁচে থাকার উপদেশ দেবেন। তিনি আধুনিক অর্থনীতির রিবাও বুঝতে সক্ষম হবেন এবং মুসলিমদেরকে যতদূর সম্ভব সকল প্রকার রিবা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেবেন। কাগুজে মুদ্রা যে হারাম, এ ব্যাপারটা তিনি অনুধাবন করবেন এবং মুসলিমদেরকে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার ব্যবহারে ফিরে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন, যেসব মুদ্রাকে বাজারে কেনা বেচার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। (অবশ্য এটার সম্ভাবনা খুবই কম যে, 'আন্তর্জাতিক ইহুদী চক্র' কখনই মালয়েশিয়ার সরকারকে বাজারে কেনাবেচার জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ব্যবহারের পুনঃপ্রচলন করতে দেবে)।

বর্তমানে ইসলামি ব্যাঙ্ক, অন্যান্য ব্যাঙ্ক, ক্রেডিট ইউনিয়ন ও অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পিছনের দরজা দিয়ে যে রিবার অনুশীলন করে চলেছে, সে ব্যাপারটা আমাদের ঐ পথ-প্রদর্শক বুঝতে পারবেন, ও তাঁর জনগণকে সে ব্যাপারে

সতর্ক করতে পারবেন। ঐরকম একজন পথ-প্রদর্শক আজকের যুগকে ইয়াজুজ-মাজুজ ও ভণ্ড-মসীহ্ দাজ্জালের যুগ বলে ঘোষণা করবেন। বাকি সকলের বেলায় বলা যায় যে তারা মনের আনন্দে শিশ দিয়ে বেড়াচ্ছেন।

Sura Al-Kahf and The Modern Age নামের আমার গ্রন্থ, যেটা এখন লেখা হচ্ছে, সেটা ইনশাআল্লাহ্ পবিত্র কুর'আনের ঐ সুরা যে দিক নির্দেশনা দেয় সেটাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবে। ঐ দিক নির্দেশনার মূল কথা হচ্ছে নিজেদেরকে আধুনিক জগতের স্রষ্টা-বিমুখ শহরগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করা, এবং এমন গ্রামাঞ্চলে স্থানান্তরিত হওয়া, যেখানে জমির মূল্য কম এবং পানির অভাব নেই। তারপর ঐ রকম জায়গায় মুসলিম গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে ইসলামকে জীবনযাত্রা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমার শিক্ষক ড. মোহাম্মদ ফজলুর রহমান আনসারীর দুই খণ্ডে সমাপ্ত পুস্তক The Quranic Foundation and Structure of Muslim Society হচ্ছে বর্তমান অবস্থায় টিকে থাকার একটা নীল নকশা, যা পবিত্র কুর'আনের ঐ সমস্ত সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনাকে তুলে ধরেছে যার প্রয়োগ ঐ ধরনের মুসলিম গ্রামে সত্যিকার ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হলে অপরিহার্য। ড. আনসারীর গ্রন্থের সর্বশেষ সংস্করণের মুখবন্ধে বর্তমান লেখক এ ব্যাপারটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে, এবং আমাদের পাঠকদেরকে পড়ে দেখার জন্য বিনীতভাবে আবেদন জানাচ্ছে।

যে শিশুরা কথিত ঐ (ঈশ্বরবিবর্জিত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন) মুসলিম গ্রামগুলিতে বড় হবে, তাদেরকে নিয়েই ভবিষ্যতের সেই বাহিনী গড়ে উঠবে যা 'পবিত্রভূমিকে' একদিন মুক্ত করবে।

সংযোজন

প্রথম সংযোজন

গ্যালিলি হ্রদ

(টাইবিরিয়াস হ্রদ বা কিনেরেট হ্রদ বলেও পরিচিত)

সমগ্র 'পবিত্রভূমির' জন্য এখনও পর্যন্ত গ্যালিলি হ্রদই হচ্ছে মিঠা পানির প্রধান উৎস। ইসরাঈলী, ফিলিস্তিনী ও জর্ডানবাসীরা তাদের পানির জন্য গ্যালিলি হ্রদের উপর উল্লেখযোগ্যভাবে নির্ভরশীল। গ্যালিলি হ্রদ যদি কখনও শুকিয়ে যায় {যেমনটি রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাদীসে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে}, ইসরাঈলীরা সহজেই সমুদ্রের পানির লবণাক্ততা দূরীকরণ প্রকল্প ব্যবহার করে তাদের মিঠা পানির অভাবের সমাধান করতে পারবে। কিন্তু ফিলিস্তিনী ও জর্ডানবাসীদের জন্য কোন বিকল্প থাকবে না। তারা এক ধরনের জিম্মী হয়ে পড়বে এবং বেঁচে থাকার জন্য ইসরাঈলীদের কাছ থেকে পানি কিনতে বাধ্য হবে। ইহুদীরা রিবার অর্থনৈতিক অস্ত্র প্রয়োগ ক'রে ইতোমধ্যেই তাদেরকে যেভাবে দারিদ্রসীমার নিচে নিয়ে গেছে, তাতে বুঝা যায় যে তাদের ঐ ধরনের প্রকল্প থেকে পানি কেনার সামর্থ থাকবে না। যার ফলশ্রুতিতে পানি পাবার জন্য, তাদেরকে ইসরাঈলের কাছে রাজনৈতিকভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে। আর তারা যদি তা না করে, সেক্ষেত্রে তারা মৃত্যুবরণ করবে।

গ্যালিলি হ্রদের পানির গভীরতা এখন এতই নেমে গেছে যে, ইসরাঈলের তার 'পানির চাল' ব্যবহার করার ক্ষণটি আর খুব বেশী দূরে নেই।

Uri Saguy হচ্ছেন ইসরাঈল রাষ্ট্রের জাতীয় পানি কোম্পানী বোর্ড, Mekorot-এর চেয়ারম্যান। বোর্ডের এক সাম্প্রতিক সভায় (২০০০-এর ডিসেম্বরের শুরুতে) তিনি মন্তব্য করেন: *"দেশের পানিসম্পদ আজ বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে এবং সরকার এই সংকট দূর করার জন্য পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নিচ্ছে না"*। তুরস্ক থেকে পানি আমদানী করে ইসরাঈলের পানি সংকটের সমাধান করার প্রস্তাবকে তিনি অবাস্তব বলে প্রত্যাখ্যান করেন। কিনেরেট হ্রদের পানি এবং দেশের প্রধান ভূগর্ভস্থ রিজার্ভ The Coastal and Mountain Aquifiers-এর পানি ভয়ঙ্কর মাত্রায় কমে যাওয়ার ফলশ্রুতিতে এই সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। কিনেরেট হ্রদের পানির গভীরতা স্মরণকালের ইতিহাসের সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে এবং ভূগর্ভস্থ রিজার্ভের অবস্থাও একই। আসলে, পানির গভীরতা যেখানে নেমে গেলে National Water Carrier-এ ঐ হ্রদ থেকে পানি পাম্প করে সাপলাই দেয়া বন্ধ করতে হবে, সেই পর্যায় নামতে আর বেশী বাকি নেই। পাম্পগুলিকে

গোড়াতেই এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছিল যাতে পানির গভীরতা সর্বনিম্ন পর্যায় পৌঁছালেই সেগুলো আর কাজ করবে না।

পানির গভীরতা এখন কতটুকু? কিনেরেট হ্রদ কর্তৃপক্ষের এক প্রাক্তন সদস্য Yitzhak Gal ঘোষণা করেছেন: *"আমাদের গবেষণা মতে গত ১৫০ বছরের মধ্যে এটাই হচ্ছে এই হ্রদের সর্বনিম্ন গভীরতা। আমরা রোমান যুগ পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যসমূহ পরীক্ষা করে দেখেছি এবং বুঝেছি যে, সেই থেকে নিয়ে এই হ্রদের পানির গভীরতা কখনই আজকের মত অবস্থায় নামেনি।"*

Saguy সতর্ক করে বলেছেন: *"(সরকারের নীতিতে) অদূর ভবিষ্যতেই যদি কোন মৌলিক পরিবর্তন না ঘটে, তবে আগামী বছরই মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত পানি থাকবে না।"* বাস্তবিকই তিনি ঘোষণা করেন: *"আগামী বৎসরই এক বিপর্যয় নেমে আসবে।"* ঐ বিপর্যয়ের কারণে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে, কেননা ফিলিস্তিন ও জর্ডানবাসীদের পানি সরবরাহ করার ব্যাপারে ইসরাঈলের আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার রয়েছে, আর সেই সরবরাহের উৎসসমূহ দ্রুত শুকিয়ে যাচ্ছে।

কিনেরেট হ্রদ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান Zvi Orenberg অবস্থাকে *ভীতিপ্রদ* বলে আখ্যায়িত করে বলেছেন: *"এই শীতে যদি আশানুরূপ বৃষ্টিপাত না হয়, যার জন্য সবাই চেয়ে রয়েছে ও প্রার্থনা করছে, তবে সবার জন্য ব্যাপারটি বিপর্যয়কর হবে।"* ইতোমধ্যেই লবণাক্ততা বেড়ে যাচ্ছে এবং শ্যাওলা ছড়িয়ে পড়ছে।

(এ বিষয়ের উপর David Rudge লিখিত বেশ কয়েকটি সমীক্ষা জেরুজালেম পোস্টে প্রকাশিত হয়। তার মাঝে রয়েছে ২০০০ সালের ৫ই ডিসেম্বরে প্রকাশিত: *"সরকার পানি সমস্যার গুরুত্বকে এড়িয়ে যাচ্ছে"*; এবং ২০০০ সালের ১৯শে ডিসেম্বরে প্রকাশিত: *"পানির পাইপ বেয়ে ধেয়ে আসছে পানি-সমস্যা"*। আরও সাম্প্রতিক সমীক্ষার চিত্র এর চেয়েও বেশী করুণ। খরচের সীমাবদ্ধতা আমাদেরকে এই সংযোজনে আরও নতুন সমীক্ষাগুলি তুলে ধরা থেকে বিরত রাখছে)।

দ্বিতীয় সংযোজন

আমেরিকার উপর সেপ্টেম্বর ১১-র আক্রমণের প্রেক্ষিতে মুসলিম প্রতিক্রিয়া

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّـهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٥﴾

"অতএব তোমরা হীনবল হয়ো না এবং শান্তিচুক্তির জন্য আবেদন করো না, তোমরাই হবে প্রবল; আল্লাহ্ই তোমাদের সাথে আছেন; তিনি কখনও তোমাদের কর্ম হ্রাস করবেন না।"

(কুর'আন, সুরা মোহাম্মদ ৪৭:৩৫)

وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ
وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّـهِ وَرَسُولِهِ
ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّـهِ ۗ
وَكَانَ اللَّـهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٠﴾

"যে কেউ আল্লাহ্র পথে দেশত্যাগ করে, সে এর বিনিময়ে অনেক আশ্রয় ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে।

"যে কেউ নিজ গৃহ থেকে আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশ্যে বাহির হয়,

"অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার সওয়াব আল্লাহ্র কাছে অবধারিত হয়ে যায়।

"আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়।"

(কুর'আন, সুরা নিসা ৪:১০০)

ভূমিকা

অবর্ণনীয় ব্যথার সাথে আমি আফগানিস্তানের সেই সকল মুসলিমদের উপর কাপুরুষোচিত মার্কিন সন্ত্রাসী হামলাকে পর্যবেক্ষণ করি, যারা ইসলামের পক্ষ নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং আমেরিকার উপর ১১ই সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার ব্যাপারে সম্পূর্ণ

নির্দোষ ছিলেন। কাপুরুষোচিত, কারণ মুসলমানের শত্রু সবসময়ই সমতার ভিত্তিতে মোকাবেলা করতে অতিমাত্রায় ভীত। তারা জঙ্গি-বিমান ও দূরপাল্লা-মিসাইলের নিরাপদ আশ্রয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে, অথবা আকাশের উচ্চতা থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করে। কিন্তু ইনশাআল্লাহ্ আল্লাহ্ আমাদের ঐ দিন এনে দেবেন, যখন আমরা সমতার ভিত্তিতে ভূপৃষ্ঠের যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের মোকাবেলা করব। আমীন! সে দিন আসা পর্যন্ত চূড়ান্ত ধৈর্য প্রদর্শন করে, আমাদেরকে নিজেদের রক্ষা করার সংগ্রাম চালিয়ে যেতেই হবে।

তালেবানরা এমন একটা অবস্থায় পর্যবসিত হয়, যেটাকে ঐ ১২ বছর বয়স্ক ফিলিস্তিনী মুসলিম বালকের সাথে তুলনা করা যায়, যে যুক্তরাষ্ট্র-নির্মিত ইসরাঈলী ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে হাতে পাথর নিয়ে যুদ্ধ করেছিল। তালেবানরা কারো কাছেই পরাজিত হয়নি, সেটা আমেরিকা হোক অথবা উত্তরাঞ্চলীয় 'ইয়াঙ্কী' জোট, যাদের সাথে ইরানের এখনও সুসম্পর্ক রয়েছে। তারা আর ঐ সব বালকেরা যারা 'পবিত্রভূমিতে' পাথর হাতে সংগ্রাম করে, তাদের কখনই পরাভূত করা যায় না। বরং তালেবানরা পাহাড়ের ভিতরে নিজেদেরকে গুটিয়ে নিয়েছে, যেখানে কাপুরুষোচিত জঙ্গি-বিমান এবং মিসাইল তাদের ছুঁতে পারে না। আর তাই আল্লাহ্র এসব সৈনিক 'আরেকদিন' যুদ্ধ করার জন্য বেঁচে আছে। আমরা তাদের সালাম জানাই! বাস্তবিকই এই যুদ্ধ ততদিন শেষ হবে না, যতদিন না খোরাসান থেকে সেই মুসলিম বাহিনী বেরিয়ে আসবে এবং বিজয়ীর বেশে জেরুজালেমের দিকে যাত্রা করবে। যারা এই গ্রন্থটি পড়বেন এবং যারা মুসলিম, তাদের সকলেরই হৃদয়ে ঐ বাহিনীতে যোগদান করার আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত।

ব্রিটিশ, আমেরিকান ও ইসরাঈলীদের কাপুরুষোচিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে যারা আফগানিস্তানে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের প্রতিটি মুসলিমকে এই গ্রন্থে সালাম জানান হচ্ছে। আমাদের এই সমস্ত বীর সন্তান যারা আফগানিস্তানে নিহত হয়েছে অথবা যারা অন্য কোথাও নিহত হবে, অথবা যারা স্রষ্টা-বিমুখ প্রভাবশালী বিশ্বব্যবস্থার কারাগারসমূহে বন্দী হবে তাদের রক্ত ও অশ্রু বৃথা যাবে না। বরং তা বিশ্বজুড়ে লক্ষ কোটি মুসলিমের (বিশেষত মুসলিম যুবকদের) প্রেরণা ও অতুলনীয় উদ্যমকে উজ্জীবিত করবে; যারা এই ভয়ঙ্কর নিলর্জ্জ, নগ্ন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে নিজেদের, তাদের সন্তানদের এবং সন্তানের সন্তানদের ঐ ইসলামি সশস্ত্র সংগ্রামের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবে, যা শেষ পর্যন্ত 'পবিত্রভূমিকে' মুক্ত করবে। এই অমানিশা বড়জোর আর পঞ্চাশ বছর স্থায়ী হবে, যার পর ইনশাল্লাহ্ সূর্যের আলো ফিরে আসবে এবং শেষবারের মত মিথ্যার উপর সত্যের জয় হবে, আর জেরুজালেম থেকে ইসলাম গোটা পৃথিবীর উপর শাসন করবে। এই গ্রন্থ, অর্থাৎ, *'পবিত্র কুর'আনে জেরুজালেম'* মুসলিম যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে লিখিত। আমি প্রার্থনা করি যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমার কাছে তাঁদেরকে

প্রেরণ করেন, যারা, মুসলিমদের প্রতিটি ভাষায় এই গ্রন্থটিকে অনুবাদ করবেন, যাতে গ্রন্থখানি ঐ শ্রেণীর সকল মুসলিম যুবকের কাছে পৌঁছাতে পারে। আমীন!

১৯১৪ সালের গ্রীষ্মকালে, অপর একটি সন্ত্রাসী হামলার মাধ্যমে যেভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল, ঠিক ঐ মুহূর্তের মতই আমেরিকার উপর সন্ত্রাসী হামলা ইতিহাসের এক নতুন মোড় হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি বিশ্বাস করি যে, শেষ পর্যন্ত গোটা পৃথিবীকে যে কোন প্রকারে শাসন করার ব্যাপারে যারা বদ্ধ পরিকর, তারাই উভয় সন্ত্রাসী হামলার জন্য দায়ী এবং আমি এও বিশ্বাস করি যে সেপ্টেম্বর ১১-র আক্রমণ, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ইসরাঈলী মোসাদ এবং যারা তাদের হয়ে কাজ করে তারাই দায়ী। ঐ সন্ত্রাসী হামলা এবং তার পথ ধরে সাজানো সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, সবই ইহুদী এবং ইসরাঈল রাষ্ট্রের জন্য পৃথিবীকে অধিকতর নিরাপদ স্থানে পরিণত করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত ও আয়োজিত। সত্যিকার অর্থে যে সমস্ত সন্ত্রাসীরা ঐ দিন আমেরিকা আক্রমণ করেছিল, তারা জানে তারা কারা, আর আল্লাহ্ তা'আলা জানেন তারা কারা। আমরা তাদের মুখোশ উন্মোচিত করার জন্য এবং তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করি। আমীন!

আগের যে কোন সময়ের চেয়ে ব্রিটিশ-আমেরিকান-ইহুদী বিশ্বব্যবস্থা এখন আরও বেশি খোলাখুলিভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োজিত। এটা এজন্য যে তাদের এই হাজার-বছর পুরনো যুদ্ধ চরম মুহূর্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই গ্রন্থে, *'পবিত্র কুর'আনে জেরুজালেম'*, ইসলামের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধকে ব্যাখ্যা করার, এবং সেই সাথে নতুন বিশ্বব্যবস্থা, মুসলিম জগত ও ইসরাঈল রাষ্ট্রের ভবিষ্যত আঁচ করার একটা চেষ্টা করা হয়েছে।

পৃথিবী-পৃষ্ঠে আজ সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও অসহ্য প্রাণী (অথবা আকাশের নিচে সবচেয়ে দুষ্ট মানবগোষ্ঠী) হচ্ছে ইসলামের ঐ সমস্ত পণ্ডিতবর্গ অথবা ঐ সকল মুসলিম নেতৃবৃন্দ যারা ১১ই সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দ্বারা পুরাপুরিভাবে প্রতারিত হয়েছে, যারা আরব ও মুসলিমদেরকে ঐ আক্রমণের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে, ইসলামি আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্রিটেন-যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাঈলের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছে, এবং তাদের পক্ষে নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। আমার মতে ১১ই সেপ্টেম্বর আক্রমণের ব্যাপারে ওসামা বিন লাদেন এবং আফগানিস্তানের তালিবান কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ নির্দোষ। অতএব তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধটাও স্পষ্টত অন্যায়। ঐ ধরনের বিপথগামী ইসলামি পণ্ডিতবর্গ ও নেতৃবৃন্দকে অবশ্যই সর্বতোভাবে চ্যালেঞ্জ করা উচিত।

নিউইয়র্কের কুইন্স এলাকায় এক ইসলামি কেন্দ্রে সেপ্টেম্বর ১১-র আক্রমণের কয়েকদিন পরে, আমি আমার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে

প্রার্থনা করেছিলাম যে, যারা ঐ আক্রমণের জন্য দায়ী, তাদের যেন তিনি কঠোরতম শাস্তির মাধ্যমে শায়েস্তা করেন এবং সেই শাস্তি যেন শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত জারি থাকে। ঐ মসজিদে তখন যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের সকলেই, আমার সাথে ঐ প্রার্থনায় যোগ দেন। আমি ইহুদীদের আহ্বান করছি যেন তারাও ঐ একই ধরনের একটা প্রার্থনা করুক।

আমেরিকার উপর সেপ্টেম্বর ১১-র আক্রমণ থেকে কে লাভবান হয়েছে?

এটার সম্ভাবনা কম যে ব্রিটেন বা যুক্তরাষ্ট্র বা 'পবিত্রভূমিতে' বসবাসরত কোন ইহুদী এই গ্রন্থখানি পড়তে চাইবে। তার তো এর চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে, যেমন *'জেরুজালেম থেকে পৃথিবীকে শাসন করা'*-র লক্ষ্য অর্জন করার জন্য অবিরাম পরিশ্রম করে যাওয়া। এই লক্ষ্য অর্জন করতে গিয়ে তাকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিপীড়নের মাধ্যমে, গোটা মানবকুলকে (অ-ইহুদী মানবতাকে) দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জন করতে গিয়ে একজন ইহুদী যে কোন পন্থা অবলম্বন করবে, কেননা অ-ইহুদীদেরকে সে সেই মানের যোগ্য বলে মনে করে না, যে মানের বিচার ও নৈতিক মানমর্যদা সে নিজেদের মধ্যে দাবী করে।

ইহুদীদের এই দ্বৈত মানদণ্ডের কথা এবং অ-ইহুদীদের প্রতি তাদের ঘৃণার কথা পবিত্র কুর'আন নিম্নলিখিত অংশে ব্যক্ত করেছে:

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ
وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ
وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّـهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

"কোন কোন আহ্‌লে কিতাব (ইহুদী) এমনও রয়েছে, তুমি যদি তাদের কাছে স্বর্ণের একটা স্তূপ জমা রাখ, তারা তা যথারীতি ফেরত দেবে;

"আবার অনেকে এমনও রয়েছে যারা একটি স্বর্ণমুদ্রাও ফেরত দেবে না যতক্ষণ না তুমি তাদের মাথার উপর (তোমার অর্থের ফেরতের দাবী করে তাদের সামনে) দাঁড়িয়ে থাকবে।

"(এটা এজন্য যে) তারা বলে: আমাদের উপর এইসব অ-ইহুদীদের ব্যাপারে (কথা রাখার) কোন নির্দেশ নেই।

"কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে এবং তারা তা (ভালভাবেই) জানে।"

(কুর'আন, সুরা আলে 'ইমরান ৩:৭৫)

আমরা কুর'আনের উদ্ধৃতি এজন্য দিলাম যে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই নির্দেশ দিয়েছেন যে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে আমরা যেন কুর'আনকে ব্যবহার করে কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত হই।

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾

"সুতরাং অবিশ্বাসীদের আনুগত্য করো না, বরং তাদের বিরুদ্ধে (কুর'আন)-এর সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম কর।"

(কুর'আন, সুরা ফুরক্বান ২৫:৫২)

ইউরোপীয় ইহুদী ইতোমধ্যেই মানবকুলকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাসত্বে আবদ্ধ করার লক্ষ্য প্রায় অর্জন করে ফেলেছে। যখন সে শেষ পর্যন্ত তা সম্পূর্ণভাবে অর্জন করবে — এমন কোন আলামত নেই যে সে তা করতে পারবে না — তখন তার কাছে মনে হবে যে যাকে সে সত্য বলে দাবী করে তাই প্রমাণিত হল। এটা অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার যে সন্ত্রাসবাদ, নিপীড়ন এবং প্রতারণা ঐ নৈতিকতার সাথে সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ, যা ইবরাহিম (আঃ)-এর ধর্মের ভিত্তি। যে ইহুদী আসল মসীহ্ ও রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তার আধ্যাত্মিক অন্ধত্ব তাকে এই মৌলিক সত্য শনাক্ত করার ব্যাপারে অক্ষম করে দিয়েছে। ঐ আধ্যাত্মিক অন্ধত্বের ফলশ্রুতিতে ইহুদী আজ জাহান্নামের আগুনের দিকে ধেয়ে চলেছে। পবিত্র কুর'আন এই দুটো ব্যাপারের ভিতর সংযোগকে ব্যক্ত করেছে (আমার মন্তব্য রয়েছে বন্ধনীর ভিতরে):

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ
لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ
أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾

"নিশ্চিতই আমরা বহু মানুষ ও জ্বিনকে জাহান্নামের জন্য নির্ধারণ করেছি।

"(কেন?) তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না (কেননা তাদের অন্তর মৃত)। (একইভাবে) *তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না* (কারণ তাদের অন্তর অন্ধ)। *আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না* (কারণ তাদের অন্তর বধির)।

"তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তার চেয়েও বেশি বিপথগামী: তারাই হল (আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনসমূহ সম্বন্ধে) গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ।"

(কুর'আন, সুরা আ'রাফ ৭:১৭৯)

একজন ইহুদী এটা জেনে আশ্চর্য হবে যে, যারা পবিত্র কুর'আনের শিক্ষা করে এবং রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দেয়া শিক্ষাকে গ্রহণ করে, তারা যে কেবল তার [ঐ ইহুদীর] পরিকল্পনা ও অভীষ্ট লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন শুধু তাই নয়, সে তার লক্ষ্য অর্জন করার বিরামহীন প্রচেষ্টায় যে ভয়ঙ্কর প্রতারণার আশ্রয় নেয়, সে সম্বন্ধেও তারা অবগত। বাস্তবতা এই যে, বর্তমান সময়টা মুসলিমদের জন্য হতাশাব্যঞ্জক মনে হতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যত ইসলামের, ঠিক যেমন ঐ প্রবাদবাক্যে বলা হয় – *সব ভাল যার শেষ ভাল*! দৃশ্যত যা মনে হয় তার সাথে বাস্তবতার এখানেই তফাত।

এই ব্যাপারটা মুসলিমদের দৃষ্টি এড়ায়নি যে, আমেরিকার উপর **১১ই** সেপ্টেম্বরের হামলার ফলে একমাত্র ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈলই লাভবান হয়েছে। ঐ আক্রমণের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ব্যাপারে ইসরাঈলী মোসাদ ও অন্যান্য ইহুদীরা (যেমন মার্কিন সরকারে কর্মরত ইহুদীগণ) হচ্ছে প্রথম সন্দেহভাজন গোষ্ঠী, এটা অনুধাবন করেও এই গ্রন্থে তড়িঘড়ি করে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছান হয় নি। আমেরিকান রাজনীতিবিদ লিন্ডন লারূচ যুক্তি দেখিয়েছেন যে, **১১ই** সেপ্টেম্বরের আক্রমণের মত, কোন আক্রমণ চালাতে হলে আমেরিকার সরকারী কাঠামোর অভ্যন্তর থেকে তথ্য আহরণের প্রয়োজন (লারূচের ওয়েবসাইট দেখুন)। আবেগবিহীন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই গ্রন্থে একই ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছান হয়েছে যে, ঐ আক্রমণের ফলে ইসরাঈল এবং কেবলমাত্র ইসরাঈলই লাভবান হয়েছে। সে সমস্ত সুফলগুলো কি?

প্রথম সুফলঃ গণসংযোগের সৌভাগ্য

প্রথমত এরিয়েল শ্যারন ঠাণ্ডা মাথায় ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জেরুজালেমের মসজিদ আল-আক্সায় তার উস্কানিমূলক সফরের পরিকল্পনা করেছিলেন, যা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আরেকটি রক্তক্ষয়ী ইসরাঈলী নির্যাতন নিপীড়নের অধ্যায়ের সূচনা করেছিল এবং ঐ নিপীড়নের জবাবে আরেকটি বেপরোয়া আরব মুসলিম প্রতিরোধেরও সূচনা করেছিল। শ্যারনের ঐ সফরের এক বছর পরে **১১ই** সেপ্টেম্বরে আমেরিকার উপর আক্রমণ পর্যন্ত, পৃথিবী দেখেছে কিভাবে ইসরাঈল ঐ যুদ্ধকে তীব্রতর করার ব্যাপারে ইন্ধন যুগিয়েছে, কিন্তু প্রতারণার মাধ্যমে নিজেদেরকে অবিচারের শিকার হিসেবে প্রচার করেছে। গোটা পৃথিবী ইসরাঈলের নিপীড়নকে সনাক্ত করেছিল, যার ফলে গণসংযোগের ক্ষেত্রে ইসরাঈলের জন্য বিপর্যয় নেমে এসেছিল, যা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠেছিল যখন দক্ষিণ আফ্রিকার ডার্বানে ২০০১ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত বর্ণবাদের উপর বিশ্ব-সম্মেলনে সারা পৃথিবী ইসরাঈলের নিন্দায় একজোট হয়েছিল।

আমেরিকার উপর **১১**ই সেপ্টেম্বরের আক্রমণ, ইসরাঈলের ঐ গণসংযোগ বিপর্যয়কে তৎক্ষণাত এবং সম্পূর্ণরূপে এমনভাবে বদলে দিল যে, হঠাৎ করেই আরব এবং মুসলিমগণ নিজেদেরকে গণসংযোগ বিপর্যয়ের মুখোমুখি দেখতে পেল যা কিনা ইসরাঈলের বিপর্যয়ের চেয়ে অনেক বেশী গুরুতর ছিল। টেলিভিশনের জন্ম সত্যিই সার্থকতা লাভ করেছিল **১১**ই সেপ্টেম্বরে, যখন বিশ্ব জুড়ে টেলিভিশন কেন্দ্রসমূহ নির্লজ্জভাবে আমেরিকান টেলিভিশন কেন্দ্রের সাথে মিডিয়া ক্রুসেডে যোগ দিল, যার ফলে *সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের* নামে আসলে *ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ* শুরু হয়ে গেল। আমেরিকার উপর **১১**ই সেপ্টেম্বরের আক্রমণের ব্যাপারে আরব এবং মুসলিমগণ যে নির্দোষ ছিল, সেই সত্যটা কেবল কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত কাজ করল।

দ্বিতীয় সুফলঃ ঐ মহাযুদ্ধের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা, যা যায়োনিস্ট-ইসরাঈলী সত্যের দাবীকে প্রমাণিত করবে

দ্বিতীয়ত গণসংযোগের বিপর্যয় পাল্টে গিয়ে এখন ইসরাঈলকে পূর্ববর্তী নাজুক অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছে, এবং তাকে যদৃচ্ছা উস্কানিমূলক ও উত্তরোত্তর তীব্রতরভাবে, আরব এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত সংঘাতের কর্মসূচী বাস্তবায়নের সুযোগ করে দিয়েছে। এতে তারা মার্কিন সরকার সমেত কারো পক্ষ থেকে কোনরকম উল্লেখযোগ্য বাধা পাচ্ছে না। এই সুফলকে মোটেও ছোট করে দেখা যায় না।

ইসলাম, পবিত্র কুর'আন এবং (নবীদের মধ্যে সর্বশেষ) আরবীয় নবী (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইসরাঈলের দীর্ঘমেয়াদী কৌশল হচ্ছে একটা চমকপ্রদ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা, যাতে মনে হবে যে তৌরাতের (এবং ইঞ্জীলের) 'সত্য' প্রমাণিত হল এবং সেই সাথে পবিত্র কুর'আন মিথ্যা প্রমাণিত হল। ঐরকম একটা প্রদর্শনী কেবল যে অনেক অজ্ঞ মুসলিমের মনোবলকে ভেঙ্গে দেবে তাই নয়, বরং অনেক ইহুদীকে এমন নিশ্চয়তা দান করবে যে, তারা এখনও [আল্লাহ্‌র নজরে] 'নির্বাচিত জনগোষ্ঠী' রয়ে গেছে। তারা নিশ্চিত হবে যে, ইহুদী ধর্মের ঐ স্বর্ণযুগের প্রত্যাবর্তন সমাসন্ন যখন দাউদ (আঃ)-এর সিংহাসন থেকে মসীহ্‌ পৃথিবীর উপর শাসন করবেন। ঐ বিষয়টিরই ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে দেয়া হয়েছে। তৌরাতের দাবীর সেরকম সত্যায়ন ইসরাঈলের একটা চকিত ও চমকপ্রদ যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হবে, যার লক্ষ্য হবে 'পবিত্রভূমির' চারপাশের সমগ্র অঞ্চলকে দখল করা। ঠাণ্ডা মাথায় পরিচালিত শ্যারনের উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ডের এটাই ছিল আসল কারণ। নিঃসন্দেহে ঐ যুদ্ধের প্রস্তুতি এগিয়ে চলেছে, এমনকি আমরা যখন এই গ্রন্থটি লিখে চলেছি তখনও, যে যুদ্ধের ফলে ইহুদী রাষ্ট্রের সীমানা এমনভাবে বৃদ্ধি পাবে, যাতে তৌরাতের (এবং বাইবেলের) ঐ ঘোষণা বাস্তবায়িত হবে, যেখানে বলা হয়েছে যে 'পবিত্রভূমি' (এক্ষেত্রে ইসরাঈল)-এর সীমানা "মিসরের নদী থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত"

(অর্থাৎ একদিকে সুয়েজ খালের উপর নিয়ন্ত্রণ আর অপরদিকে সৌদি, ইরাকি ও কুয়েতি ইত্যাদি উপসাগরীয় তেলক্ষেত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ; কিন্তু ইরানী তেলক্ষেত্রের উপর নয়)। ইসরাঈল রাষ্ট্রের এ ধরনের সীমানা সম্প্রসারণের "স্পষ্ট ভূমিকায়" বিশ্বাসকারী ইসরাঈলী জনগণের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বলেই মনে হয় (১৯৬০ সালে ছিল ১৫%)।

এটা এখন পরিস্কার যে, ১৯৯১ সালের উপসাগর যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল, ইরাককে পঙ্গু করে দেয়া, যার ফলে দশ বছরের মত সময়ের ব্যবধানে ইসরাঈল বিশেষ কোন বাধা ছাড়াই তাকে গিলে ফেলতে সক্ষম হবে। ঐ লক্ষ্য স্পষ্টতই অর্জিত হয়েছে। ইরাক বৃন্তচ্যুত হবার জন্য প্রস্তুত। এটাও এখন পরিস্কার যে, যা নিশ্চিতই ১১ই সেপ্টেম্বরে আমেরিকার উপর ইসরাঈলী মোসাদের আক্রমণ বলে প্রতীয়মান হয়, তার উদ্দেশ্য ছিল যুক্তরাষ্ট্রেকে তড়িঘড়ি করে ঐ অঞ্চলের বেশ কয়টি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামানো, যাতে ইসরাঈলের সম্প্রসারণের ঐ বৃহৎ যুদ্ধের পথ প্রশস্ত হয়। আমেরিকার ঐ কথিত যুদ্ধের আরও যে উদ্দেশ্য হাসিল করার কথা ছিল, তা ছিল ইসরাঈলকে সুযোগ করে দেয়া যেন সে পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্রক্ষমতা এবং ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপনাগুলোকে অকেজো করে দিতে পারে। ইসরাঈলের সীমানা সম্প্রসারণের সেই দর্শনীয় অভিযান পরিচালনা করার ব্যাপারে এই দুটির সমন্বয় এখনও একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধক।

ঐ লক্ষ্য এখনও বাস্তবায়িত হয়নি, কেননা ছিনতাইকৃত যে বিমানখানি এয়ারফোর্স-১ অথবা হোয়াইট হাউসের উপর বিধ্বস্ত হয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে হত্যা করার কথা ছিল এবং যার ফলশ্রুতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটা বড়সড় যুদ্ধে যেতে বাধ্য হত, ঐ বিমানখানি ঘটনাচক্রে পেনসিলভানিয়ায় বিধ্বস্ত হয়েছে। মোসাদ এবং তার মিত্ররা সম্ভবত এ ব্যাপারটা হিসেবে রাখেনি যে, চতুর্থ ঐ বিমানখানির কিছু যাত্রী তাদের মোবাইল ফোনে কল পেতে পারে, যেমনটি মিডিয়ার খবরে প্রকাশ। কথাটি যদি সত্যি হয়, তাহলে ঐ ফোন কলগুলো হয়তো বিমানের পরিচালনা ব্যবস্থায় (যা রিমোট-কন্ট্রোল অথবা অটো-কন্ট্রোল অথবা ম্যানুয়াল যাই হোক না কেন) ইলেক্ট্রনিক বিপত্তি সৃষ্টি করে থাকতে পারে, এবং তার ফলে বিমানখানি বিধ্বস্ত হয়ে থাকতে পারে। এটাও সম্ভব যে যাত্রীরা ছিনতাইকারীদের আক্রমণ করে এবং তার ফলে উদ্ভূত ধস্তাধস্তির কারণে বিমানখানি বিধ্বস্ত হয়। দৃশ্যত এটা মূল পরিকল্পনার অংশ ছিল না বলেই মনে হয়।

যাহোক, (১১ই সেপ্টেম্বরের আগেই) পাকিস্তানে যে অভূতপূর্ব ক্ষমতার পট পরিবর্তন হয়েছিল, যার ফলে বেসামরিক প্রশাসনের অবসান ঘটিয়ে সামরিক প্রশাসন চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল, ইসরাঈল এখনও সেই পরিবর্তন থেকে লাভবান হতে পারে। শুধুমাত্র সামরিক প্রশাসনের পক্ষেই যুক্তরাষ্ট্রকে ইসলামি আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সমর্থন দেয়া সম্ভব ছিল (যা নিশ্চিতভাবে বেসামরিক প্রশাসনের পক্ষে অসম্ভব)। সুতরাং

১১ই সেপ্টেম্বরে আমেরিকার উপর ঐ আক্রমণ সংঘটিত হবার পূর্বেই, পাকিস্তানে একটি সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন ছিল। প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের কাছ থেকে যে পাকিস্তান বাহিনী আপাত ষড়যন্ত্রমূলক পরিস্থিতিতে ক্ষমতা দখল করেছিল, আমেরিকার চাপে নতি স্বীকার করে সেই বাহিনীকে আফগানিস্তানে তালেবান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের সমর্থন দেয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না। তারা যে ষড়যন্ত্রের ফলে ক্ষমতায় আসেনি, এটা প্রতীয়মান করার জন্য যেটুকু রাখ-ঢাক প্রয়োজন, ঐ আমেরিকান দাবী প্রত্যাখ্যান করলে পাকিস্তান বাহিনীর সেটুকু ছদ্মাবরণ আর বজায় থাকত না। একবার যখন পাকিস্তানী সরকার আফগানিস্তানে তালিবান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন দেয়ার অঙ্গীকার করল, বলতে হবে তখনই তাদের জন্য ফাঁদ পাতা হয়ে গেল। দশ বছর আগে সাদ্দাম হোসেন এরকম একটা ফাঁদে পা দিয়েছিলেন। আর দশ বছর পরে পাকিস্তান বাহিনীও একই ধরনের ফাঁদে পা দিল।

এই গ্রন্থে মনে করা হয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের নেতৃত্বে গঠিত জোট, আফগানিস্তান এবং অন্যত্র বেশ কিছু জরুরি লক্ষ্য অর্জন করার উদ্দেশ্যে সুদীর্ঘ যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, যার অন্যতম লক্ষ্য হবে পাকিস্তানে একটি গৃহযুদ্ধ বাঁধানো। যখন পাকিস্তান বাহিনীর এক অংশ শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করবে, এবং যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন করার সরকারী নীতির বিরুদ্ধে জনপ্রিয় শক্তির সাথে যোগ দেবে, যার পরিণতিতে পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়বে, তখন যুক্তরাষ্ট্র তার নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক জোটকে নিয়ে পাকিস্তানের পারমাণবিক প্রকল্পগুলিকে আক্রমণ করার একটা অজুহাত সৃষ্টি করবে। এরকম একটা সুযোগ যদি নাও আসে, তবুও তাদের সম্ভবত ঐ একই লক্ষ্য অর্জন করার জন্য একাধিক বিকল্প ব্যবস্থা রয়েছে। বাস্তবে যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্রগণ হয়ত পাকিস্তানকে আর একটি তুরস্ক বা ইরাকে পরিণত করার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারে, অথবা পাকিস্তানকে আরো খণ্ডবিখণ্ড করার কাজে হাত দিতে পারে। ইসরাঈল এবং ভারত, পাকিস্তানের উপর ঐ আক্রমণে সরাসরি অংশগ্রহণ করুক বা না করুক, তারা নিশ্চিত ভাবেই ঐ আক্রমণের কৌশলগত পরিকল্পনায় জোটবদ্ধ থাকবে।

মৌলিক বুদ্ধিমত্তার সাথে যদি সামান্য অন্তর্দৃষ্টি যোগ করা যায় (যা পৃথিবীর বর্তমান নিয়ন্তা, অর্থাৎ আজকের পশ্চিমা সভ্যতার মাঝে খুবই বিরল), তাহলে যে কেউ আমেরিকার উপর ঐ শয়তানসুলভ আক্রমণ ও চমকপ্রদ পরিকল্পনার পেছনে প্রধান সন্দেহভাজন হিসেবে ইসরাঈলী মোসাদ ও তার মিত্রদের শনাক্ত করতে পারবেন। নিশ্চিতই ওসামা বিন লাদেন এবং তার যোদ্ধাদের ক্ষুদ্রগোষ্ঠী আল-কায়েদা যদি এ ধরনের একটি চম্‌কে দেয়া আক্রমণ সফলভাবে পরিকল্পনা ও পরিচালনা করতে পারত তাহলে, *একটা গরুর পক্ষে লাফ দিয়ে চাঁদে পৌঁছানোটাও* সম্ভব হত!

মুসলিমদের পবিত্র কুর'আনের ঐ কঠোর সতর্কবাণীর কথাও স্মরণ রাখা উচিত, যাতে স্পষ্টত পাপপূর্ণ সূত্র থেকে পাওয়া কোন খবরকে যাচাই না করেই গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে, যার ফলে কেউ হয়ত ভাবনা-চিন্তা ছাড়াই অন্যের ক্ষতি করে বসতে পারে এবং তারপরে অনুশোচনায় জীবন কাটাতে হতে পারে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ
فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

"হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে,

"তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও।"

(কুর'আন, সুরা হুজুরাত ৪৯:৬)

পশ্চিমা সভ্যতা এবং বিশ্বজুড়ে তাদের অনুসারীরা ওসামা বিন লাদেনকে আমেরিকার উপর ঐ আক্রমণের জন্য দোষারোপ করে, কিন্তু জনসমক্ষে কোন প্রমাণ উপস্থাপন করে না (অর্থাৎ এমন প্রমাণ যা আইনের আদালতে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে)। অতএব তাদেরকে 'পাপী' হিসেবে গণ্য করা ছাড়া কোন উপায় নাই। অপর পক্ষে ওসামা বিন লাদেন, যিনি ইব্রাহীমের (আঃ) বিধাতার উপাসনা করেন, তিনি জোর দিয়ে ঐ আক্রমণের দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করেছেন। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) একজন মুসলিমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, *"এমন একজন যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলিমরা নিরাপদ"*। অতএব, যতক্ষণ না এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যাবে যে তিনি সত্যি কথা বলছেন না, ততক্ষণ ওসামা বিন লাদেন ঐ আক্রমণের দায়-দায়িত্ব যে অস্বীকার করলেন সেটাকে সত্য বলে গ্রহণ করা মুমিনদের কর্তব্য।

তৃতীয় সুফল: ইসরাঈল যাতে পৃথিবীর 'নিয়ন্তা রাষ্ট্র' হতে পারে তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা

'পবিত্র কুর'আনে জেরুজালেম' এই গ্রন্থটিতে আমরা পবিত্র কুর'আন ও রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাদীসসমূহকে সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছি, তা থেকে এটা পরিস্কার হয়ে উঠে যে, ইসরাঈলের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে, (যা আমেরিকার উপর **১১**ই সেপ্টেম্বরের আক্রমণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যও বটে), পৃথিবীর নিয়ন্তা রাষ্ট্র হিসাবে ইসরাঈলকে যুক্তরাষ্ট্রের স্থলাভিষিক্ত করার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। দাউদ (আঃ)-এর সিংহাসন (অর্থাৎ ইসরাঈল ও জেরুজালেম) থেকে আসল মসীহ্‌র পৃথিবীর উপর

শাসন করার কথা। অতএব ভণ্ড-মসীহ্ বা অ্যান্টি-ক্রাইস্ট (অর্থাৎ দাজ্জাল) যাতে ইহুদীদেরকে মসীহ্ হিসাবে তার পরিচিতি সম্বন্ধে আশ্বস্ত করতে পারে, সেজন্য তাকে নিম্নলিখিত কার্যগুলো সমাধা করতে হবে:

- অ-ইহুদী শাসন থেকে 'পবিত্রভূমিকে' মুক্ত করা;
- ইহুদী ধর্মের নামে পবিত্রভূমির উপর দাবী পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ইহুদীদের সেখানে ফিরিয়ে আনা;
- ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এবং ইহুদীদের আশ্বস্ত করা যে সেটাই হচ্ছে দাউদ (আঃ) এবং সুলায়মান (আঃ)-এর ইসরাঈল;
- ঐ ইসরাঈলকে পৃথিবীর নিয়ন্তা রাষ্ট্রে পরিণত করা;
- জেরুজালেম থেকে পৃথিবীর উপরে শাসন করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে আবির্ভূত হওয়া।

এই গ্রন্থে এ ব্যাপারে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে উপরের তালিকার প্রথম তিনটি ইতোমধ্যেই অর্জিত হয়েছে, চতুর্থটি প্রায় অর্জিত হতে চলেছে আর শেষটি বাস্তবায়িত হতে খুব বেশি সময় নাও লাগতে পারে।

সত্যি বলতে কি পৃথিবী এখন এমন এক সময়ে উপনীত হয়েছে, যার সাথে ১৯১৪ সালের গ্রীষ্মকালের সেই সময়ের মিল রয়েছে, যখন আরেকটি সুপরিকল্পিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, অর্থাৎ অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর আর্চ-ডিউক ফ্র্যানয্ ফারদিনান্দের হত্যাকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল, যা তখনকার নিয়ন্তা রাষ্ট্র ব্রিটেনকে ধরাশায়ী করে এবং যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ন্তা রাষ্ট্র হিসেবে ব্রিটেনের স্থলাভিষিক্ত করে। ঐ যুদ্ধ ইহুদীদেরকে এনে দিয়েছিল *ব্যালফর ঘোষণা*, এবং তারই সাথে তাদের 'পবিত্রভূমিতে' প্রত্যাবর্তন এবং সেখানে ইসরাঈল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেছিল। পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ সভ্যতা, ঐ সময় আধ্যাত্মিক দিক থেকে এমনই অন্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, তাদেরকে যে নাকে দড়ি দিয়ে একটা বিশ্বযুদ্ধে টেনে নামানো হয়েছিল, যার ফলে এক কোটিরও বেশী ইউরোপীয় মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল, তা তারা বুঝতেই পারল না। ১৯১৪ সালের সেদিন ঐ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য যারা দায়ী ছিল, ঐ সভ্যতা তাদের সনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। একইভাবে আমেরিকার উপর ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলার ঘটনায় কর্মরত এবং দায়ী সেই জনগোষ্ঠীকে (অর্থাৎ ইহুদীদেরকে) সনাক্ত করতে তারা আবারও ব্যর্থ হয়েছে।

স্পষ্টতই আজকের নিয়ন্তা রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রকে তার অর্থনীতি এবং মার্কিন ডলারের পতন ছাড়া, অন্য কোন উপায়ে ধরাশায়ী করা যাবে না। প্রেসিডেন্ট বুশ যদি নিহত হতেন, তবে সেরকম একটা ব্যাপারই ঘটত। আমরা যখন এই গ্রন্থটি লিখে চলেছি – ইসলাম, পবিত্র কুর'আন এবং রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে সমগ্র পৃথিবী

একত্রিত হবার পর এবং ওসামা ও তার লোকজনের উপর মার্কিন যুদ্ধের পরও, যুক্তরাষ্ট্রের উপর অব্যাহত হুমকি এটাই প্রতীয়মান করে যে, মার্কিন অর্থনীতি ও মার্কিন ডলারের পতন ঘটানোর ইহুদী প্রচেষ্টা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

প্রখ্যাত মার্কিন শিল্পপতি হেনরী ফোর্ড, যিনি একযোগে বিপুল পরিমাণে মোটর গাড়ী উৎপাদন-শিল্পের অগ্রনী, ১৯১৯-২০ সালেই আমেরিকাকে এ ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, আর্ন্তজাতিক ইহুদী লগ্নিকারকগণ যে প্রলয়কান্ড ঘটিয়ে চলেছিল তা তিনি সনাক্ত করেছিলেন। সবচেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত গবেষকদের একটি দলকে তিনি আর্ন্তজাতিক ইহুদী চক্রের ব্যাপারে গবেষণার জন্য নিয়োজিত করেছিলেন যারা ১৯১৯-২০ সালে ফোর্ড মোটর কোম্পানীর আনুষঙ্গিক প্রকাশনা *ডিয়ারবর্ন ইন্ডিপেন্ডেন্ট*-এ তাদের গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীতে তা *দ্য ইন্টারন্যাশনাল জু* নামে এক গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়। সাম্প্রতিককালে চার খন্ডে গোটা গ্রন্থখানি, *দ্য আদার প্রেস* কর্তৃক মালয়েশিয়ায় পুনঃমুদ্রিত হয়েছে। আর এখন তা স্থানীয় গ্রন্থের দোকানগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে।

আমেরিকার অর্থনীতি এখনও ধংসপ্রাপ্ত হয়নি সত্যি, কিন্তু দেয়ালের লেখায় পরিস্কার দেখা যাচ্ছে যে, ভিতরের শত্রু সেটার টুঁটি চেপে ধরেছে।

যদি এবং যখন আমেরিকান অর্থনীতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, এবং যদি ও যখন গোটা অঞ্চলের উপর সামরিক আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় এবং সারা পৃথিবীকে অবজ্ঞা করে নাটকীয় ভাবে নিজ রাষ্ট্রের আয়তন প্রসারিত করতে ইসরাঈল সফল হবে, পৃথিবীর নিয়ন্তা রাষ্ট্র হিসাবে ইসরাঈল তখন যুক্তরাষ্ট্রের স্থলাভিষিক্ত হবে। তা যখন ঘটবে, তখন বাকি পৃথিবী হতবাক হয়ে চেয়ে দেখবে, কিন্তু আরবীয় নবী (সাঃ)-এর সত্যিকার অনুসারীরা তাতে মোটেই অবাক হবে না।

এর পরে জেরুজালেমের জন্য যে শেষ অধ্যায় অপেক্ষা করবে, ইসলাম তার বর্ণনা দিয়েছে – আর সেটা হলো, জেরুজালেমে শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর নিয়ন্তা রাষ্ট্র হিসেবে ইসলামের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। ইসলামের ঐ বিজয়ের মুহুর্তটি তখন আসবে, যখন খোরাসান থেকে একটা মুসলিম বাহিনী বেরিয়ে আসবে এবং 'পবিত্রভূমিকে' মুক্ত করার প্রক্রিয়ায় ইসরাঈল রাষ্ট্রকে ধ্বংস করবে:

"আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: খোরাসান (আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং স্বল্পমাত্রায় ইরান ও মধ্য এশিয়ার মাঝে বিভক্ত অঞ্চলসমূহ নিয়ে গঠিত একটি এলাকা) থেকে কালো পতাকা দৃশ্যমান হবে এবং কোন শক্তি তাদেরকে Aelia (জেরুজালেম) পৌঁছান পর্যন্ত রোধ করতে পারবে না।"

(সুনান, তিরমিজী)

বাস্তবিকই রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) মুসলিমদের *"এমনকি বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও"* (অর্থাৎ এমনকি যদি তাদেরকে পৃথিবীর ঐ সমস্ত স্রষ্টা-বিমুখ সরকার, যারা আজ পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং যারা তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকাসমূহে মুসলিম অধিবাসীদেরকে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে মান্য করার ব্যাপারে বাধা দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করে, তাদেরকে তোয়াক্কা না ক'রে) ঐ বাহিনীতে যোগ দেবার আদেশ দিয়ে গেছেন।

প্রিয় নবী (সাঃ)-এর এই হাদীস সর্বতোভাবে এটাই স্পষ্ট করে দেয় যে, একটি *ইসলামি সামরিক সংগ্রামের* মাধ্যমেই জেরুজালেমকে মুক্ত করা হবে।

ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে মুসলিম প্রতিক্রিয়া

আমেরিকার উপর আক্রমণ, যে আক্রমণকে সন্ত্রাসবাদের ধূম্রজালের আড়ালে ইসলাম ও মুসলিমদের উপর দানবীয় আক্রমণ পরিচালনার জন্য যুক্তিহীনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, সেই আক্রমণের প্রতি মুসলিমদের চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া হবে এই যে, তারা এতদ্সত্যেও যে মূল্যই দিতে হোক না কেন, তার বিনিময়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে নিজেদেরকে উৎসর্গ করবে! যে সশস্ত্র সংগ্রাম (জিহাদ)-এর মাধ্যমে 'পবিত্র ভূমি'-কে মুক্ত করা হবে, এবং ইসলাম পৃথিবীতে বিজয়ীর বেশে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করবে, তার প্রস্তুতির জন্য এবং তাতে অংশগ্রহণ করার জন্য নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করার মাধ্যমেই তারা তা করতে পারে। এটা ঘোষণা করার আর প্রয়োজন নেই যে, ঐ জিহাদ ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। একই ভাবে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই, যা ঐ জিহাদকে রোধ করতে পারে যতক্ষণ না 'পবিত্র ভূমি' মুক্ত হয়েছে। যে 'লিটমাস পরীক্ষার' মাধ্যমে মুসলিমগণ, তাদের উপরে যে সকল স্রষ্টা-বিমুখ সরকার শাসন চালাচ্ছে তাদেরকে সনাক্ত করতে পারে এবং তাদের স্বরূপ উন্মোচন করতে পারে তা এই যে, ঐ ধরনের সরকার কখনই সশস্ত্র সংগ্রামকে স্বীকৃতি দেবে না বা তাতে অংশগ্রহণও করবে না।

ঐ *সশস্ত্র সংগ্রাম* সম্বন্ধে পবিত্র কুর'আনে এটুকুই বলবার রয়েছে।

মদীনায় এটা ছিল দ্বিতীয় শা'বান, যখন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যুদ্ধ সংক্রান্ত ওহী নাযিল করেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, আমেরিকান প্রেসিডেন্ট এবং ইসরাঈলী প্রধানমন্ত্রীর জন্য, হয়ত কুর'আনের নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ হজম করা কষ্ট হবে। কিন্তু মুসলিমদের উপর ব্রিটিশ-আমেরিকান-ইসরাঈলী আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে, আল্লাহ্ তা'আলা যুদ্ধ সম্বন্ধে কি বলেছেন সেদিকে সকল মুসলিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করাটা আমাদের জন্য অবশ্য করণীয়।

প্রথমত তিনি তা বাধ্যতামূলক করেছেন। আল্লাহ্ যে আদেশ দিয়েছেন, সরকার অথবা জাতিসংঘ সেটাকে বেআইনী ঘোষণা করলে সেটা হবে শির্ক। নিম্নলিখিত আয়াতে আল্লাহ্ যে আদেশ করেছেন, সেটাকে অবৈধ বলে মনে করা সকলের জন্য শির্ক (আমার মতামত রয়েছে বন্ধনীর মধ্যে):

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ
وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّـهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

"তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়ত কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

"আর হয়তবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় (যেমন যুদ্ধ না করা) অথচ তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহ্ই জানেন (ঈশ্বর বিবর্জিত ইউরো-ইহুদী ও ইউরো-খৃস্টানরা নয়, যারা এখন পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করে), আর তোমরা জান না (কোনটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক এবং কোনটা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর)।"

(কুর'আন, সুরা বাক্বারা ২:২১৬)

ঈশ্বরবিবর্জিত ইউরো-ইহুদী বা ইউরো-খৃস্টান যারা এখন পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করে তারা নয়, বরং পবিত্র কুর'আনের সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা অনুযায়ী একমাত্র আল্লাহ্ই সত্যিকার অর্থে জানেন মুসলিমদের জন্য কি মঙ্গলজনক ও কি ক্ষতিকর।

দ্বিতীয়ত পবিত্র কুর'আন মুসলিমদের আক্রমণের মুখে আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধের আদেশ দেয়:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ
إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

"আর লড়াই কর আল্লাহ্র ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে (ঈশ্বর-বিবর্জিত ইউরো-ইহুদী ও ইউরো-খৃস্টান যারা পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করে, তারা এখন ঠিক এই কাজটাই করছে, অর্থাৎ তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত), কিন্তু সীমানা লংঘন করো না;

"কেননা আল্লাহ্ সীমা লংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"

(কুর'আন, সুরা বাক্বারা ২:১৯০)

পবিত্র কুর'আন এটাও একেবারে স্পষ্ট করে দেয় যে, যারা কোন 'যুক্তিযুক্ত কারণ' ছাড়া মুসলিমদেরকে তাদের বাড়ীঘর এবং আবাসভূমি থেকে বিতাড়ন করে, তাদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের রুখে দাঁড়াতে হবে। তারা মুসলিম, কেবলমাত্র এটুকুর জন্যই

তাদের বিতাড়িত করা হচ্ছে। কুর'আন দাবী করে যে, তাদের ঐ নির্লজ্জ নিপীড়নের কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য অবশ্যই সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে মুসলিমদেরকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে হবে। পবিত্র ভূমিতে, এখন যা কিছু ঘটছে তা ঠিক এই পর্যায়ে রয়েছে। কিন্তু আজ যারা মুসলিমদের শাসনকার্যে নিয়োজিত, তারা এতটাই অন্ধ যে 'পবিত্রভূমিকে' মুক্ত করতে বর্তমানে পরিচালিত সশস্ত্র সংগ্রামের মাঝে তারা কুর'আনের বৈধতাকে সনাক্ত করতে অক্ষম। বরং তারা যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান সরকারের তথাকথিত 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে' যোগ দেন এবং এভাবে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে, পবিত্র কুর'আনের বিধান অনুযায়ী যারা সশস্ত্র সংগ্রামে নিয়োজিত তাদের সন্ত্রাসবাদী বলে আখ্যায়িত করেন। ঐ ধরনের সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য পবিত্র কুর'আনের অনুমোদন নিম্নরূপ:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّـهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾
الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّـهُ ۗ
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّـهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ
لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّـهِ كَثِيرًا ۗ
وَلَيَنصُرَنَّ اللَّـهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّـهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

"যুদ্ধে অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। (এবং যখন তারা যুদ্ধ করে) আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম।

"যাদেরকে তাদের বাড়ী-ঘর থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্।

"(যুদ্ধ পরিচালনা করার এই অনুমোদনের মাধ্যমে) আল্লাহ্ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন,

"তবে আশ্রম, গির্জা, সিনাগগ এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলোতে আল্লাহ্র নাম অধিক স্মরণ করা হয়।

"আল্লাহ্ নিশ্চয় তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহ্র সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী শক্তিধর (অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম)।"

(কুর'আন, সুরা হাজ্জ ২২:৩৯-৪০)

তৃতীয়ত যুদ্ধের সুফল হিসেবে নিপীড়ন ও অবিচারমুক্ত পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত হবার কথা, আর পৃথিবীপৃষ্ঠে কেবল আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হলেই সেটা হওয়া সম্ভব:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّـهِ ۖ

فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

"আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়।

"অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায়, তাহলে কারো প্রতি কোন জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা যালেম তাদের ব্যাপার আলাদা।"

(কুর'আন, সুরা বাক্বারা ২:১৯৩)

চতুর্থত, আল্লাহ্‌ ঐ সমস্ত নির্যাতিত মানুষজন, যারা সাহায্যের আবেদন জানিয়ে এবং নিপীড়ন থেকে মুক্তির আবেদন জানিয়ে চিৎকার করছে, তাদের মুক্ত করার জন্য মুসলিমদের উপর যুদ্ধ করাটা বাধ্যতামূলক করেছেন:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَـٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا
وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

"আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে,

"যারা বলে: হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী!

"আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও!"

(কুর'আন, সুরা নিসা ৪:৭৫)

এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা যুদ্ধ করতে ইহুদীদের অনীহার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি ঐ ধরনের অনীহার করুণ পরিণতি সম্বন্ধে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّـهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ
وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ
قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

"তুমি কি সেসব লোককে দেখনি, যাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা নিজেদের হাতকে সংযত রাখ, নামায কায়েম কর এবং যাকাত দিতে থাক?

" অতঃপর যখন তাদের প্রতি জেহাদের নির্দেশ দেয়া হল, তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ করল, যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহ্‌কে। এমন কি তার চেয়েও অধিক ভয়।

"আর বলতে লাগল, হায় পালনকর্তা, কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করলে! আমাদেরকে কেন আরও কিছুকাল অবকাশ দান করলে না!

"(হে রাসূল,) তাদেরকে বলে দিন, পার্থিব ফায়দা সীমিত। আর আখেরাত পরহেযগারদের জন্য উত্তম। আর তোমাদের অধিকার একটি সূতা পরিমাণও খর্ব করা হবে না।"

(কুর'আন, সুরা নিসা ৪:৭৭)

যারা মুসলমান তারা কেবলমাত্র একজন মুসলিম সেনানায়কের নেতৃত্ব ছাড়া, অথবা যুদ্ধ সংক্রান্ত আল্লাহ্‌র আইন অনুযায়ী ছাড়া, অন্য কোন অবস্থায় যুদ্ধ করতে পারে না। যারা অন্য কারো আদেশে বা আইনের আওতায় যুদ্ধ করে, তারা শয়তানের হয়ে যুদ্ধ করে:

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ ۖ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ
إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

"যারা ঈমানদার তারা জিহাদ করে আল্লাহর পথেই।

"পক্ষান্তরে যারা কাফির তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে। সুতরাং তোমরা জিহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষ অবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে –

"(দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।"

(কুর'আন, সুরা নিসা ৪:৭৬)

প্রাণভয়েও একজন মুসলিমের যুদ্ধ থেকে বিরত থাকা উচিত নয়:

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ
وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَـٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّـهِ ۖ
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَـٰذِهِ مِنْ عِندِكَ ۚ
قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّـهِ ۖ فَمَالِ هَـٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন; মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই – যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভিতরেও অবস্থান কর, তবুও।

"বস্তুত তাদের কোন কল্যাণ সাধিত হলে তারা বলে যে, এটা সাধিত হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে,

"আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয়, তবে বলে, এটা হয়েছে আপনার পক্ষ থেকে;

"বলে দেন (হে রাসূল), এ সবই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। পক্ষান্তরে তাদের পরিণতি কি হবে, যারা কখনও কোন কথা বুঝতে চেষ্টা করে না?"

(কুর'আন, সুরা নিসা ৪:৭৮)

অবিশ্বাসীরা প্রবল ক্রোধ ও হিংস্রতা সহকারে মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে। মুমিনরা যদি নিজেদেরকে উদ্দিপ্ত করে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয় তাহলে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তাদের জন্য সহায়তা আসবে:

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ
عَسَى اللَّـهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَاللَّـهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿٤﴾

"আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের জিম্মাদার নন। আর আপনি মুসলিমদের উৎসাহিত করতে থাকুন।

"শীঘ্রই আল্লাহ কাফিরদের শক্তি-সামর্থ খর্ব করে দেবেন। আর আল্লাহ্‌ শক্তি-সামর্থের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর ও কঠিন শাস্তিদাতা।"

(কুর'আন, সুরা নিসা ৪:৮৪)

সর্বোত্তম মুসলিম হচ্ছে তারা যারা নিজেরা সক্রিয় হয় এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। তারা নিশ্চিতভাবেই যারা 'ঘরে বসে থাকে' তাদের চেয়ে শ্রেয়:

لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ
وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ
فَضَّلَ اللَّـهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّـهُ الْحُسْنَىٰ ۚ
وَفَضَّلَ اللَّـهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾

"গৃহে উপবিষ্ট মুসলিম, যাদের কোন সঙ্গত ওজর নেই

"এবং ঐ মুসলিম যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে, সমান নয়।

"যারা জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে, আল্লাহ্‌ তাদের পদমর্যাদা গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় বাড়িয়ে দিয়েছেন,

"এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন।
"আল্লাহ্ মুজাহেদীনকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন।"
(কুর'আন, সুরা নিসা ৪:৯৫)

এমন কিছু মানুষ থাকবে যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার আহ্বানে সাড়া না দেয়ার জন্য অজুহাত দেখাবে যে, তারা এ ব্যাপারে অপারগ ছিল। উদাহরণ স্বরূপ তারা যুক্তি দেখাবে যে, তারা এমন সরকারের শাসনাধীন ছিল যারা আল্লাহর পথে তাদেরকে যুদ্ধ করতে অনুমতি দেয়নি। কিন্তু এই ধরনের অজুহাত ঐ সব মুসলিমকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে পারবে না, কেননা তাদের জিজ্ঞেস করা হবে: 'আল্লাহর পৃথিবী কি এমন প্রশস্ত ছিল না যে তারা এমন এক স্থানে হিজরত করত, যেখানে তাদের অধিকতর স্বাধীনতা থাকত?'

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ ۖ
قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ
قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّـهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ
فَأُولَـٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾
إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾
فَأُولَـٰئِكَ عَسَى اللَّـهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّـهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾
وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ
وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّـهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ
فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّـهِ ۗ وَكَانَ اللَّـهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٠﴾

"যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে?
"তারা বলে: এ ভূখণ্ডে আমরা অসহায় ছিলাম।
"ফেরেশতারা বলে: আল্লাহ্র পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে?
"অতএব, এদের বাসস্থান হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান।
"কিন্তু পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা অসহায়,
"তারা কোন উপায় করতে পারে না এবং পথও জানে না।

"অতএব, আশা করা যায়, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।

"যে কেউ আল্লাহর পথে দেশত্যাগ করে, সে এর বিনিময়ে অনেক আশ্রয় ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে।

"যখন কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশ্যে, অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়,

"তবে তার সওয়াব আল্লাহ্র কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়।"

(কুর'আন, সুরা নিসা ৪:৯৭-১০০)

তৃতীয় সংযোজন

ইব্‌নে খালদুন, ইকবাল, এবং পবিত্র কুর'আনে জেরুজালেম

এই গ্রন্থে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করা হয়েছে, যারা ডঃ মোহাম্মদ ইকবাল এবং ইব্‌নে খালদুনের রচনাসমূহ (যথাক্রমে Reconstruction of Religious Thought in Islam এবং Muqaddamah) দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, যাদের উভয়ই ইমাম আল-মাহদীর আগমনী সংক্রান্ত বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ঐ বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে, ইসলামের এই বিশারদ পণ্ডিতগণ পর্বত প্রমাণ ভুল করেছেন। ইকবালের বেলায় অবশ্য ব্যাপারটা মনে হয় তাঁকে খিলাফতের প্রত্যাবর্তন, ভন্ড-মসীহ্ দাজ্জাল এবং মরিয়মের পুত্র ঈসা মসীহ্ (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন, এই সকল বিষয়ে বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যানের পর্যায়ে নিয়ে যায়। তিনি অবশ্য ঐ ধর্মনিরপেক্ষ তুর্কী ইজতিহাদ, যা আধুনিক সংসদকে খিলাফতের এক বৈধ বিকল্প বলে ব্যাখ্যা করে, তাতে মোহিত হন। ইমাম আল-মাহ্‌দী সম্বন্ধে ইকবালের বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ:

"নবুওয়াত-সমাপ্তির মতবাদকে ঐ পারসি-ধর্মীয় মনোবৃত্তির একটা মনস্তাত্ত্বিক জবাব হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে, যে মানসিকতার কারণে তারা সর্বক্ষণ কারো আবির্ভাবের প্রতিক্ষায় রয়েছে, যা ইতিহাসের একটা ভুল চিত্রকে তুলে ধরে। ইতিহাসের প্রতি তাঁর নিজস্ব ধারণার মিল রেখে ইব্‌নে খালদুন ব্যাপারটার কঠোর সমালোচনা করেছেন, এবং আমি বিশ্বাস করি তিনি ইসলামে অনুরূপ ধারণার তথাকথিত কিতাবী ভিত্তিকে শেষ পর্যন্ত ধুলিস্যাৎ করতে সক্ষম হয়েছেন, যা অন্তত মানসিক দিক থেকে মূল পারসি-ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার সদৃশ, এবং যে ধারণা তাদেরই প্রভাবে ইসলামে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল।"

(ডঃ মোহাম্মদ ইকবালের Reconstruction of Religious Thought in Islam, এম, সাঈদ শেখ সম্পাদিত, লাহোর: ইনষ্টিটিউট অফ ইসলামিক কালচার, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা নং ১১৫ দেখুন। আরো দেখুন, মোহাম্মদ আহ্‌সানের কাছে লেখা ইকবালের চিঠি যাতে তিনি এই বিশ্বাসকে *মাসিহিয়াত* বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। *ইকবালনামা*, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২৩১। ইকবালের Reconstruction of Religious Thought in Islam-এর সম্পাদকের ভূমিকায় এম, সাঈদ শেখের লেখা থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা নং xi)।

ইবন খালদুন এবং ইকবাল, দুজনেই এমন উঁচুমানের পণ্ডিত যে, তাঁদের চিন্তাধারা সম্বন্ধে কোন সমালোচনামূলক মন্তব্য করার আগে, যে কেউ বার বার সংকোচ

বোধ করবে। কিন্তু মসীহের আগমনের পূর্ববর্তী অধ্যায়ের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সঠিক অনুধাবন তাদেরকে ঐ ভুল করা থেকে বিরত রাখতে পারত যা তারা দুর্ভাগ্যবশত করেছেন। ঐ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার আসল স্বরূপ কি? সেটা হচ্ছ মসীহ্‌কে (যখন তিনি আবির্ভূত হতে যাচ্ছেন) সন্দেহাতীত ভাবে সনাক্ত করার জন্য আল্লাহ্‌ একজন বিশেষ ব্যক্তিকে পাঠালেন, যাকে ঐ সনাক্তকরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ইয়াহিয়া (আঃ) মানুষজনকে এ ব্যাপারে অবহিত করেছিলেন যে মসীহ্‌ আসছেন। উপরন্তু, ঈসা (আঃ) যখন একজন প্রাপ্ত বয়স্ক হিসেবে 'পবিত্রভূমিতে' ফিরে আসেন, তখন ইয়াহিয়া (আঃ) তাঁর সামনে আসেন এবং জনসমক্ষে ঘোষণা করেন: *এই হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যার জন্য তোমরা অপেক্ষায় ছিলে; ইনিই হচ্ছেন 'মসীহ্‌'!* মসীহের নিশ্চিত সনাক্তকরণের এটাই ছিল আল্লাহ্‌-প্রদত্ত ব্যবস্থা।

একইভাবে যখন মসীহ্‌ প্রত্যাবর্তন করবেন, আল্লাহ্‌ আরেকজন ব্যক্তিকে পাঠাবেন যাঁর কাজ হবে ইয়াহিয়া (আঃ)-এর কাজের মতই। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া এভাবেই সঙ্গতি বজায় রাখে। ইমাম আল-মাহ্‌দীর ভূমিকা ইয়াহিয়া (আঃ)-এর ভূমিকার অনুরূপ।

যখন ইমামের আবির্ভাব ঘটবে এবং তিনি জনসমক্ষে ঘোষণা করবেন যে, তিনিই হচ্ছেন মাহ্‌দী, সেটাই হবে আলামত যে, মসীহ্‌র প্রত্যাবর্তনের সময় নিকটবর্তী। তার পর যখন ঈসা (আঃ) প্রত্যাবর্তন করবেন, তিনি তখন ঐ ইমামের সামনে অবতীর্ণ হবেন, যিনি ঘোষণা করবেন: "ইনিই মরিয়মের পুত্র!" (দেখুন, সহীহ মুসলিম)। এভাবে উভয় ক্ষেত্রে মসীহ্‌র নিশ্চিত সনাক্তকরণ সমাধা হবে (যখন তিনি পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করবেন) এবং তা একই পদ্ধতিতে সম্পন্ন হবে, অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা কর্তৃক ঠিক এই উদ্দেশ্যে পাঠানো একজন সাক্ষীর মাধ্যমে। ঈসা মসীহ্‌ (আঃ)-এর প্রেক্ষিতে ইয়াহিয়া (আঃ)-এর যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, তার সঠিক মূল্যায়ন ইব্‌নে খালদুনকে ইমাম মাহ্‌দী সংক্রান্ত হাদীসসমূহকে প্রত্যাখ্যান করার গুরুতর ও বিপজ্জনক ভ্রান্তি থেকে বাঁচাতে পারত, এবং ইকবালকে বাঁচাতে পারত ইব্‌নে খালদুনের ঐ একই ভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি করা থেকে, এবং সেই ভ্রান্তিকে আরো জটিল করা থেকে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইমাম আল-মাহ্‌দীতে বিশ্বাস, যার আগমন মরিয়মের পুত্র মসীহ্‌ (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তনের সমসাময়িক হবে, সেটা ইতিহাসের শেষ সময়ে আবির্ভূত হবেন এমন দুজন ব্যক্তির ব্যাপারে ইহুদীদের বিশ্বাস অনুরূপ মনে হয় – প্রথম জন হবেন রাজকীয় মসীহ্‌ আর অপর জন হবেন সাধক মসীহ্‌। Dead Sea Scrolls সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে Haim Zafrani-এই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন:

"Qumran পাণ্ডুলিপির কতিপয় অংশ থেকে এ ব্যপারটা প্রায় নিশ্চিত মনে হয় যে, এই মূলত সাধু সম্প্রদায় একজন বিশেষভাবে অভিষিক্ত উচ্চ শ্রেণীর যাজক (হারূনের মসিহ্)-এর আগমনের প্রতিক্ষা করত এবং সাথে সাথে একজন বিশেষভাবে অভিষিক্ত শাসক (ইসরাঈলের মসিহ্)-এর আগমনেরও প্রতিক্ষা করত। এটা লক্ষ্য করার মত বিষয় যে, কায়রো-দামেশ্ক নথিতে (CD 7:20) রাজকীয় মসীহ্কে 'রাজা' হিসেবে সম্বোধন করা হয়নি, বরং এক 'যুবরাজ' হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে (যা হেজকিল ৩৪:২৪, ৩৭:২৫ ইত্যাদির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ)। দুইজন মসীহ্র ধারণা, একজন রাজকীয় এবং একজন যাজক, সম্ভবত 'জাকারিয়া ৪:১৪'-এর সময় থেকে প্রচলিত, যাতে বলা হয়েছে যে: 'এরা সেই দুজন যারা গোটা পৃথিবীর প্রভুর নির্দেশ পালনের জন্য অভিষিক্ত হয়েছে'।"

(Encyclopedia Judaica – Eschatology – Messianism)

ঐ দুইজন ছাড়াও, একজন তৃতীয় ব্যক্তির কথা রয়েছে, যিনি রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না:

"তাঁর (অর্থাৎ তাদের শিক্ষকের) কাছ থেকে তারা (অর্থাৎ Qumran-এর সাধু সম্প্রদায়) যে শাসন লাভ করেছে তাই তাদের জীবনযাত্রা হিসাবে পরিগণিত হবার কথা 'যতক্ষণ না একজন নবী এবং হারূন ও ইসরাঈলের মসিহ্দ্বয় আবির্ভূত হন'।"

(1 Qumran Scrolls 9:11)

(Encyclopedia Judaica – Yahad – Eschatological Hope)

-০-